সঙ্গীত সমীক্ষা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাত টাকা

: এই লেখকের :

বাংলার সঙ্গীত

॥ প্রাচীন যুগ ॥ মধ্য যুগ ॥

বাংলার গীতকার

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে স্বরূপা ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং
রূপবাণী প্রেস ৩১ বাদুড়বাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

এই গ্রন্থটিতে শার্ঙ্গদেব প্রণীত "সঙ্গীত রত্নাকর"-এ বর্ণিত স্বরাধ্যায় থেকে প্রবন্ধাধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতবিষয়ক শাস্ত্রাদি সম্যক অধ্যয়ন করে যে ভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন তাতে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত সমীক্ষণের কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়েছে। বহুশত বৎসর পরে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল্যায়ন পরিকল্পনায় সঙ্গীত রত্নাকর"-এর পুনরায় পর্যালোচনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিরাট গ্রন্থকে বাংলায় বর্তমান পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক ভাবে ভাষান্তরিত করে উপস্থিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে হলেও এই কাজে হাত দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করেছি। এই উপলক্ষে সঙ্গীত রত্নাকরের উভয় টীকা অবলম্বন করা হয়েছে এবং স্থানে স্থানে পাঠকের মনে যে সব প্রশ্নের উদয় হতে পারে সেগুলি প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনাবশ্যকবোধে কিঞ্চিৎ বর্জন এবং প্রয়োজনবোধে মূল গ্রন্থের বিন্যাসকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে—এতে মূল বিষয়-বস্তুর কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নি।

১৫ই চৈত্র ১৩৬৬ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

উৎসর্গ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল

মহাশয়ের করকমলে

॥ মুখবন্ধ ॥

যে কোন বস্তুর বৃহৎ পটভূমিকায় বিচার হলে তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হয়। সাহিত্যিক বা শিল্পীর পক্ষে সঙ্কীর্ণতা সর্বথা পরিহার্য। তাঁকে বিবিধের মধ্যে থেকে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তাঁর বিষয়বস্তুকে পরিচিত অপরাপর বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। 'সঙ্গীত রত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেব এই বিস্তৃত পটভূমিকায় ভারতীয় সঙ্গীতের মূল্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগে মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে এইভাবে সঙ্গীতকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাদের হাতে তাঁর যে গ্রন্থটি এসেছে ত্রিবন্দ্রাম সিরিজের সেই মুদ্রিত গ্রন্থটি অভ্রান্ত বা সম্পূর্ণ নয়। তথাপি এই গ্রন্থটি থেকেই তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরও আগে সুমহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত। তিনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এমন বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যার সঙ্গে নাট্য বা নৃত্যক্রিয়ার হয়ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই তথাপি সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। অনায়াসেই তিনি সে সব বিষয় এড়িয়ে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি তাঁর কাজের সার্থকতা এবং সম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে সে সব বিষয় পরিহার করেননি। সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত হলেও যেটুকু পরিচয় তিনি প্রদান করেছেন সেটুকুই পরবর্তী গ্রন্থকারদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে।

সঙ্গীত প্রয়োগশিল্প—অতএব সর্বতোভাবে সঙ্গীতকে প্রয়োগের কলা-কৌশলের দিক দিয়ে বিচার করতে হবে,—অনেকে এই মত পোষণ করেন। তাঁদের কাছে এতদতিরিক্ত যা কিছু সঙ্গীত-গ্রন্থে আছে তা কবিত্ব মাত্র, কেবল উচ্ছাসেই পর্যবসিত। এ হচ্ছে ঠিক সংসারী লোকের মত কথা অর্থাৎ আয় ব্যয়ের সঠিক হিসেব এবং পরিণত জীবন যাত্রার হিসেবি বোধ। অনেকে এইটুকুতেই সন্তুষ্ট কিন্তু চিন্তার পরিধি যাঁদের সুবিস্তৃত তাঁরা এই সীমিত ক্ষেত্রে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তাঁদের চিন্তাধারায় সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্য এবং শিল্পের সাযুজ্য ঘটেছে। একটি কথা আর একটি কথাকে আকৃষ্ট করেছে। এইভাবেই সাহিত্য এবং শিল্পের সঙ্গে সঙ্গীতের একটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। এই সঙ্গীতচিন্তাকে

বাহুল্যবোধে অবজ্ঞা করে কেবলমাত্র কতকগুলি সাঙ্গীতিক কলা কৌশল নিয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা সঙ্গীতের মূলসূত্রগুলি অবলম্বন করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন মাত্র, তার অধিক কিছু নয়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যুগে যুগে সঙ্গীতপ্রচেষ্টায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় সঙ্গীতের বিচার না হলে সঙ্গীতের মূল্যায়নও সম্ভব নয় এবং তার সার্থক অগ্রগতিও ঘটতে পারে না। প্রাচীন সঙ্গীতসাহিত্যে এদিকে লক্ষ্য রেখে শার্ঙ্গদেবের মত এত ব্যাপকভাবে আর কেহই চিন্তা করেন নি।

বাগ্‌গেয়কারের যে বর্ণনা শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন তা থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর সুমহৎ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীর সম্যক সাহিত্যবোধ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কতকগুলি টেকনিক আয়ত্ত হলেই গায়ক শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হন না, তাঁকে বিদগ্ধ হতে হবে—এইজন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দরকার। শার্ঙ্গদেব "হৃদ্যশারীর" এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা স্বীকার করেছেন যে, যাঁরা শিল্পী তাঁদের অনেকেরই কণ্ঠমাধুর্য শরীরের সঙ্গে সহজাত; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁদের বিবিধ বিদ্যার চর্চায় প্রবৃত্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন, কেননা স্বাভাবিক ধ্বনিমাধুর্য বুদ্ধি-পরিমার্জিত বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হলেই তা প্রকৃত আর্টে পরিণত হয়। টেকনিকের প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেছেন কিন্তু তাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেন নি। তাঁর মতে যে বাগ্‌গেয়কার কেবলমাত্র টেকনিকের দিকে মনোযোগ দেন তিনি মধ্যম শ্রেণীর শিল্পী—উত্তম নন। যে শিল্পীর সঙ্গীত সব দিক থেকে বিচার করে রসোত্তীর্ণ; তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

রসের প্রাধান্য স্বীকার করলেও শার্ঙ্গদেব বিবিধ টেকনিক বা রূপবন্ধের বিচারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নি। ব্যাপকভাবে না হলেও সাধারণভাবে তিনি শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েই আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন।

শ্রুতি প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব অধিক বাগবিস্তার করেন নি; অথচ ধ্রুববীণা এবং চলবীণার সাহায্যে কি ভাবে শ্রুতি পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে সেটি তিনি সরল ভাবে বলে গেছেন। বর্তমান যুগে এ সম্বন্ধে নানা রকম অঙ্ক এবং জটিল গবেষণা হয়েছে কিন্তু শার্ঙ্গদেবের বর্ণনায় কোন রকম

জটিলত্ব নেই। এই ধ্রুববীণা এবং চলবীণায় শ্রুতিনির্ণয় সমস্তটাই আন্দাজের ব্যাপার। সেকালে কানের উপর নির্ভর করেই তারগুলি বাঁধা হত। এতে স্বরগত ব্যবধান কি ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে তার মূলতত্ত্বটি তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত আসরে যখন বীণা বাজান হত তখন যে তাকে ধ্রুববীণার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হত এমন নয়, সেটি নিজের আন্দাজ অনুসারেই বাঁধা হত। ধ্রুববীণা এবং চলবীণায় যেটি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে শ্রুতিগুলি সমান অন্তরে অবস্থিত। শার্ঙ্গদেব একথা বিশেষভাবে বলেছেন যে তারগুলি এমনভাবে বাঁধা হবে যে দুটি তারের মধ্যে তৃতীয় ধ্বনির অবকাশ না থাকে। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে শ্রুতিসমূহের অন্তর্গত ব্যবধান সমান। এইটিই তিনি অপকর্ষণ-রীতিতে এক শ্রুতির অন্যশ্রুতিতে প্রবেশ দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাদী, সংবাদী, অনুবাদী এবং বিবাদী সম্বন্ধেও শার্ঙ্গদেব যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তার মূলতত্ত্ব এই যে রাগ বা জাতিগানে যে স্বর যে ভাবে প্রযুক্ত হবার নির্দেশ দেওয়া অছে তার পরিবর্তন করা সম্ভব। এই সম্ভাব্যতায় স্বরপ্রয়োগ সম্বন্ধে কি নিয়ম প্রয়োগ করা হবে সেটিও তিনি বলে দিয়েছেন।

শার্ঙ্গদেব নষ্টোদ্দিষ্ট তান পরিজ্ঞানের প্রসঙ্গে খণ্ডমেরুর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর যুগে এসম্বন্ধে কিছু না বললেও হয়ত চলত কিন্তু পূর্ববর্তী যুগে স্বরপ্রস্তার সম্বন্ধে কত বিস্তৃত গবেষণা হয়েছিল তার একটি আভাস দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

আমাদের সঙ্গীতে মূর্ছনার গুরুত্ব অসামান্য। বস্তুত, মূর্ছনার বৈচিত্র্যেই রাগের বৈচিত্র্য ঘটা সম্ভব হয় এবং মূর্ছনার মধ্যেই রাগবিশেষের মূলরূপটি প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই রাগের পরিচয়ে মূর্ছনার বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

শার্ঙ্গদেব যে জাতিগানের বর্ণনা দিয়েছেন সেটিও তাঁর যুগের বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু জাতিগানের মূল রূপবন্ধগুলিই রাগসঙ্গীতে প্রযুক্ত হয়েছে। বস্তুত জাতিগান এবং গ্রাম রাগে যে খুব একটা তফাৎ ছিল এমন নয়। অতএব রাগগায়নকে বুঝতে গেলে জাতিগায়ন সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। শার্ঙ্গদেব এই উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিগানের বর্ণনা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবেই করেছেন।

এ ছাড়া জাতিগান সম্বন্ধে জানতে হলে মার্গতাল সম্বন্ধেও জানতে হয়। শার্ঙ্গদেব এই কারণেও জাতিগানের স্বরলিপি সন্নিবেশিত করেছেন। বস্তুত চিত্র, বৃত্তি এবং দক্ষিণ এই তিনটি মার্গ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে প্রাচীন গ্রামরাগের গায়ন সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। সুপ্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত সাধারণত দক্ষিণ মার্গে গাওয়া হত। এই উপলক্ষে হস্তদ্বারা মাত্রাগুলি যেভাবে দেখানো হত তার ট্রাডিশন আজ পর্যন্ত ধ্রুপদ গানে চলে আসছে। বর্তমান ধ্রুপদ যে দেশীয় সালগসূড় থেকে এসেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কিন্তু এতে দেশী তালের প্রয়োগ না হয়ে মার্গতালের বিধি প্রযুক্ত হয়েছে বলে আমার ধারণা। কী ভাবে এই সংগঠন হয়েছে সেটি আজ আর জানবার উপায় নেই কিন্তু বর্তমানে হাতে যে ভাবে চৌতাল প্রভৃতির গতি দেখিয়ে দেওয়া হয় তাতে এই ত্রিমার্গের কথাই মনে পড়ে। দেশী গানে মার্গতালের রীতি যে অনুসৃত হয় নি এমন নয়; পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধ তার প্রমাণ। ধ্রুবপদেও কোনও সময় মার্গতালের রীতি অবলম্বিত হয়ে থাকবে। কোন গানের ক্রমোন্নতি যে কি ভাবে হয়েছে এযুগে সেটি বলা শক্ত। অনেকের এমন ধারণাও ছিল যে প্রাচীন সঙ্গীত চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণ মার্গে গাওয়ার রীতি প্রচলিত থাকার দরুণ এই সব গানের আখ্যা হয়েছে—মার্গসঙ্গীত।

রাগসঙ্গীত সম্পর্কে শার্ঙ্গদেবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঐতিহাসিক। তিনি রাগ-রাগিনী রীতিতে রাগসঙ্গীত বিভাগের পরিকল্পনা করেন নি। রাগ গায়ন উপলক্ষে কাল, রস এবং বিনিয়োগ প্রভৃতি তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় রাগসঙ্গীতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশই প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জাতিগান বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে সংগঠিত হয়েছে। প্রথমে ছিল সাতটি শুদ্ধজাতি; পরে মিশ্রণ অনুসারে আরও এগারটি জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী রাগগায়নে স্বরাদির প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও দেশ-দেশান্তরে বা বিভিন্ন জাতিতে রাগগায়ন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় বহুতর মিশ্রণ ঘটল। এই মিশ্রণ অনুসারে যে পরিবর্তন সাধিত হল তার পরিমাণ অনুসারে রাগসমূহের আখ্যা হল ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা। ক্রমে আরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল এবং রাগসঙ্গীত ভাষাঙ্গ, রাগাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ—এই সব নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। রাগসঙ্গীত এইভাবে

দেশী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। শার্ঙ্গদেব রাগসঙ্গীতকে এই ক্রম-অনুসারে ভাগ করেছেন। মিশ্রণ কিন্তু ওইখানেই থেমে থাকেনি, আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং ক্রমে মূল দেশগত বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে গিয়ে এমন একটি সাধারণ শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছে যার ফলে কেবল মাত্র "রাগ"—এই বৃহৎ শ্রেণী ছাড়া আর কোন বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব নয়।

শার্ঙ্গদেবের মত এত উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকভাবে প্রবন্ধসঙ্গীতের বর্ণনা আর কেহই করেন নি। দেশী সঙ্গীতের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আমরা আজ যে গান গাই তার কাঠামো অর্থাৎ কলি-নিবদ্ধ রূপই তো প্রবন্ধসঙ্গীত থেকে গৃহীত। আমাদের বর্তমান সঙ্গীত প্রত্যক্ষভাবেই প্রবন্ধসঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত।

জাতির চলমান জীবনধারার পরিচায়ক হচ্ছে প্রবন্ধসঙ্গীত। নানা সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে এই সব গীতরূপের অভ্যুদয় হয়েছে এবং রাগসঙ্গীতের আরোপ হওয়াতে সেগুলি মনোহর হয়ে উঠেছে। সুতরাং নানাদিক থেকেই এই সব গীতের বিশেষ মূল্য আছে। অনেক প্রবন্ধসঙ্গীত শার্ঙ্গদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল না কিন্তু তথাপি তিনি তাদের উল্লেখ এবং পরিচয় প্রদান করে গেছেন। তাদের মূল্য তিনি অস্বীকার করেন নি। পরবর্তী গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহ কেহ এই চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করে গেছেন; কিন্তু অনেকেই করেন নি। বর্তমান ভারতের কোন কোন অংশে প্রচলিত সঙ্গীতের পূর্বতন রূপ শার্ঙ্গদেব বর্ণিত প্রবন্ধ-সঙ্গীত থেকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

একদা বিভিন্ন সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দে রচিত যে সব গীতরীতি স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ক্রমেই লুপ্ত হতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতিতে পর্যবসিত হয়। সংস্কৃত কাব্যে প্রযুক্ত ছন্দের সঙ্গে সঙ্গীতের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবার ফলে আমাদের সঙ্গীত শেষ পর্যন্ত তিন তাল এক ফাঁকের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে এসে পড়েছে। অপর পক্ষে মুসলমানদের মধ্যে থেকেও সত্যিকারের পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের সঙ্গীতে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য এগিয়ে আসেন নি। আমীর খস্রু কিছু নূতনত্বের আভাস দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলা চলে না। তাঁর অসামান্য প্রতিভা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনে এদিকে একবার আকৃষ্ট হয়েছিল মাত্র। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন যদি আরো অধিক পরিমাণে আমাদের সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করতেন এবং তাঁদের চিন্তার পরিচয় শাস্ত্রে বা শিষ্যপরম্পরা রেখে যেতেন তাহলে সঙ্গীতের অনেক শ্রেষ্ঠ অংশ আজও সুরক্ষিত থাকত এবং সঙ্গীতের অগ্রগতি অনেক প্রবুদ্ধভাবে নির্দিষ্ট হত।

প্রাচীন ভারতের যে ক'টি গ্রন্থকে আমরা শাস্ত্র বলে স্বীকার করি সেগুলিতে বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও একটি বিরাট অভাব রয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে এই যে সমসাময়িক গীতানুষ্ঠান বা নাট্যাদির পরিচয় তাঁরা খুব কমই দিয়েছেন এমন কি তাদের উল্লেখও প্রায় নেই বললেই চলে। গীতগুলি নাটকের বিভিন্ন পরিবেশ এবং রস অনুযায়ী প্রযুক্ত হত এমন প্রমাণ সঙ্গীতশাস্ত্র থেকে আমরা পাই কিন্তু গ্রন্থকারগণ বিখ্যাত এবং পরিচিত নাটকের উদাহরণ দিয়ে সেগুলি বুঝিয়ে দেন নি। এই বিশেষ অভাব না থাকলে সঙ্গীতের ইতিহাস আমাদের কাছে অনেক সুগম হত। শার্ঙ্গদেব অবশ্য জাতিগান বা গ্রামরাগের উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু কেবলমাত্র গানটুকুই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—কোথা থেকে সেটি আহরণ করা হয়েছে বা তার পূর্বাপর কেমন ছিল তা আমাদের জানবার অবকাশ দেন নি

আমরা যে নাটকগুলি পাঠ করি অভিনয় কালে তাতে আরও অনেক গান যথাস্থানে যোজনা করা হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাট্যকার হয়ত সেগুলি রচনা করতেন না এবং সেই সব গানকে রক্ষা করবার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করতেন না। হয়ত সঙ্গীতাচার্যগণ সেগুলি ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে রাখতেন। কিন্তু, সেগুলি আর নাটকের সঙ্গে আমাদের হাতে পৌঁছায় নি। আমরা কেবলমাত্র নাট্যসাহিত্যটুকুই পেয়েছি।

অনুরূপভাবে প্রবন্ধসঙ্গীতগুলির কেবলমাত্র লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে,—কোন কোন জনপদে সেগুলি প্রচলিত ছিল বা কি রকম অনুষ্ঠানে সেগুলি প্রযুক্ত হত সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। গানের লক্ষণগুলি পাওয়া গেল, তাদের আকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা গেল কিন্তু আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি বা বিশিষ্ট জনপদের জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে তাদের আমরা স্পষ্টভাবে চিনে নিতে পারছি না। দু-একটি গীত সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে এগুলি কর্ণাট কি ভাষায় রচিত হত বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হত; কিন্তু সঠিক ভাবে কোনো স্থান নির্দেশ করা হয় নি। এই প্রসঙ্গে চর্যা-

গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। শার্ঙ্গদেব চর্যায় গায়ন পদ্ধতি ভালভাবে দিয়েছেন। এটি যে অধ্যাত্মগোচর তাও তিনি বলেছেন। কিন্তু, কোথায় কি পরিবেশে এগুলি গাওয়া হত সেটি বলে দিলে আজকে আমাদের অনেক সন্দেহের অবসান ঘটত। ঝোম্বড়া নামক এক বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমরা জানতে পারছি যে এই সব, গানে উপমা, রূপক এবং শ্লেষ—এই তিনটি অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল ; তা ছাড়া গদ্য এবং পদ্য—দুটি মিলিয়েই এই গীতানুষ্ঠান করা হত ; কিন্তু উদাহরণের অভাবে এর পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না। আমার মনে হয় আমাদের বর্তমান ঝুমুর এই প্রাচীন ঝোম্বড়ারই একটি রূপের বিকৃত পরিণতি ; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখের অভাবে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

অনেকের সন্দেহ আছে যে প্রবন্ধ সঙ্গীতের অধিকাংশই কৃত্রিম। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকলে এ রকম ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু আমরা শার্ঙ্গদেব বর্ণিত নানা প্রবন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত নই সেই কারণেই এগুলি গ্রন্থকারের নিজস্ব পরিকল্পিত রূপ এমন সিদ্ধান্ত করবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। সারা ভারতে প্রচলিত গীতরূপগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে এগুলির সঙ্গে যোগসূত্র কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই বলে আমার ধারণা। এই গীতগুলির বৈশিষ্ট এবং ঐতিহ্য না থাকলে মতঙ্গ থেকে শার্ঙ্গদেব পর্যন্ত সবাই এই সব গীতরূপের এতটা প্রাধান্য দিতেন না।

শার্ঙ্গদেবের প্রবন্ধাধ্যায় থেকে কাব্যের ছন্দ এবং সঙ্গীতের ছন্দ—এই দুটির মধ্যে কি সম্পর্ক সেটি চমৎকার বোঝা যায়। ছন্দ-শাস্ত্রে দক্ষতা না থাকলে সঙ্গীত রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায় বোঝা কঠিন। এলা-জাতীয় প্রবন্ধে এবং অপরাপর প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে ছন্দশাস্ত্রের "গণ", "বর্ণ", "অক্ষর-বৃত্ত" "মাত্র-বৃত্ত" প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। গুরু এবং লঘু হিসাবে তিনটি বর্ণের সন্নিবেশে একটি গণ হয়। কাব্যে সাধারণত আটটি গণের ব্যবহার হয়। প্রবন্ধসঙ্গীতে এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক গণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সঙ্গীতে এই গণ বিভাগ বেশ চিত্তাকর্ষক। এ ছাড়া কাব্যের রীতি এবং বৃত্তিরও প্রয়োগ আমাদের সঙ্গীতে প্রচুর ছিল।

শার্ঙ্গদেব এবং তদীয় টীকাকারদ্বয়ের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আজও পাওয়া যায় নি ;—যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুর উল্লেখ করে এই ভূমিকা শেষ করি।

শার্ঙ্গদেবের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বৃষগণগোত্রীয়। এই পরিবারে ভাস্কর নামক এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দক্ষিণ-দেশে বসতি স্থাপন করেন। ভাস্করের পুত্র ছিলেন সোঢ়ল এবং তাঁর পুত্র হচ্ছেন শার্ঙ্গদেব। ইনি মহারাজ সিংহনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দেবগিরিতে যাদব বংশীয় সিংহন নামক এক রাজা ১২১০ থেকে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে শার্ঙ্গদেব এই সময় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। দেবগিরি হচ্ছে বর্তমান দৌলতাবাদ। শার্ঙ্গদেব নিজেকে শ্রীকরণাগ্রণী বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন করণ বা দপ্তরের প্রধান কর্মচারী।

শার্ঙ্গদেব যতগুলি সঙ্গীত-শাস্ত্র তাঁর সময় পাওয়া সম্ভব ছিল সবই পড়েছিলেন। তা ছাড়া বিবিধ আলঙ্কারিকের গ্রন্থাদির সঙ্গেও তাঁর প্রভূত পরিচয় ছিল। এ সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্নাকরের প্রারম্ভে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

সদাশিবঃ শিবা ব্রহ্মা ভরতঃ কশ্যপো মুনিঃ।
মতঙ্গো যাষ্টিকো দুর্গাশক্তিঃ শার্দূলকোহলৌ॥
বিশাখিলো দত্তিলশ্চ কম্বলোঽশ্বতরস্তথা।
বায়ুর্বিশ্বাবসু রম্ভার্জুনো নারদতুম্বুরু॥
আঞ্জনেয়ো মাতৃগুপ্তো রাবণো নন্দিকেশ্বরঃ।
স্বাতির্গণো বিন্দুরাজঃ ক্ষেত্ররাজশ্চ রাহলঃ॥
রুদ্রটো নান্যভূপালো ভোজভূবল্লভস্তথা।
পরমর্দী চ সোমেশো জগদেক মহীপতিঃ।
ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভট শঙ্কুকাঃ।
ভট্টাভিনবগুপ্তশ্চ শ্রীমৎকীর্তিধরঃ পরঃ।
অন্যে চ বহুবঃ পূর্বে যে সঙ্গীতবিশারদাঃ।
অগাধবোধমন্থেন তেষাং মতপয়োনিধিম্॥
নির্মথ্য শ্রীশার্ঙ্গদেবঃ সারোদ্ধারমিমং ব্যধাৎ।

এ থেকে বোঝা যায় বিবিধ মতের উদ্ধার এবং সেগুলির তাৎপর্য নির্ণয়ে তিনি কত যত্ন এবং পরিশ্রম করেছিলেন।

সঙ্গীতরত্নাকরে যেটুকু বাকি ছিল তা পূরণ করেছেন টীকাকার সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথ। সিংহভূপালের টীকার নাম সুধাকর এবং কল্লিনাথের টীকার নাম কলানিধি। এই টীকা দুটি মিলিয়ে সঙ্গীতরত্নাকর

অধ্যয়ন না করলে উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা বোধ হয় সম্ভব হয় না। সঙ্গীতরত্নাকরকে এই দুটি টীকা যে গৌরব প্রদান করেছে এমন আর কোন সঙ্গীতগ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কল্লিনাথের টীকা কঠিন কিন্তু বিশেষ মূল্যবান। কল্লিনাথ সাধারণ বা সহজ অংশের ব্যাখ্যা দেন নি কিন্তু যে সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সেগুলি অনেকেই এড়িয়ে গেছেন। জাতিগানের যে টীকা কল্লিনাথ দিয়েছেন তার সাহায্যে উক্ত অধ্যায়টি বুঝতে বিশেষ সুবিধা হয়। রাগ বিবেক অধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর টীকা অতুলনীয়। পাঠককে তিনি সর্ববিষয়ে সাহায্য এবং সকল সন্দেহের নিরসন করতে চেষ্টা করেছেন। ষড়জ এবং মধ্যম—এই দুই গ্রাম মিলিয়ে যেসব রাগের উদ্ভব হয়েছে তাতে কোন গ্রামের অংশ কতটুকু থাকবে এবং কিভাবে দুই গ্রামের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। যে সব অপ্রচলিত রাগের পরিচয় শার্ঙ্গদেব দেননি তিনি সেগুলি উদ্ধার করে গ্রন্থের পূর্ণতা সাধন করেছেন। তবে, কল্লিনাথকে বুঝতে গেলে একটু বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বহুস্থলেই তিনি এই দুটি বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কল্লিনাথ ছিলেন কর্ণাটকের লোক। তাঁর পিতামহের নাম ছিল বল্লভেশ্বর, পিতার নাম লক্ষ্মীধর এবং মাতার নাম নারায়ণী। বিজয়নগরের রাজা ইম্মদী দেবরায় তাঁকে বহু মান সহকারে আহ্বান করেছিলেন সঙ্গীতরত্নাকরের টীকা রচনা করবার জন্য। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের ভাষা উদ্ধৃতি করি :—

বল্লভেশ্বরদেবো হি যস্য সাক্ষাৎপিতামহঃ
অসৌ কিং বর্ণ্যতে জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যসম্পদা ॥
মাতা নারায়ণী যস্য পিতা লক্ষ্মীধরঃ স্বয়ম্।
শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ সোঽয়ং সাক্ষাৎসঙ্গীতদেবতা ॥
তমাহ কল্লিনাথার্যং স রাজা বহুমানতঃ।
রত্নাকরং ব্যাকুরুষ লক্ষ্যলক্ষকোবিদ ॥
অতঃ স কল্লিনাথার্যো রত্নাকরনিবন্ধনম।
কলানিধিং নিবধ্নাতি লক্ষ্যলক্ষ্মাবিরোধতঃ।

সিংহভূপালের টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং আতিশয্যবর্জিত। এই কারণে এই টীকা থেকে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য সহজে বোঝা যায় এবং সর্বত্রই একটি সমতা পরিলক্ষিত হয়। টীকাটি সরল হলেও সিংহভূপাল সামান্য পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি একজন প্রখ্যাত আলঙ্কারিক। রসার্ণবসুধাকর নামক একটি অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি রচনা করেন।

সিংহভূপাল কল্লিনাথের পূর্ববর্তী। জাতিতে শূদ্র হলেও তিনি ছিলেন রাজা। বিন্ধ্য এবং শ্রী-শৈলের মধ্যবর্তী স্থান তাঁর শাসনাধীনে ছিল। তাঁর টীকায় প্রারম্ভে তিনি বলেছেন যে শার্ঙ্গদেবের পূর্বে ভরতাদি শাস্ত্রকারগণের গ্রন্থে বর্ণিত সঙ্গীতপদ্ধতি দুর্গম হয়ে পড়েছিল। শার্ঙ্গদেব বিভিন্নপদ্ধতিগুলির সমন্বয়সাধনপূর্বক ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতরূপটি পরিস্ফুট করেন। বিবৃতি সরল হলেও সব ব্যাপার সবাইকার বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়—সিংহভূপাল তাঁর টীকায় সকল অংশই সুগম করতে পেরেছেন বলে দাবী করেন। তাঁর দাবী সত্যই সমর্থনযোগ্য।

শার্ঙ্গদেব নিজেকে নিঃশঙ্ক বলে প্রচার করতেন। নিজের ওপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে তাঁর শ্রেণীকরণ এবং বিশ্লেষণ। কোন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। প্রকীর্ণাধ্যায় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শব্দের নানা প্রকারভেদ এবং গায়ন পদ্ধতির বিবিধ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি অতি নৈপুণ্য সহকারে আলোচনা করেছেন। এই সব আলোচনা থেকে তৎকালীন রাগমিশ্রণ এবং নানাবিধ প্রয়োগচাতুর্য সম্বন্ধে জানবার সুযোগ হয়। এ বিষয়ে আরো কেহ কেহ আলোচনা করেছেন কিন্তু আলোচনার বিচক্ষণতায় শার্ঙ্গদেব সকলকেই অতিক্রম করেছেন। শার্ঙ্গদেবের দৃষ্টি হচ্ছে আলঙ্কারিকের দৃষ্টি। সুতরাং কাব্য এবং সঙ্গীতের যে সম্বন্ধ সেটি সর্বক্ষেত্রেই শার্ঙ্গদেব স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

ধ্বনি-নাদ-শব্দ

আলোর অভ্যুদয়ে অন্ধকার যেমন বিদূরিত হয় তেমনি এই মূক পৃথিবী ধীরে ধীরে মুখর হয়ে উঠল শব্দে। ক্রমে শব্দগুলি মনোহর হয়ে উঠল ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যে। এই মনোহর ধ্বনি থেকেই এল ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় মানবসংস্কৃতির উপাদান। শব্দই ব্রহ্ম। শব্দই নাদতনু শঙ্কর যাঁকে নিরপেক্ষ সুখদায়ক পরমেশ্বর বলে প্রচার করা হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে।

ধ্বনির প্রয়াস থেকেই ক খ গ ঘ প্রভৃতি নানা বর্ণের উৎপত্তি। বর্ণ থেকে সৃষ্ট হল পদ; আর পদ থেকে এল বাক্য। এই সচল বাঙ্ময় জগৎ বাক্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

ধ্বনি বলতে আমরা কি বুঝি? বাইরে থেকে উচ্চারিত হল একটি বর্ণ—তা এসে পৌছলো কর্ণরন্ধ্রে। এই উচ্চারণ মন্দ্র হতে পারে আবার তীব্রও হতে পারে। এই যে উচ্চারণসম্ভূত শ্রুতি একেই বলা হয় ধ্বনি। ধ্বনিরই নামান্তর হচ্ছে নাদ। নাদ ভিন্ন স্বর, গীত বা নৃত্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই জগৎই যে নাদাত্মক। প্রাচীন ঋষি কবির উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—ব্রহ্মা নাদরূপে স্মৃত। পরমপুরুষ জনার্দন তিনিও নাদস্বরূপ পরাশক্তি নাদরূপা। পরমশক্তিমান মহেশ্বর তিনিও নাদরূপ ব্রহ্মগ্রন্থিতে সংস্থিত যে প্রাণ তা থেকে বহ্নির সমুদ্ভব হয়। সেই বহ্নি এবং বায়ুর সাহায্যে নাদের উৎপত্তি ঘটে। নাদ থেকেই এই বাক্‌সর্বস্ব জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।

নাদ দ্বিবিধ—আহত এবং অনাহত।

গুরুর উপদিষ্ট মার্গে সাধনা দ্বারা অনাহত নাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাদ জনমনোহর নয়। আহত নাদই সঙ্গীতের উৎপত্তিকারক। অতএব এই নাদই জনমনোরঞ্জক।

আত্মা প্রকাশোন্মুখ। এই যে নিজেকে প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা—এই আকুতিই অন্তঃকরণকে জাগ্রত করে। আত্মাদ্বারা উদ্বুদ্ধ মন দেহস্থিত বহ্নিকে তাড়না করে। সেই বহ্নি মারুত বা বায়ুকে প্রেরণ করে। ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত বায়ু সেই বহ্নিদ্বারা তাড়িত হয়ে ঊর্ধমার্গে উত্থিত হয় এবং আঘাতের দ্বারা নাভি-হৃদয়-কণ্ঠ-মুখে ধ্বনিকে প্রকটিত করে।

ব্রহ্মগ্রন্থি বলতে কি বোঝায়? সুষুম্নার সহিত ইড়া-পিঙ্গলা—এই দুটি নাড়ীর সম্বন্ধস্থল হচ্ছে ব্রহ্মগ্রন্থি বা নাভিকন্দ। এই ব্রহ্মগ্রন্থি থেকেই বায়ুর উৎপত্তি হচ্ছে।

এই সমস্ত ব্যাপারটাই অনুভূতিসাপেক্ষ। এর মূলকথা হল আবেগ,—প্রকাশের উন্মাদনা যা আগুনের মত প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, বায়ুর মত প্রধাবিত হয়। কবিগুরু এই উন্মাদনাকেই গানে প্রকাশ করেছেন—"তুমি যে সুরের আগুন জ্বলিয়ে দিলে মোর প্রাণে।"

নাদের আরও পাঁচটি প্রকারভেদ আছে—অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট এবং কৃত্রিম। সূক্ষ্মনাদ গুহাবাসী, অতিসূক্ষ্মনাদ হৃদয়ে অবস্থিত; পুষ্ট বা ব্যক্তনাদ কণ্ঠাশ্রিত, অপুষ্ট বা অব্যক্তনাদ তালুদেশে স্থিত; এবং কৃত্রিমনাদ মুখদেশ আশ্রয় করে।

শাস্ত্রকারগণ নাদ শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। ন-কার হচ্ছে প্রাণসংজ্ঞক; আর—দ-কার অগ্নিসংজ্ঞক। প্রাণ এবং অগ্নি থেকে জাত হয়েছে এই নাদ। আবার কেউ বলেন—'নন্দতে ইতি নাদঃ'—অর্থাৎ যা নন্দন করে তাই নাদ।

ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করে বলা হয়েছে যে নাদ হৃদয়সম্ভূত তার আখ্যা মন্দ্র; কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন নাদের নাম মধ্য, আর,—মস্তিষ্কসম্ভূত যে নাদ তার সংজ্ঞা—তার। মন্দ্রস্বরের দ্বিগুণ হচ্ছে মধ্য এবং মধ্যের দ্বিগুণ হচ্ছে—তার।

নাদকে বাইশটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি অংশ শ্রুতি বলে পরিচিত। শ্রবণ থেকেই শ্রুতি শব্দটি এসেছে। শ্রবণেন্দ্রিয় যে ধ্বনিকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় তাই শ্রুতি।

এই বাইশটি শ্রুতি—সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি স্বরে পরিব্যাপ্ত। দর্পণে যেমন দর্শকের মুখ প্রতিফলিত হয় তেমন স্বরগুলির মধ্যে শ্রুতিসমূহ প্রতিফলিত হচ্ছে। তন্ত্রীতে প্রথম আঘাতের ফলে একটি ধ্বনি রণিত হয়। এই রণনটিই শ্রুতি, অর্থাৎ প্রথমজাত যে কোন ধ্বনিই শ্রুতি নামে অভিধেয়। কিন্তু এই ধ্বনির পরেই একটি স্নিগ্ধ অনুরণন হয় যা অতি শ্রুতিমধুর তারই নাম স্বর। শ্রোতৃচিত্তকে স্বতই যা রঞ্জন করে তাই স্বর। ধ্বনিমাত্রই শ্রুতি কিন্তু সেই শ্রুতি মাধুর্যগুণযুক্ত হলে তবেই স্বর বলে স্বীকৃত হয়।

ধ্বনি, নাদ এবং শব্দের উল্লেখ করা হল। এখন এল বাক্যের প্রসঙ্গ।

বাক্যাংশকে সঙ্গীতশাস্ত্রে 'মাতু' বলা হয়েছে এবং গেয় অংশ, অর্থাৎ সঙ্গীতের কাঠামোকে বলা হয়েছে—'ধাতু'। মাতু-শব্দটি এ যুগে আর প্রচলিত নেই এবং ধাতুর শব্দেরও ব্যবহার দেখতে পাই না। তবে এটি ব্যবহার করা উচিত। বর্তমান গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই অংশ-গুলিই ধাতু নামে পরিচিত। বাক্য এবং গেয় এই দুটি অংশই যিনি পরিস্ফুট করেন তিনি হচ্ছেন—'বাগ গেয়কার'।

বাগ্‌গেয়কারের যে লক্ষণসমূহ আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে তা থেকে ধারণা হওয়া উচিত যে প্রকৃত শিল্পিগণ মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং বহু শাস্ত্রেই তাঁদের পারদর্শিতা ছিল। এত বড় পণ্ডিত হওয়া কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সবাই যে এমন সর্ববিদ্যাপারঙ্গম ছিলেন তা মনে হয় না, তবে শিল্পীর একটা নির্দিষ্ট মান ছিল এবং সাধারণত তাঁরা সুশিক্ষিত হতেন। বাগ্‌গেয়কারের লক্ষণ বর্ণনা করা যাক।

শব্দানুশাসন এবং অভিধানে তাঁদের প্রবীণতা থাকত। শব্দানুশাসন মানে ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান। ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁরা কোন্‌টা সুশব্দ কোন্‌টা অপশব্দ তা বিবেচনা করতে সক্ষম হতেন। অভিধানের জ্ঞান বলতে বিবিধ কোষগ্রন্থে অধিকার বোঝায়। যেমন, অমরকোষের মত অভিধান হয়তো তাঁদের অনেকের কণ্ঠস্থ থাকত। ছন্দশাস্ত্রে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং বিবিধ ছন্দের প্রভেদ তাঁরা অনায়াসে নির্ণয় করতে পারতেন। ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল সেটি আমরা প্রবন্ধসঙ্গীতের আলোচনা কালে বুঝতে পারব। ছন্দশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলিও সঙ্গীতে প্রযুক্ত হত। প্রচলিত জনপ্রিয় ছন্দ থেকে অনেক গীতরূপও গড়ে উঠেছিল। বাগ্‌গেয়কারগণ শৃঙ্গার প্রভৃতি রস এবং নানা ভাববৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিদগ্ধ ছিলেন। বহুভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁরা এবং কলাশাস্ত্রে তাঁদের দক্ষতা ছিল। আমাদের শাস্ত্রে চৌষট্টি প্রকার কলার উল্লেখ আছে। এর মধ্যে সঙ্গীত (নৃত্য-গীত-বাদ্য) অন্যতম। সুতরাং সঙ্গীতের চর্চা ছাড়াও অপরাপর বিবিধ কলার সঙ্গে পরিচয়ও তাঁদের ছিল। এঁদের কণ্ঠসম্বন্ধে 'হৃদ্যশারীর'—এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হৃদ্য মানে হচ্ছে রমণীয়। সঙ্গীতে দক্ষতা যাঁদের শরীরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে তাঁদের 'শারীর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শক্তি থাকলেও সাধনার প্রয়োজন হয়, এবং অনেকেই বিশেষ অভ্যাসের ফলে

রাগের অভিব্যক্তিতে সমর্থ হন। যিনি উৎকৃষ্ট বাগ্‌গেয়কার তাঁর স্বাভাবিক ধ্বনিই এমনি যে অভ্যাস ছাড়াও স্বাভাবতই তাঁর কণ্ঠ রাগাভিব্যক্তিতে সমর্থ হয়। এই স্বাভাবিক ক্ষমতাটিই হচ্ছে শারীরগুণ। লয়, তাল এবং মাত্রাজ্ঞান ছাড়া নানারকম ধ্বনির বিকারে তাঁদের পারদর্শিতা ছিল। এই ধ্বনি-বিকারের আখ্যা 'কাকু'। এই কথাটি কাব্যের অলঙ্কারশাস্ত্রেও ব্যবহৃত হয়। কথা বলার বিবিধ ভঙ্গী আছে। উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে বা গলার আওয়াজে অনেক সময় এক-একটা কথার বিশেষ অর্থ ফুটে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে কাকু বলা হয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে কাকু বক্রোক্তির একটি অঙ্গ। বাগ্‌গেয়কারকে প্রভূত প্রতিভাশালী বলা হয়েছে। প্রতিভা হচ্ছে প্রজ্ঞাবিশেষ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান,—এই ত্রিকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে নব নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা তাকেই প্রতিভা বলা হয়। অতএব প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীর সৃষ্টিতে চিরন্তন গুণ বর্তমান। দেশী রাগে এঁদের অভিজ্ঞতা ছিল,—চিত্তের সরসতা ছিল এবং আর-একটি মহৎগুণ ছিল—সেটি হচ্ছে 'উচিতজ্ঞতা,' রসভঙ্গ যাতে না ঘটে সেইজন্য কোন কৌশলের প্রয়োগ কি পরিমাণে করতে হবে—এই ঔচিত্যবোধকেই উচিতজ্ঞতা বলা হয়েছে। গানে যেসব কথা থাকত সেগুলি যাতে অন্যের উক্তির সঙ্গে মিশে একটা ভেজাল বস্তুতে পরিণত না হয় সেদিকে এঁদের লক্ষ্য থাকত। অথচ, প্রখর কাব্যবোধ এবং দ্রুত গীতনির্মাণক্ষমতাও এঁদের ছিল। এ ছাড়া সাঙ্গীতিক সংগঠন তাঁরা সঙ্গতভাবে রক্ষা করতেন। মন্দ্র, মধ্য এবং তার—এই তিন স্থানে এঁদের গলা স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করত। আলাপেও এঁদের দক্ষতা ছিল।

এতগুলি গুণ যাঁদের ছিল তাঁরাই ছিলেন উত্তম বাগ্‌গেয়কার। মধ্যম ছিলেন তাঁরা যাঁরা গানের অবয়ব অর্থাৎ টেকনিকের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতেন। যাঁরা বাক্যাংশ ভালই প্রস্তুত করতেন অথচ সঙ্গীতাংশ ভাল সংযোগ করতে পারতেন না তাঁরা অধম শ্রেণীর বাগ্‌গেয়কার হিসাবে পরিগণিত হতেন।

সঙ্গীতরচয়িতা সম্বন্ধেও এইরকম বিভাগ করা হয়েছে। যিনি উত্তম-ভাবে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে পারেন তিনি বস্তুকবি; যিনি বস্তুর চেয়ে বর্ণনায় ভাল তিনি বর্ণকবি এবং যিনি অন্য ধাতুতে মাতুরচনা করেন তিনি কুট্টিকার, অর্থাৎ যিনি প্রচলিত কোনো গীতরূপকে পরিবর্তিত করে প্রকাশ করেন তিনিই কুট্টিকার। কল্লিনাথের মতে সঙ্গীতরচয়িতা হিসাবে

শেষোক্ত জন অধমশ্রেণীভুক্ত। কুট্টন শব্দের অর্থ ছেদন—এই থেকেই কুট্টিকার শব্দটি এসেছে।

আগেকার দিনে শব্দের অর্থাৎ যাকে আমরা আওয়াজ বলি তার চারটি ভেদ ছিল -খাহুল, নারাট, বোম্বক এবং মিশ্রক।

যে স্বর কফজ অর্থাৎ ঈষৎ শ্লেষ্মাজড়িত স্নিগ্ধমধুর, সুকুমার এবং মন্দ্র ও মধ্যস্থানে পরিব্যাপ্ত তাকে খাহুল বলা হয়। এটিকে আমরা খোলা আওয়াজ বলি। এই মন্দ্রমধ্য স্থানে পরিব্যাপ্তির সাঙ্গীতিক নাম ছিল—'আভিন্ন'। নারাটস্বরের বিস্তৃতি আরও একটু বেশি, অর্থাৎ এই স্বরের অধিকারী মন্দ্র-মধ্য থেকে তার পর্যন্ত কণ্ঠকে বিস্তৃত করতে পারেন। এই ধ্বনি পিত্তোৎপন্ন, ঘন, গম্ভীর এবং অভগ্ন। এই আওয়াজকেই আমরা নিরেট বলি। বোম্বক হচ্ছে নিকৃষ্ট ধ্বনি। এই স্বর অন্তর্নিঃসার, অর্থাৎ, ভেরেণ্ডা গাছের কাণ্ডের ভিতরটা যেমন ফাঁপা তেমনি এই আওয়াজ অন্তঃসারশূন্য। এটি ঘনত্ববিরোধী। তা ছাড়া এ ধ্বনি পরুষ, স্নিগ্ধতাহীন। যখন চাড়ার দিকে ওঠে তখন গর্দভধ্বনির মত শোনায়। এই স্থূলধ্বনি বাতযুক্ত।

যে স্বরে এই তিন প্রকার ধ্বনির মিশ্রণ লক্ষিত হয় তার নাম মিশ্রক। এর অপর নাম সান্নিপাতিক স্বর, অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত তিন শ্রেণীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত ধ্বনি। এই কফজ, পিত্তজ এবং বাতজ স্বরের দোষগুণ কবিরাজ বলতে পারেন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়; তবে এইগুলি সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠছে। মিশ্রস্বরকে যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে এটাও স্বীকার করতে হয় যে আমরা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশকে মেনে নিচ্ছি। যেমন, বোম্বস্বর রুক্ষগুণযুক্ত আর খাহুল হচ্ছে স্নিগ্ধতাসম্পন্ন। এক্ষেত্রে মিশ্রণ হলে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হচ্ছে এটাই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যা সম্ভাব্য অর্থাৎ অবিরুদ্ধ গুণের সংমিশ্রণ সেটাই হবে, বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—মাধুর্যাদিগুণের সঙ্গে স্থৌল্যাদিগুণের বিরুদ্ধতা নেই—অতএব এইটি হতে পাবে। কিন্তু ঘনত্ব-গুণের সঙ্গে নিঃসারতার সংযোগ হতে পারে না। এটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটা সম্ভব না।

এই মিশ্রক শ্রেণীর চারটি ভেদ—নারাট-খাহুল, নারাট-বোম্বক, বোম্ব-খাহুল, মিশ্রিতাশ্রয়। বলা বাহুল্য যে-মিশ্রণে রুক্ষতা এবং নিঃসারতা নেই

সেটি উত্তম।" সুতরাং নারাট এবং খাহুলের মিশ্রণই উত্তম। বোম্ব-খাহুল মিশ্রণকে মধ্যম বলা যায়। নারাট-বোম্বক হচ্ছে অধম মিশ্রণ।

ধ্বনিগুণ অনুসারে নারাট-খাহুলের দশ ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—মধুরস্নিগ্ধঘন, স্নিগ্ধকোমলঘন, মধুরমৃদুত্রিস্থানক, মৃদুত্রিস্থানগম্ভীর, স্নিগ্ধমৃদুঘনত্রিস্থান, মধুরমৃদুত্রিস্থানকঘন, মধুরস্নিগ্ধমৃদুত্রিস্থানক, মধুরস্নিগ্ধগম্ভীর-ঘনত্রিস্থান, স্নিগ্ধকোমলগম্ভীরঘনত্রিস্থানলীনক, স্নিগ্ধমধুরকোমলসান্দ্রলীনক-ত্রিস্থানশোভীগম্ভীর।

খাহুল-বোম্বকের ছটিভেদ—স্নিগ্ধকোমলনিঃসার,মধুরমৃদুরুক্ষ, মৃদুস্নিগ্ধনিঃসা-রোচ্চার, কোমলস্নিগ্ধনিঃসারস্থূল এবং মধুরকোমলরুক্ষনিঃসারপীন।

নারাট-বোম্বকেরও ছয় রকমের ভেদ—ঘনত্রিস্থানরুক্ষক, ঘনগম্ভীররুক্ষ, লীনপীবরনিঃসাররুক্ষ, লীনঘনোচ্চতরপীবর, ত্রিস্থানঘনগম্ভীরলীনরুক্ষ এবং ত্রিস্থানলীন-নিঃসাররুক্ষস্থূল।

পূর্বেই বলেছি এই তিন মিশ্রস্বরের যোগে শব্দের যে রূপ হয় তার আখ্যা সান্নিপাতিক। উক্ত স্বরের আট রকম ভেদ আছে—স্নিগ্ধত্রিস্থাননিঃসার—মৃদুমধুরঘন, গম্ভীরোচ্চতররুক্ষ, স্নিগ্ধকোমল, ত্রিস্থানলীননিঃসারপীবরোচ্চতর, মধুরলীনত্রিস্থানকক্ষপীবর নিঃসারোচ্চতর, মধুরস্নিগ্ধকোমলত্রিস্থানঘনগম্ভীর-লীনোচ্চতর, মধুরমৃদুগম্ভীরলীনত্রিস্থানরুক্ষকনিঃসারোচ্চতর, কোমলমধুরঘনলীন-ত্রিস্থানরুক্ষোচ্চতরপীবরতাযুক্ত।

বর্ণিত ভেদগুলি সর্বসমেত হল ত্রিশ প্রকার। এ ছাড়া সূক্ষ্মভেদ বহুপ্রকার হতে পারে কিন্তু তাতে গ্রন্থের বিস্তৃতি ভিন্ন অপর কোন তাৎপর্য নেই।

শব্দ বলতে এখানে কণ্ঠ বোঝানো হয়েছে। কণ্ঠের পোনেরোটি গুণ—মৃষ্ট, মধুর, চেহাল, ত্রিস্থানক, সুখাবহ, প্রচুর, কোমল, গাঢ়, শ্রাবক,করুণ, ঘন, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, রক্তিযুক্ত এবং ছবিমান। সঙ্গীতের দিক থেকে এই শব্দগুলির এক-একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থগুলি নির্ণয় করা যাক।

মৃষ্ট (মৃজ্+ক্ত)—মৃজ্ ধাতুর মানে হচ্ছে মার্জন, অর্থাৎ মার্জিত কণ্ঠই হচ্ছে মৃষ্ট।

চেহাল—নাতিস্থূল এবং নাতিকৃশ অথচ স্নিগ্ধ স্বরের নাম চেহাল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে এইগুণটি স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে একটু কৃত্রিমভাবে কণ্ঠকে সঙ্কোচিত করে এই আওয়াজটির সৃষ্টি করতে হয়। একটু চেপে গাইলে কণ্ঠ স্বীয়

পরিধিকে অতিক্রম করে না। তখনই স্থুলত্বকে আশ্রিত করে লালিত্য সম্পাদন করা যায়। কিন্তু ছেলেদের বয়স যখন অল্প থাকে তখন এমনিতেই আওয়াজ নাতিস্থূল এবং নাতিকৃশ থাকে ; —তারুণ্যাবস্থায় এই স্বরটিকে কিন্তু চেহাল বলা উচিত নয় কেননা সেটি স্থায়ী নয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ বদলাবে। কণ্ঠস্বর যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে তখনই তার স্বাভাবিক গুণ নির্ধারণ করতে হবে, তার আগে নয়।

ত্রিস্থানক—ত্রিস্থানের সঙ্গে মধুর গুণের তেমন তফাত নেই। এখানেও মধ্য, মন্দ্র এবং তার - এই তিন স্থানে কণ্ঠের ব্যাপ্তি বোঝাচ্ছে। এই ব্যাপ্তি অবিকৃত হওয়া উচিত।

সুখাবহ—মনকে সুখী করবার গুণটিই সুখাবহ বলে পরিচিত।

প্রচুর—স্থূলতাযুক্ত কণ্ঠকে প্রচুর গুণসম্পন্ন বলা হয়।

কোমল - কোকিলধ্বনির মত সৌকুমার্যসম্পন্ন গুণকে কোমল বলা হয়।

গাঢ়—প্রাবল্যহেতু যে স্বর প্রসারতাগুণসম্পন্ন তাকে গাঢ় বলা হয়।

শ্রাবক—স্বরের দূরবিস্তৃতিকে শ্রাবকগুণ বলা হয়।

করুণ—শ্রোতৃচিত্তে যা কারুণ্য উৎপাদন করে সেই গুণটির নাম করুণ।

ঘন—দূরশ্রবণযোগ্যতাসম্পন্ন এবং অন্তঃসারত্বযুক্ত অর্থাৎ ভরাট নিটোল স্বরকে ঘন বলা হয় হয়।

স্নিগ্ধ—দূরসংশ্রাব্য এবং অরুক্ষ ধ্বনিকে স্নিগ্ধ বলা হয়।

শ্লক্ষ্ণ—(শ্লিষ্—আলিঙ্গন করা+স্ন, ই-লোপ) সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ছিদ্রহীন তৈলাধারের মত মসৃণ ধ্বনি বোঝায়।

রক্তিযুক্ত—অনুরাগসঞ্চারী স্বর

ছবিমান—দীপ্তিসম্পন্ন স্বর। কণ্ঠগুণে অনেক সময় সঙ্গীত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। টীকাকাব সিংসভূপাল এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন-যতশ্চ শব্দে জ্যোতিঃ প্রতীয়তে।

কণ্ঠের দোষ আট প্রকার—রুক্ষ, স্ফুটিত, নিঃসার, কাকোলী, কেটি, কেণি, কৃশ, ভগ্ন।

রুক্ষ শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা যে অর্থে এই শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করি সঙ্গীতেও এটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স্ফুটিত—এই শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে বিদীর্ণ, অর্থাৎ যে গলায় একটা
ফাটা ভাব থাকে তাকে স্ফুটিত বলা হয়।

নিঃসার—পূর্বেই বলেছি ভেরেণ্ডা গাছের ডাঁটার মত ফাঁপা আওয়াজকে
নিঃসার বলে।

কাকোলী—কাকের ডাকের মত নিষ্ঠুর আওয়াজকে কাকোলী বলে।

কেটি—আওয়াজ খাদ থেকে চড়ায় বিস্তৃত হলেও অনেক সময় তা
মাধুর্যগুণসম্পন্ন হয় না। এই অভাবকেই কেটি বলে। আমরা
যাকে ক্যাঁটকেটে আওয়াজ বলি কেটি হচ্ছে তাই।

কেণি—যে কণ্ঠ সপ্তকে সঞ্চরণ করতে ক্লেশবোধ করে তাকে বলে কেণি॥
আমরা এইরকম আওয়াজকেই ক্যানকেনে আওয়াজ বলি।

কৃশ—আওয়াজ বেশি সূক্ষ্ম হলে তাকে কৃশ বলে।

ভগ্ন—গর্দভধ্বনিত মত নীরস আওয়াজকে ভগ্ন বলে।

এই যে শব্দের গুণ এবং দোষ বিশেষভাবে বিচার করা হয়েছে—এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বৃন্দগায়নের দিক থেকে। আজকাল যাকে আমরা কোরাস বলি,—বৃন্দগায়ন বলতে তাই বোঝায়, অর্থাৎ সম্মেলক গান।

একটি উত্তম বৃন্দে মুখ্য গায়ক থাকা উচিত চার জন, সহযোগী গায়ক—আট জন, গায়িকা—বারো জন। এ ছাড়া, বংশীবাদক চার জন এবং মার্দঙ্গিক চার জন। এই সংখ্যার অর্ধেক হলে তাকে বলা হয় মধ্যম বৃন্দ, অর্থাৎ মুখ্য গায়ন দু জন, সহযোগী চার জন, গায়িকা ছ জন বংশিক দু জন এবং মার্দঙ্গিক দু জন। এরও কম, অর্থাৎ মুখ্যগায়ন একজন সহযোগী তিন জন, গায়িকা চার জন, বংশিক দু জন এবং মার্দঙ্গিক দু জন হলে তাকে কনিষ্ঠ বৃন্দ বলা হয়। উত্তম বৃন্দের চেয়ে অধিক সংখ্যক শিল্পীর সমাবেশ হলে তাকে কোলাহল বৃন্দ বলা হয়। আজকাল বহু ক্ষেত্রে যে বৃন্দের সমাবেশ হয় তা হচ্ছে এই কোলাহল বৃন্দ। কেবলমাত্র গায়িকাদের নিয়েও বৃন্দ গঠিত হয়।

এই সব বৃন্দ খুব বাছাই করে প্রস্তুত করা নিয়ম এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কণ্ঠের দোষগুণ বিচার করে শিল্পী নিয়োগ করা কর্তব্য। কেবলমাত্র কণ্ঠের বৈষম্য, গুণ এবং দোষের প্রতি সেকালে সঙ্গীত প্রযোজকগণ কত অভিজ্ঞ ছিলেন এই দীর্ঘ বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

শ্রুতি প্রসঙ্গ

"শ্রবণাৎ শ্রুতয়ো মতাঃ"— শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বনি হচ্ছে শ্রুতি। সঙ্গীতের পরিধি অনুযায়ী বাইশটি শ্রুতিই যথেষ্ট বলে পরিগণিত হয়েছে। এই বাইশটি শ্রুতি সাতটি স্বরে বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু এই বাইশটি শ্রুতি গলায় পর পর দেখানো অসম্ভব, সুতরাং বীণার সাহায্যে এই শ্রুতিগুলিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

এই উপলক্ষ্যে দুটি বীণার পরিকল্পনা করা হয়েছে—একটি ধ্রুববীণা আর-একটি চলবীণা। দুটি বীণার নাদসাম্য হওয়া চাই। প্রত্যেকটিতে বাইশটি করে তন্ত্রী স্থাপন করতে হবে। তার মধ্যে প্রথম তারটি এমনভাবে নিচু স্বরে বাঁধতে হবে যাতে একটি স্বর পরিস্ফুট হয় বা তার সাঙ্গীতিক ধ্বনিটুকু বজায় থাকে। তদপেক্ষা নিচু হলে তার কোন সাঙ্গীতিক মূল্যই থাকবে না;— অতএব সাঙ্গীতিক শ্রুতিবিচারে তার কোন সার্থকতা নেই। তার পরে একটু একটু চড়িয়ে বাইশটি তার বাঁধতে হবে অর্থাৎ প্রথম তার থেকে দ্বাবিংশতম তার পর্যন্ত উত্তরোত্তর চড়ে যাবে। কিন্তু এই ক্রম-তার গতিটি যেন যথাযথভাবে বজায় থাকে,অর্থাৎ দুটি তারের মধ্যে তৃতীয় ধ্বনির অবকাশ না থাকে। এই এক-একটি তারের শব্দই হচ্ছে এক একটি শ্রুতি।

দুটি বীণা তো শ্রুতি হিসাবে বাঁধা হল; এখন সপ্তক নির্ণয় করতে হবে। প্রথম তার থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ তারটি হল ষড়্জ অর্থাৎ সা। ষড়্জ স্বর চতুঃশ্রুতিক। ষড়্জের পর থেকে তৃতীয় তার হচ্ছে ঋষভ বা রে। বীণার সপ্তম তারটি হচ্ছে—রে। ঋষভ ত্রিশ্রুতিক। রে'র পর থেকে দ্বিতীয় তারটি, অর্থাৎ বীণার প্রথম থেকে নবম তারটি হচ্ছে গান্ধার। গান্ধার দ্বিশ্রুতিক। গান্ধারের পর থেকে চতুর্থ তারটি অর্থাৎ প্রথম থেকে তের নম্বরের তারটি হচ্ছে মধ্যম। মধ্যম চতুঃশ্রুতিক। মধ্যমের পর থেকে চতুর্থ তারটি, অর্থাৎ প্রথম থেকে সতেরো নম্বরের তারটি হল পঞ্চম। পঞ্চমও চতুঃশ্রুতিক। পঞ্চমের পর থেকে তৃতীয় অর্থাৎ কুড়ি নম্বরের তারটি হল ধৈবত বা ধা। ধৈবত ত্রিশ্রুতিক। ধৈবতের পর থেকে দ্বিতীয় তার, অর্থাৎ বাইশ নম্বরের তারটি হল নিষাদ বা নি। নিষাদ দ্বিশ্রুতিক।

দুটি বীণাই এখন একরকমভাবে বাঁধা হল। এর মধ্যে যে বীণাটি এই-

তারেই সুরবাঁধা অবস্থায় রইল সেটি হচ্ছে ধ্রুববীণা, অর্থাৎ এর আর নড়চড় নেই এবং শ্রুতিনির্ণয় করবার জন্য এই বীণাটিই আদর্শ বলে গণ্য করা হবে। অপর বীণাটির নাম দেওয়া হয়েছে চলবীণা।

"এই চলবীণার তন্ত্রীগুলির সারণা করা যায় বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে চলবীণা। সারণা শব্দের মানে হচ্ছে চালনা। এক্ষেত্রে এই চালনাটি স্বরের অপকর্ষণদ্বারা নিষ্পন্ন হচ্ছে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ধ্রুববীণায় যে স্বরগুলি অবস্থিত আছে চলবীণার তন্ত্রীগুলিকে কথঞ্চিৎ শিথিল করে সেই স্বরগুলিকে উক্ত বীণায় প্রদর্শন করতে হবে। এই শিথিল করবার একটা নিয়ম আছে। এটি সহজভাবে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

চলবীণায় যে সাতটি স্বর স্থাপন করা হয়েছে তাদের একটি শ্রুতি হিসাবে শিথিল করতে হবে। প্রথমে চলবীণার বাইশ নম্বর তারকে অপকর্ষণ করে ধ্রুববীণার একুশ নম্বর তারের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে এবং এইভাবে চলবীণার বাকি সব তারই এক এক শ্রুতি করে নেমে যাবে। এইটি হল প্রথম সারণা। এর পর চলবীণায় আর-একটি করে শ্রুতি শিথিল করতে হবে। এটি দ্বিতীয় সারণা, অর্থাৎ চলবীণার বাইশ নম্বর তারটিকে ধ্রুববীণার কুড়ি নম্বর তারের সঙ্গে মেলাতে হবে। অপর তন্ত্রীগুলিও এই নিয়মে অপকৃষ্ট হয়ে আসবে। ধ্রুববীণার কুড়ি নম্বরে 'রম্যা' নামক শ্রুতিতে ধৈবত স্বরটি অবস্থিত। চলবীণার বাইশ নম্বর শ্রুতিতে প্রথমে ছিল নিষাদ। দুই শ্রুতি অপকর্ষণের ফলে এটি ধ্রুববীণার ধৈবতে প্রবেশ করল। অনুরূপ-ভাবে চলবীণার মূল গান্ধারও দুই শ্রুতি অপকর্ষণের ফলে ধ্রুববীণার ঋষভে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

এর পরে আরো এক শ্রুতি অপকর্ষণ করা যাক। এটি হল তৃতীয় সারণা, অর্থাৎ চলবীণার বাইশ নম্বরের তন্ত্রী যেটি ধ্রুববীণার ধৈবতের সঙ্গে মিলে গেছে, তাকে আরও কমিয়ে ধ্রুববীণার উনবিংশ শ্রুতি রোহিণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া গেল। চলবীণার অন্যান্য তন্ত্রীগুলিও এই নিয়মে আরও এক এক শ্রুতি নিচে নেমে যাবে। এইবার দেখা যাবে চলবীণার মূল কুড়ি নম্বরের তার ধ্রুববীণার সতেরো নম্বর তারের সঙ্গে মিলে গেছে, অর্থাৎ, চলবীণার ধৈবত ধ্রুববীণার পঞ্চমে প্রবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে চলবীণার মূল ঋষভও ধ্রুববীণার ষড়্জে প্রবেশ করবে।

অতঃপর আরও এক শ্রুতির অপকর্ষণ হতে পারে। এটি হল চতুর্থ

সারণা। তৃতীয় সারণার ফলে চলবীণার বাইশ নম্বর তার ধ্রুববীণার রোহিণী পর্যন্ত নেমে গেছে ;—এর থেকে আরও এক শ্রুতির অপকর্ষণ হলে উক্ত তন্ত্রী ধ্রুববীণার আঠারো নম্বর শ্রুতি মদন্তীর সঙ্গে মিলবে এবং অপর তন্ত্রীগুলিও এক শ্রুতি করে নেমে যাবে। এইবার দেখা যাবে চলবীণার মূল সতেরো নম্বর তার ধ্রুববীণার তের নম্বরের সঙ্গে মিলে গেছে। অর্থাৎ চলবীণার পঞ্চম ধ্রুববীণার মধ্যমে প্রবিষ্ট হয়েছে। অনুরূপভাবে চলবীণার মূল মধ্যমও ধ্রুববীণার গান্ধারে প্রবেশ করবে এবং চলবীণার মূল ষড়জও ধ্রুববীণার মন্দ্রনিষাদে প্রবিষ্ট হবে। তবে এই মন্দ্রনিষাদটি ধ্রুববীণার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না কেন না তাতে বাইশটির বেশি তার নেই।

তাহলে চারিটি সারণায় আমরা ধ্রুববীণার সাতটি স্বর বা বাইশটি শ্রুতিই পাচ্ছি। কিন্তু চারটি শ্রুতি পর্যন্ত তারে অপকর্ষ করা সম্ভব তার চেয়ে নিচে হলে রঞ্জকত্ব বজায় থাকবে না।

এই প্রক্রিয়ায় এটি বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে শ্রুতিগুলি সমান অন্তরে অবস্থিত। ধ্রুববীণা এবং চলবীণায় স্বরস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় এইটি প্রমাণ করা।

টীকাকার সিংহভূপাল মতঙ্গের উল্লেখ করে বলেছেন—"দ্বিতীয় সারণায়াং শ্রুতিচতুষ্টয়লাভঃ। তৃতীয়ায়াং ষট্‌শ্রুতিলাভঃ। চতুর্থাং দ্বাদশশ্রুতিলাভঃ।" —এইভাবে বাইশটি শ্রুতি লাভ হয়েছে।

এটি কি ভাবে হল সেটি বোঝা দরকার। দ্বিতীয় সারণায় দুই শ্রুতির অপকর্ষ হচ্ছে, অর্থাৎ বাইশ নম্বর তারকে কমিয়ে কুড়ি নম্বরের সঙ্গে মেলানো হচ্ছে। এই কুড়ি নম্বর হচ্ছে ধৈবত। এইখানে নিষাদ থেকে ধৈবতের মধ্যে যে দুটি শ্রুতি রয়েছে সে দুটিকে লাভ করা গেল। এরপর ধা, পা এবং মা থেকে দুই শ্রুতি কমিয়ে আমরা আর কোন শুদ্ধ স্বরে পৌঁছোচ্ছি না, কিন্তু গান্ধারটি দুই শ্রুতি নিচে নামবার পর শুদ্ধ রে-তে আসছে। এই-খানে গান্ধার এবং রে-র মাঝামাঝি আরও দুটি শ্রুতিকে আমরা পাচ্ছি। এইভাবে দ্বিতীয় সারণায় আমাদের শ্রুতি-চতুষ্টয় লাভ হচ্ছে। তৃতীয় সারণা কালে তিনটি শ্রুতির অপকর্ষ ঘটিয়ে আমরা শুদ্ধ পঞ্চম ও ষড়্‌জ পাব। এই অপকর্ষের ফলে ধৈবত এবং পঞ্চমের মধ্যবর্তী তিনটি শ্রুতি এবং ঋষভ ও ষড়্‌জের মধ্যবর্তী আরও তিনটি শ্রুতি, অর্থাৎ ছটা শ্রুতি লাভ হচ্ছে। এইভাবে তৃতীয় সারণায় ষট্‌শ্রুতি লাভ হল। অনুরূপভাবে

চলবীণা ও ধ্রুববীণার সাহায্যে শ্রুতির অন্তর নির্ণয়

তন্ত্রীর সংখ্যা	শ্রুতির নাম (ধ্রুববীণা)	স্বরের নাম (ধ্রুববীণা)	প্রথম সারণা (চলবীণা)	দ্বিতীয় সারণা	চলবীণার স্বর ধ্রুববীণার প্রবেশ	তৃতীয় সারণা	চলবীণার স্বর ধ্রুববীণায় প্রবেশ	চতুর্থ সারণা	চলবীণার স্বর ধ্রুববীণায় প্রবেশ
১	তীব্রা		ক্ষোভিনী	উগ্রা		রম্যা		রোহিনী	
২	কুমুদ্বতী		তীব্রা	ক্ষোভিনী		উগ্রা		রম্যা	
৩	মন্দা		কুমুদ্বতী	তীব্রা		ক্ষোভিনী		উগ্রা	
৪	ছন্দোবতী	ষড়্জ	মন্দা	কুমুদ্বতী		তীব্রা		ক্ষোভিনী	সা→নি
৫	দয়াবতী		ছন্দোবতী	মন্দা		কুমুদ্বতী		তীব্রা	
৬	রঞ্জনী		দয়াবতী	ছন্দোবতী		মন্দা		কুমুদ্বতী	
৭	রতিকা	ঋষভ	রঞ্জনী	দয়াবতী		ছন্দোবতী	রে→সা	মন্দা	
৮	রৌদ্রী		রতিকা	রঞ্জনী		দয়াবতী		ছন্দোবতী	
৯	ক্রোধা	গান্ধার	রৌদ্রী	রতিকা	গা→রে	রঞ্জনী		দয়াবতী	
১০	বজ্রিকা		ক্রোধা	রৌদ্রী		রতিকা		রঞ্জনী	
১১	প্রসারিণী		বজ্রিকা	ক্রোধা		রৌদ্রী		রতিকা	
১২	প্রীতি		প্রসারিণী	বজ্রিকা		ক্রোধা		রৌদ্রী	
১৩	মার্জনী	মধ্যম	প্রীতি	প্রসারিণী		বজ্রিকা		ক্রোধা	মা→গা
১৪	ক্ষিতি		মার্জনী	প্রীতি		প্রসারিণী		বজ্রিকা	
১৫	রক্তা		ক্ষিতি	মার্জনী		প্রীতি		প্রসারিণী	
১৬	সন্দীপনী		রক্তা	ক্ষিতি		মার্জনী		প্রীতি	
১৭	আলাপিনী	পঞ্চম	সন্দীপনী	রক্তা		ক্ষিতি		মার্জনী	পা→মা
১৮	মদন্তী		আলাপিনী	সন্দীপনী		রক্তা		ক্ষিতি	
১৯	রোহিনী		মদন্তী	আলাপিনী		সন্দীপনী		রক্তা	
২০	রম্যা	ধৈবত	রোহিনী	মদন্তী		আলাপিনী	ধা→পা	সন্দীপনী	
২১	উগ্রা		রম্যা	রোহিনী		মদন্তী		আলাপিনী	
২২	ক্ষোভিনী	নিষাদ	উগ্রা	রম্যা	নি→ধা	রোহিনী		মদন্তী	

চতুর্থ সারণায় চারটি শ্রুতির অপকর্ষের ফলে আমরা শুদ্ধ মধ্যম, গান্ধার এবং নিষাদ পাচ্ছি। পঞ্চম এবং মধ্যমের মধ্যে চারটি শ্রুতি বর্তমান; আরও চারটি শ্রুতি রয়েছে মধ্যম এবং গান্ধারের মধ্যে। এই চারে চারে আটটি হল। আর ষড়্‌জ থেকে নিষাদের মধ্যে চার শ্রুতির ব্যবধান। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা বারটি শ্রুতি লাভ করছি। এইভাবে চারিটি সারণার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বাইশটি শ্রুতিই পাওয়া যাচ্ছে।

এই শ্রুতি থেকেই ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ—এই সাতটি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে। সংক্ষেপে এদের সা, রে, গা, মা, পা, ধা এবং নি বলা হয়। শ্রুতি এবং স্বরের সম্বন্ধ নিয়ে শাস্ত্রাদিতে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে এবং নানা উপমার প্রয়োগও হয়েছে,—যথা, ক্ষীর যেমন দধিরূপে অবস্থান করে তেমনি শ্রুতিগণ স্বররূপে অবস্থান করছে। অন্ধকারে অবস্থিত ঘটাদির যেমন প্রদীপ থেকে অভিব্যক্ত বটে তেমনি শ্রুতি থেকে স্বরের অভিব্যক্তি ঘটছে—ইত্যাদি। মতঙ্গ বলছেন—স্বয়ং হি[1] রাজতে যস্মাৎ তস্মাৎ স্বর ইতি স্মৃতঃ।

এই যে শ্রুতি থেকে উৎপন্ন স্বর-এর লক্ষণ কি? স্বর এবং শ্রুতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে শ্রুতির অনন্তর যা পাওয়া যাচ্ছে সেইটিই স্বর। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে আগে শ্রুতি কি তাই বল, তারপরে তার অনন্তর কি হচ্ছে তার কথা। প্রথমটা বলি। তারে আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বনি বা রণন উত্থিত হল তা হচ্ছে শ্রুতি। তারপরে যে অনুরণনটুকু হচ্ছে সেটিই স্বর। এই অনুরণনটি প্রথমোত্থিত রণনের চেয়ে স্নিগ্ধ। এই অনুরণন স্বতই শ্রোতৃচিত্তকে রঞ্জন করছে বলেই এর নাম স্বর।

বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যে যে শ্রুতিতে স্বর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি রঞ্জকত্বগুণসম্পন্ন। কিন্তু যদি স্বরের স্বতই রঞ্জন করবার ক্ষমতা থাকে, অর্থাৎ তারা স্বাধীনভাবেই স্বীয় সত্তাকে রক্ষা করতে পারে তাহলে এই শ্রুতিগুলির প্রয়োজন কি? অর্থাৎ, ষড়্‌জ, মধ্যম, পঞ্চম এইগুলি চতুঃশ্রুতিক, —ঋষভ, ধৈবত ত্রিশ্রুতিক এবং গান্ধার, নিষাদ দ্বিশ্রুতিক—এইরকম হবার সার্থকতা কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে পূর্বশ্রুতির অপেক্ষা রেখেই চতুঃশ্রুতিক বা ত্রিশ্রুতিক •প্রভৃতি স্বর নির্ণয় করা হয়। যদি পূর্বে কোন শ্রুতি না থাকে তাহলে কিসের অপেক্ষায় এই চতুর্থ্যাদির ব্যবহার হবে? যে-কোন একটি শ্রুতি একটি স্বর না হলেও একটি স্বরান্তর। এই স্বরান্তরগুলি

ক্রমে একটি নির্দিষ্ট স্বরে পূর্ণতালাভ করছে এবং তারপরে আবার কথঞ্চিৎ উচ্চতা ঘটলে আবার একটি শ্রুতির প্রয়োজন হচ্ছে। এইভাবে পুনরায় স্বরান্তরের উৎপত্তি হচ্ছে। এই নিয়মে বাইশটি শ্রুতিতে গঠিত চতুঃশ্রুতি, ত্রিশ্রুতি এবং দ্বিশ্রুতির গোষ্ঠীগুলি একটি সপ্তকে স্বরবৃত্তকে সম্পূর্ণ করছে।

শ্রুতির পাঁচটি জাতি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু এবং মধ্যা। ষড়্জস্বরে চারিটি জাতির অবস্থিতি—দীপ্তা, আয়তা, মৃদু এবং মধ্যা। ঋষভে তিনটি অবস্থান করে—করুণা, মধ্যা এবং মৃদু। গান্ধারে দুটি—দীপ্তা, আয়তা। মধ্যমে চারিটি—দীপ্তা, আয়তা, মৃদু, মধ্যা। পঞ্চমে চারিটি—মৃদু, মধ্যা আয়তা, করুণা। ধৈবতে তিনটি—করুণা, আয়তা, মধ্যা। নিষাদে দুটি—দীপ্তা এবং মধ্যা। এইভাবে বাইশটি শ্রুতিতে পাঁচটি জাতি সাজানো রয়েছে।

এই সব জাতিরও আবার অন্তর-জাতি আছে। সেগুলি এইরকম:—

দীপ্তা—তীব্রা, রৌদ্রী, বজ্রিকা, উগ্রা।

আয়তা—কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দীপনী, রোহিণী।

করুণা—দয়াবতী, আলাপিনী, মদন্তিকা।

মৃদু—মন্দা, রতিকা, প্রীতি, ক্ষিতি।

মধ্যা—ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তিকা, রম্যা, ক্ষোভিনী।

এই অন্তরজাতিগুলি কি ভাবে সাতটি স্বরে বর্তমান সেটি এইভাবে দেখান হয়েছে:—

ষড়্জ—তীব্রজাতীয় দীপ্তা, কুমুদ্বতীজাতীয় আয়তা, মন্দাজাতীয় মৃদু এবং ছন্দোবতীজাতীয় মধ্যা।

ঋষভ—দয়াবতীজাতীয় করুণা, রঞ্জনীজাতীয় মধ্যা, রতিকাজাতীয় মৃদু।

গান্ধার—রৌদ্রীজাতীয় দীপ্তা, প্রসারিণীজাতীয় আয়তা।

মধ্যম—বজ্রিকাজাতীয় দীপ্তা, প্রসারিণীজাতীয় আয়তা, প্রীতিজাতীয় মৃদু, মার্জনীজাতীয় মধ্যা।

পঞ্চম—ক্ষিতিজাতীয় মৃদু, রক্তিকাজাতীয় মধ্যা, সন্দীপনীজাতীয় আয়তা, আলাপিনীজাতীয় করুণা।

ধৈবত—মদন্তী জাতীয় করুণা, রোহিণীজাতীয় আয়তা, রম্যাজাতীয় মধ্যা।

নিষাদ—উগ্রজাতীয় দীপ্তা, ক্ষোভিনীজাতীয় মধ্যা।

এইসব নামকরণের উদ্দেশ্য কি বোঝাবার জন্য সিংহভুপাল বলছেন যে

এইসব নামের শ্রুতি শুনলে মনে সেইরকম বিকার ঘটবে। এইটি সূচনা করার জন্যই শ্রুতিজাতির নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন—দীপ্তাজাতীয় শ্রুতি কর্ণগোচর হলে মনে প্রদীপ্তভাবের উদয় হবে। এইরকম অপরাপর জাতি অনুসারে মনে সেইরকম ভাবান্তর উপস্থিত হবে।

স্বরাদির রসব্যঞ্জনা উপলক্ষে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু এই উক্তির বহুক্ষেত্রে মিল নেই। যেমন—গান্ধার এবং নিষাদে দীপ্তাজাতীয় শ্রুতি বিদ্যমান, কিন্তু এ দুটি স্বর করুণরসে প্রযুক্ত হচ্ছে। শ্রুতির অর্থ এবং রসবিচার একসঙ্গে মিলিয়ে করা হয় নি। দুটিকে আলাদা করে দেখা হয়েছে।

এইসব ষড়্জাদি স্বর মন্দ্র—মধ্য—তার স্থানভেদে তিন প্রকার। এই ভেদ কিন্তু তাত্ত্বিক, অর্থাৎ মূল প্রকৃতির দিক থেকে নয়, ভেদটি স্থান-কল্পিত। যেমন—দেবদত্ত ত্রিতল প্রাসাদের একতলা, দোতলা এবং তেতলায় অবস্থানকালে সেই দেবদত্তই থাকে কিন্তু স্থান পরিবর্তনে তার অবস্থান ভেদ হয়, তেমনি স্বরগুলিও আসলে পবিবর্তিত হয় না কিন্তু তাদের অবস্থানভেদ হতে পারে। অতএব মন্দ্রসপ্তকে যে ষড়্জ, মধ্যসপ্তকে বা তারসপ্তকে তার প্রকৃতি একই কিন্তু তফাত যেটুকু সেটুকু সে ওই স্থানপরিবর্তনে।

শুদ্ধ স্বর নিরূপণের পবে বারটি বিকৃত স্বরের আলোচনা আবশ্যক। ষড়্জাদি স্বর এবং শ্রুতির যে বিন্যাস পূর্বে দেখানো হয়েছে সেইটি হচ্ছে ষড়্জ গ্রাম। এইটিই মুখ্য গ্রাম বলে স্বীকৃত।

ষড়্জ চ্যুত এবং অচ্যুত—এই দুইভাবে বিকৃত হয়। সাধারণভাবে ষড়্জ হচ্ছে চতুঃশ্রুতিক। এর প্রথম শ্রুতি তীব্র, দ্বিতীয় কুমুদ্বতী, তৃতীয় মন্দা এবং চতুর্থ ছন্দোবতী। ষড়্জ এই চতুর্থ শ্রুতি অর্থাৎ ছন্দোবতীতে স্থাপিত। এই ছন্দোবতী থেকে প্রচ্যুত হয়ে তৃতীয় শ্রুতি মন্দায় অবস্থিত হলেই ষড়্জকে চ্যুত বলে গণ্য করতে হবে। এই বিকৃতি হচ্ছে 'চ্যুত-ষড়্জ'।

ষড়্জের চারিটি শ্রুতির মধ্যে প্রথম দুটি শ্রুতি নিষাদ আশ্রয় করলে সেই নিষাদকে বলা হয় 'কাকলী'। নিষাদ দ্বিশ্রুতিক। এই দুটি শ্রুতি হচ্ছে উগ্রা এবং ক্ষোভিনী। এই দুটির সঙ্গে ষড়্জের প্রথম দুই শ্রুতি তীব্রা এব কুমুদ্বতীর যোগ হয়ে নিষাদ কুমুদ্বতীতে অবস্থিত হলে নিষাদের কাকলীত্ব ঘটে। এই অবস্থায় ষড়্জ তার চতুর্থ শ্রুতি অধিকার করে থাকলেও তাকে বিকৃত বলে গণ্য করতে হবে। এই রকম ষড়্জকে 'অচ্যুত-ষড়জ আখ্যা

দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ষড়্জ তার আসল স্থান 'ছন্দোবতী' থেকে চ্যুত হয় নি, অচ্যুত অবস্থায় আছে এবং ধ্বনির বিকারও ঘটছে না। কিন্তু, তাহলে কিভাবে বিকৃতি ঘটল? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে যদিও পূর্ব-শ্রুতিহীনত্বে তৎস্থানস্থিতিত্বহেতু ধ্বনিবিকার ঘটছে না তথাপি নিষাদের কাকলীত্ব ঘটাতে ষড়্জের আয়তত্ব ক্ষুণ্ণ হল। নিষাদ স্বাভাবিকভাবে দ্বিশ্রুতি অধিকার করে থাকলে ষড়্জের আয়তত্ব বজায় থাকে; কিন্তু যখন কাকলীত্ব-হেতু নিষাদ ষড়্জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে অবস্থান করে তখন ষড়জের দ্বিশ্রুতিত্ব ঘটে এবং এতে অনায়তত্ব প্রতীয়মান হয়। এই কারণে অচ্যুত-ষড়্জকেও বিকৃত বলে গণ্য করতে হবে।

এরপর ঋষভের বিকৃতি। ষড়্জ—সাধারণে ঋষভ ষড়্জের অন্তিম শ্রুতি অধিকাব করে। ঋষভ ত্রিশ্রুতিক; কিন্তু—ষড়্জের শেষ শ্রুতি ছন্দোবতীকে আশ্রয় করায় এটি চতুঃশ্রুতিক হয়ে গেল অথচ ধ্বনির দিক থেকে কোন বিকার ঘটল না, কেননা ঋষভ তার স্বস্থান অর্থাৎ শেষশ্রুতি 'রতিকা'কে অধিকার করে আছে। তথাপি এই চতুঃশ্রুতিত্বের জন্য ঋষভ এক্ষেত্রে বিকৃত বলে পরিগণিত হচ্ছে। অতএব ঋষভের একটি বিকৃতি আমরা পাচ্ছি।

এরপর গান্ধারের বিকৃতি। গান্ধার দ্বিশ্রুতিক। এই দুটি হচ্ছে—রৌদ্রী এবং ক্রোধা। এর সঙ্গে যদি মধ্যমের প্রথম শ্রুতি 'বজ্রিকা'র যোগ হয় তাহলে মধ্যমের সাধারণত্ব ঘটে। মধ্যম সাধারণ হলে গান্ধার দ্বিশ্রুতিকের স্থলে ত্রিশ্রুতিক হওয়ায় বিকৃত হয়। গান্ধারের আরও একটি বিকৃতি ঘটে। গান্ধার যখন মধ্যমের আদি শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করে তখন তার চতুঃশ্রুতিত্ব ঘটে। এই বিকৃতি হলে গান্ধারকে 'অন্তর-গান্ধার' নামে অভিহিত করা হয়। অতএব গান্ধারের দুটি বিকৃতি—একটি মধ্যম-সাধারণ, অপরটি, অন্তর-গান্ধার অন্তর অবস্থাকে অন্তর-সাধারণ বলেও অভিহিত করা হয়।

অতঃপর মধ্যমের বিকৃতি। মধ্যম চতুঃশ্রুতিক। মধ্যম সাধারণ হলে অর্থাৎ গান্ধার কর্তৃক মধ্যমের প্রথম শ্রুতি অধিকৃত হলে এবং মধ্যম তৃতীয় শ্রুতিতে অধিস্থিত হলে বিকৃতি ঘটে। গান্ধার অন্তর হলে মধ্যম দ্বিশ্রুতিক হবার দরুণও আর-একটি বিকৃতি ঘটেছে। অতএব এক্ষেত্রেও মধ্যম-সাধারণ এবং অন্তর গান্ধার হবার দরুণ মধ্যমের দুটি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এর পর পঞ্চমের বিকৃতি। পঞ্চম চতুঃশ্রুতিক। এগুলি ক্রমান্বয়ে হচ্ছে—ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী এবং আলপিনী। পঞ্চম তৃতীয় শ্রুতি, অর্থাৎ

সন্দীপনীতে অবস্থান করলে সম্পূর্ণ স্বরগ্রামকে মধ্যমগ্রামে বলা হয়। এই মধ্যমগ্রামে পঞ্চম ত্রিশ্রুতিক হওয়ায় বিকৃত হয়। এই ত্রিশ্রুতিক পঞ্চমের সঙ্গে মধ্যমের অন্তিম শ্রুতি যোগ হলে এই চতুঃশ্রুতিত্বও একটি বিকৃতি বলে পরিগণিত হয়। এইটি হচ্ছে কৈশিক পঞ্চম। অতএব পঞ্চমের দুটি বিকৃতি পাওয়া গেল—একটি মধ্যমগ্রামে, অপরটি মধ্যমের অন্তিম শ্রুতিগ্রহণে।

এরপর ধৈবতের বিকৃতি। মধ্যমগ্রামে পঞ্চমের তৃতীয় শ্রুতিতে অবস্থিতি-হেতু পঞ্চমের অন্তিম শ্রুতি ধৈবতের অন্তর্ভুক্ত হলে ধৈবত চতুঃশ্রুতিক হয়। এটি একটি বিকৃতি।

অবশেষে নিষাদের বিকৃতি। শাস্ত্রকার বলেছেন—নিষাদ যদি ষড়্জের প্রথম শ্রুতি অধিকার করে এবং ঋষভ তার অন্তিম শ্রুতি গ্রহণ করে তাহলে ষড়্জ-সাধারণ ঘটে। নিষাদ স্বাভাবিকভাবে দ্বিশ্রুতিক। ষড়্জ সাধারণে এর ত্রিশ্রুতিত্ব ঘটায় একটি বিকৃতি ঘটেছে। এইটি হচ্ছে কৈশিক নিষাদ। আবার, কাকলীত্বেও নিষাদের অপর একটি বিকৃতি ঘটছে।

এইভাবে শাঙ্গ´দেব বারটি বিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

নিষাদ কাকলী হলে একে কাকলী সাধারণ বলা হয়, কেননা এতে ষড়্জ এবং নিষাদের মধ্যে সাধারণত্ব সূচিত হয়, অর্থাৎ ষড়্জের আয়তত্ব ক্ষুণ্ণ হল এবং নিষাদও স্বস্থানে রইল না। এই অবস্থাকেই সাধারণ অবস্থা বলা হয়েছে। কল্লিনাথ বলছেন—"ধর্মপরত্বেন সাধারণম্"। অনুরূপভাবে গান্ধার যখন অন্তর হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় অন্তর সাধারণ।

এই কাকলী এবং অন্তরের প্রয়োগবিধির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। আরোহণক্রমে কাকলী এবং অন্তরসাধারণের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যখনই কাকলী নিষাদের প্রয়োগ হবে তখনই আগে ষড়্জ পযন্ত যেতে হবে, তারপরে কাকলী নিষাদ উচ্চারণের পর ধৈবত প্রয়োগ করতে হবে; অর্থাৎ প্রথমে 'সা' তাবপরে 'কাকলী নি' তারপরে 'ধা'—এই ক্রমটি বজায় রাখতে হবে। অন্তর গান্ধারের বেলাতেও আগে মধ্যম উচ্চারিত হবে, তারপরে অন্তরগান্ধার এবং অতঃপর ঋষভ। এর একটি বিকল্প বিধিও আছে। তার সপ্তকের ষড়্জের পর কাকলী-নিষাদ উচ্চারণ করে আবার উক্ত ষড়্জে গিয়ে তদূর্ধে তার-সপ্তকের যে-কোন একটি স্বর উচ্চারণ করে প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মধ্যমের পর অন্তরগান্ধার প্রয়োগ করে আবার মধ্যমে পৌছে তার ওপরের যে-কোন স্বরকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাকলী

এবং অন্তরের প্রয়োগ সর্বত্রই অল্প হওয়া উচিত এটি শাস্ত্রে বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম যখন মধ্যমের অন্তিম শ্রুতিকে গ্রহণ করে তখন যে অবস্থা ঘটে তাকে কৈশিকও বলা হয়। শাঙ্গর্দেব বলছেন—কেশাগ্রবৎ অনুস্বতঃ, অর্থাৎ শ্রুতির তফাত কেশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম।

অনেকে শ্রুতির বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে বলে বিদ্রূপ করেন এবং অনেকে একে কুসংস্কার বলেন;—কিন্তু নামকরণের পিছনে যুক্তি রয়েছে বৈকি। প্রত্যেক শ্রুতির ভিন্ন নাম না থাকলে স্বরের বিকৃতিগুলি দেখানো সম্ভব হত না। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রুতির নামের অর্থের সঙ্গে রসের সমন্বয় ঘটানো এ যুগে কঠিন হয়ে পড়েছে। সম্ভবত এই দুটি জিনিষ আলাদাভাবে বিচার করা হয়েছে। শ্রুতির নামগুলি শ্রুতিবিচারে আমরা যেমনভাবে বোধ করছি রসবিচারে তেমনভাবে করছি না—সেক্ষেত্রে আমরা স্বরকে রসের সঙ্গেই মিলিয়ে দেখছি দুটির বিচারক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

প্রয়োগ অনুসারে সঙ্গীতে চতুর্বিধ স্বরের উল্লেখ করা হয়েছে—বাদী, সংবাদী, বিবাদী এবং অনুবাদী।

যে স্বরের বহুল উচ্চারণ হয় তাকে বলে বাদী—বাদী তু প্রয়োগে বহুলঃ স্বরঃ। যে বলে তাকেই আমরা বলি বাদী - বদতি ইতি বাদী। বদন হচ্ছে প্রাণীর ধর্ম—অচেতন স্বরের পক্ষে বলা কি করে সম্ভব হয়? টীকাকারগণ বলছেন যে এই 'বদন' অর্থে এখানে রাগপ্রতিপাদকত্ব বোঝাচ্ছে। সিংহ-ভূপাল তাঁর টীকায় বলছেন—"বাদিনঃ লক্ষণং কথয়তি বাদী তু ইতি। প্রয়োগে জাতিরাগাদৌ বহুলো বাহুল্যেন য উচ্চাযতে সোহংশস্বরাপরপযায়ো বাদী। নম্বু বদতীতি বাদী, বদনং চ প্রাণিধর্মঃ কথমচেতনানাং স্বরাণাং সম্ভবতি? সত্যম্; বদনং হি নামাত্র রাগপ্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতম্, ততশ্চ রাগাণাং রাগত্বং বদন্তি প্রতিপাদয়ন্তি ইতি বাদিনঃ"। অর্থাৎ, এককথায় বাদী স্বরই রাগসমূহের রাগত্বকে প্রতিপন্ন করে।

সংবাদী স্বর এই রাগত্বের নির্বাহক। কল্লিনাথ বলছেন—সংবদনং নাম যদ্বাদিনা স্বরেণ রাগস্য রাগত্বং জনিতং তন্নির্বাহকত্বং। দ্বাদশ বা অষ্টশ্রুতির অন্তরে যে দুটি স্বর বর্তমান তার পরস্পরের সংবাদী। ষড্‌জ এবং পঞ্চম-এর মধ্যে দ্বাদশ শ্রুতির পার্থক্য। এই দুটি স্বর পরস্পরের সংবাদী। অনুরূপ ভাবে দ্বাদশ শ্রুতির পার্থক্য অনুসারে ঋষভ-ধৈবত এবং গান্ধার-নিষাদ

পরস্পরের সংবাদী স্বর। এই সংবাদী স্বরসমূহের পরিজ্ঞানের জন্য একটি ছক প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ছকটিকে বলে—মণ্ডলপ্রস্তার। কল্লিনাথ তাঁর টীকায় এর উল্লেখ করেছেন। এই ছকটি দেখান হল।

মণ্ডলপ্রস্তার

ব্যাখ্যা—

কৈ-নি—কৈশিক নিষাদ—শ্রুতি-৩

কা-নি—কাকলী নিষাদ—শ্রুতি-৪

চ্যু-ষ—চ্যুত-ষড়্জ—শ্রুতি ৩

শু-ষ—শুদ্ধ-ষড়্জ—শ্রুতি-৪

অ-ষ—অচ্যুত-ষড়্জ—শ্রুতি-২

শু ঋ—শুদ্ধ-ঋষভ—শ্রুতি-৩

বি-ঋ—বিকৃত ঋষভ—শ্রুতি-৪

শু-গ—শুদ্ধ-গান্ধার—শ্রুতি-২

বি-গ—বিকৃত গান্ধার —শ্রুতি-৩
অ-গ—অন্তর গান্ধার —শ্রুতি-৪
চ্যু-ম—চ্যুত-মধ্যম—শ্রুতি-৩
শু-ম - শুদ্ধ-মধ্যম - শ্রুতি-৪
অ-ম—অচ্যুত-মধ্যম—শ্রুতি-২
শু প—শুদ্ধ পঞ্চম —শ্রুতি-৪'
বি-প—বিকৃত পঞ্চম—শ্রুতি-৩
শু-প—শুদ্ধ পঞ্চম—শ্রুতি-৪
কৈ-প—কৈশিক-পঞ্চম —শ্রুতি-৪
শু-ধ—শুদ্ধ-ধৈবত—শ্রুতি-৩
বি-ধ—বিকৃত ধৈতব—শ্রুতি-৪
শু-নি—শুদ্ধ-নিষাদ —শ্রুতি-২

এই পট্টিকার এক-একটি রেখাগ্রকে এক-একটি শ্রুতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ থেকে দ্বাদশ শ্রুতি অন্তর সংবাদী স্বর সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। শুধু সংবাদীই নয় সমগ্র শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরের অবস্থানই এই পট্টিকা থেকে নির্ণয় করা যেতে পারে।

অষ্ট শ্রুতির ব্যবধান হিসাবে কি ভাবে সংবাদী নিণয়ের কথা বলা হয়েছে সেটিও এই মণ্ডল থেকে দেখা যাক। আবোহণক্রমে অর্থাৎ বাঁ দিকে ষড্‌জ স্বর থেকে ডান দিকে আটটি রেখাগ্র অতিক্রম করলে আমরা শুদ্ধ মধ্যমে এসে পৌঁছোচ্ছি। অবরোহণক্রমে দ্বাদশ শ্রুতি অতিক্রম করলেও মধ্যমকে পাওয়া যায়, অতএব মধ্যমকেও ষড়্‌জের বাদীস্বর বলে স্বীকার করা হয়। আরোহণ-ক্রমে শুদ্ধ ষড়্‌জ থেকে দ্বাদশ শ্রুতির অন্তরে পঞ্চমকে পাওয়া যাচ্ছে এবং অবরোহণক্রমে অর্থাৎ ষড্‌জ থেকে বাঁ দিকে আটটি শ্রুতি অতিক্রম কবলে আমরা শুদ্ধ পঞ্চম পাচ্ছি। অতএব উভয় দিক থেকে গণনা করলে পঞ্চমকে ষড়্‌জের সংবাদী স্বর হিসাবে পাওয়া যায়। আরোহণক্রমে শুদ্ধ ঋষভ থেকে দ্বাদশ শ্রুতির ব্যবধানে আময়া শুদ্ধ ধৈবত পাচ্ছি। অবরোহণক্রমেও অষ্ট স্বর ব্যবধানে ধৈবত পাওয়া যাচ্ছে। আবার আরোহণক্রমে ঋষভ থেকে অষ্ট শ্রুতির ব্যবধানে মধ্যম গ্রামের পঞ্চম পাওয়া যাচ্ছে। অতএব মধ্যম গ্রামের ঋষভের ধৈবত এবং পঞ্চম উভয়ই সংবাদী স্ব । আরোহণক্রমে গান্ধার থেকে দ্বাদশ শ্রুতির ব্যবধানে শুদ্ধ নিষাদ পাওয়া যাচ্ছে, অবরোহণক্রমেও অষ্ট শ্রুতির

ব্যবধানে আমরা ওই স্বরটিকে পাচ্ছি। অতএব নিষাদ গান্ধারের সংবাদী স্বর। আরোহণক্রমে মধ্যম থেকে দ্বাদশ শ্রুতির ব্যবধানে শুদ্ধ ষড্‌জ স্বরটি পাওয়া যাচ্ছে এবং অবরোহণক্রমে আটটিশ্রুতিব ব্যবধানে আমরা ওই স্বরটিকে পাচ্ছি। অতএব ষড্‌জ মধ্যমের সংবাদী স্বর। কিন্তু, আরোহণক্রমে শুদ্ধ মধ্যম থেকে অষ্ট স্বরের ব্যবধানে শুদ্ধ নিষাদ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং নিষাদকেও মধ্যমের সংবাদী স্বর হিসাবে স্বীকাব করা হয়। আরোহণক্রমে পঞ্চম থেকে অষ্ট শ্রুতির ব্যবধানে শুদ্ধ ষড্‌জ স্বব পাওয়া যাচ্ছে, অবরোহণে এই স্ববটি দ্বাদশ শ্রুতির অন্তরে অবস্থিত। অতএব শুদ্ধ পঞ্চমেব সংবাদী স্বব হচ্ছে ষড্‌জ। আরোহণক্রমে শুদ্ধ ধৈবত থেকে অষ্ট শ্রুতি অন্তবে শুদ্ধ ঋষভ অবস্থিত এবং অবরোহণক্রমে ঐ স্বরটি দ্বাদশ শ্রুতির ব্যবধানে অবস্থিত। অতএব ধৈবতেব সংবাদী স্বব হচ্ছে ঋষভ। আবোহণক্রমে শুদ্ধ নিষাদ থেকে অষ্টশ্রুতির ব্যবধানে শুদ্ধ গান্ধার অবস্থিত এবং অবরোহণক্রমে উক্ত স্বরটি দ্বাদশ শ্রুতির অন্তবে অবস্থিত। অতএব শুদ্ধ গান্ধার নিষাদের সংবাদী স্বব। কিন্তু অবরোহণক্রমে শুদ্ধ নিষাদ থেকে অষ্ট শ্রুতির ব্যবধানে শুদ্ধ মধ্যম পাওয়া যাচ্ছে। অতএব শুদ্ধ মধ্যমকেও নিষাদের সংবাদী স্বর বলে স্বীকার করা হয়।

এই সংবাদীত্বের উপযোগিত্ব কি সেটি বুঝিযে সিংহভূপাল বলছেন যে যদি কোন গীতে ষড্‌জ অংশ স্বব রূপে নির্ধাবিত হয তাহলে তার স্থানে উক্ত স্ববেব সংবাদী মধ্যম স্ববেব প্রযোগ হলে জাতিরাগেব বিনাশ হয না। যদি মধ্যমাদি মূর্ছনার স্থলে ষডজাদি মূর্ছনার প্রযোগ হয তাহলেও সেটি জাতিরাগেব পক্ষে হানিকর বলে পবিগণিত হয না। ষডজ পঞ্চম এর স্থানে পঞ্চম-ষডজ বা ঋষভ-ধৈতব-এর স্থানে ধৈতব-ঋষভ বা গান্ধাব নিষাদ-এর স্থানে নিষাদ-গান্ধাব এইরূপ প্রযোগ হলেও সেটি জাতিরাগেব হানিকর হয না।

বিবদন বা বিকৃত বদন ঘটলে সেটি বিবাদী স্বর বলে পরিগণিত হয়। কল্লিনাথ বলছেন—যে স্বরে রক্তিব বিনাশ ঘটে সেইটি বিবাদী স্বর— বিবদনং নাম বাদ্যাদিভিঃ স্বরৈরুৎপাদ্যমানাযা রক্তের্বিনাশকত্বম্‌। শার্ঙ্গদেব বলছেন, নিষাদ-গান্ধার এই সংবাদী স্বরদ্বয অপর স্বরগুলিব বিবাদী। কিন্তু মধ্যম-নিষাদের সংবাদীত্ব স্বীকৃত হযেছে। এ থেকে মনে হয় স্বীকৃত হলেও মধ্যম-নিষাদের সংবদন নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঘটান হত না। এর পরেই শার্ঙ্গদেব আবার বলছেন যে ঋষভ-ধৈবত এই সংবাদী স্বরদ্বয নিষাদ গান্ধার

এই সংবাদী স্বরদ্বয়ের বিবাদ, অর্থাৎ রে-নি, রে-গা, ধা-নি, ধা-গা, নি রে, গা-রে, নি-ধা, গা-ধা—এই রকম প্রয়োগ হলে সেটি জাতিরাগের হানিকর হবে।

যে সব স্বরের পরস্পর সংবাদিত্ব নেই অথচ বিবাদীত্বও নেই তাদের বলে অনুবাদী স্বর। সিংহভূপাল এটি বুঝিয়ে বলছেন যে ষড়্‌জ স্থানে ঋষভ বা ঋষভ স্থানে ষড়্‌জের প্রয়োগ হলে জাতিরাগের বিনাশ ঘটে না। এইভাবে পঞ্চম স্থানে ধৈতব, ধৈবতের স্থানে পঞ্চম, ষড়জ স্থানে ধৈবত বা ধৈবতের স্থানে ষড়্‌জ; পঞ্চম স্থানে ঋষভ, ঋষভের স্থানে পঞ্চম; মধ্যম স্থানে ঋষভ বা ঋষভের স্থানে মধ্যম; ধৈবতের স্থানে মধ্যম বা মধ্যমের স্থানে ধৈবত—এইরূপ প্রয়োগ হলেও জাতিরাগের বিনাশ ঘটে না।

বলা বাহুল্য বাদী স্বরই হচ্ছে মুখ্য স্বর। অতএব বাদীকে রাজার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার পরেই সংবাদী—অতএব এটি অমাত্যের সঙ্গে তুলনীয়। অনুসারিত্বহেতু অনুবাদী স্বরকে ভৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গ্রাম-মূর্ছ্না-ক্রম-তান

গ্রাম বলতে আমরা বুঝি লোকের আশ্রয়স্থল। সবাই আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে মিলে মিশে গ্রামে অবস্থান করেন। সাতটি স্বরের মূর্ছ্না, ক্রম, তান প্রভৃতি সহ অবস্থিতিকেও এইভাবে গ্রাম বলা হয়েছে।

গ্রাম দুটি—ষড়্জ এবং মধ্যম। ষড়্জ গ্রামই হচ্ছে প্রধান।

ষড়জ গ্রামে পঞ্চমের চারটি শ্রুতি—ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী এবং আলাপিনী। সাধারণত পঞ্চম তার চতুর্থ শ্রুতি আলাপিনীতে অবস্থিত। পঞ্চম এই রকম অবিকৃত অবস্থায় থাকলে সেই গ্রামকে বলা হয় ষড়্জ গ্রাম। ষড়্জ গ্রামে অপর স্বরের বিকৃতি ঘটে কিন্তু পঞ্চমের বিকৃতি ঘটে না।

মধ্যম গ্রামের পঞ্চমের বিকৃতি ঘটে। পঞ্চমের আলাপিনী শ্রুতিটি যখন ধৈবতের অধিকারে আসে এবং পঞ্চম সন্দীপনী শ্রুতিতে অবস্থান করে তখন যে স্বরগ্রামের উদ্ভব হয় তাকে বলে মধ্যম গ্রাম, অর্থাৎ ষড়্জ গ্রামের পঞ্চম একশ্রুতি নিচে নেমে গেলেই সেটি হল মধ্যম গ্রাম।

আবও একটি গ্রাম আছে তাঁর নাম গান্ধার গ্রাম। এই গ্রামে গান্ধার ঋষভের অন্তিম শ্রুতি এবং মধ্যমের প্রথম শ্রুতি অধিকারপূর্ব্বক চতুঃশ্রুতিক হয়। এক্ষেত্রে ধৈবত পঞ্চমের অন্তিম শ্রুতি গ্রহণ করে। নিষাদ ধৈবতের অন্তিম শ্রুতি এবং ষডজের আদিম শ্রুতিকে অধিকার করে। গান্ধার গ্রামের প্রচলন কমই ছিল।

স্বরগ্রামের মধ্যে ষড়্জই প্রধান স্বর। এই কারণে গ্রামে ষডজের প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়েছে। ষড়্জ স্বরের দুটি সম্বাদী মধ্যম এবং পঞ্চম। এর মধ্যে মধ্যমের প্রাধান্য অধিক কেননা ষাড়ব এবং ঔড়ব তানে মধ্যমের লোপ হয় না। কল্লিনাথ আর-একটি মতেরও উল্লেখ করেছেন। মধ্যমকে যদি লোপ করা যায় তাহলে তার পূর্বে থাকে সা, রে, গা এবং পরে থাকে পা, ধা, নি। বীণাতে যদি এই পূর্ব্বাপর স্বরযুগলকে একত্র বাজানো যায় তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি স্বর তার সংবাদীর সঙ্গে বাজছে, অর্থাৎ, সা-পা, রে-ধা, গা-নি—এইভাবে বাজবে। এক্ষেত্রে সা-র সংবাদী পা, রে র সংবাদী ধা এবং গা-র সংবাদী নি। তন্ত্রীর ঈদৃশ সংবদনকে সংবাদ বলা হয়। মধ্যমের

সঙ্গে অপর স্বরের সংবাদ ঘটছে না —অতএব মধ্যম স্বীয় প্রাধান্য নিয়ে একাকী বিরাজমান।

এইখানে পূর্ব প্রচলিত ষ"ড়্"জগ্রাম এবং বর্তমানে প্রচলিত স্বরগ্রাম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান স্বরগ্রামও ষড়্জগ্রামেরই পরিণতি। তবে কিছু তফাৎ রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত শ্রুতিসংখ্যা অনুসারে সেকালের ষড়্জগ্রামে সা ছিল চতুঃশ্রুতিক, রে ত্রিশ্রুতিক, গা-দ্বিশ্রুতিক, মা-চতুঃশ্রুতিক, পা-চতুঃশ্রুতিক, ধা-ত্রিশ্রুতিক এবং নি-দ্বিশ্রুতিক। অনেক পণ্ডিতের মতে বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে সা-দ্বিশ্রুতিক, রে চতুঃশ্রুতিক, গা-ত্রিশ্রুতিক, মা-দ্বিশ্রুতিক, পা-চতুঃশ্রুতিক, ধা-চতুশ্রুতিক. নি—ত্রিশ্রুতিক।

এখানে মনে রাখতে হবে যে স্বরগ্রামের স্বরগুলি তাদের অন্ত্যশ্রুতিতে অবস্থিত। অনেকেই এই মত প্রকাশ করেছেন যে স্বরগুলি প্রথম শ্রুতিতেই স্থাপিত। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কেননা প্রত্যেকটি স্বব তার পূর্ব শ্রুতিব অপেক্ষা রাখে এবং একেবারে তীব্রা থেকে স্ববের অবস্থিতি নির্ণয় করা চলতে পারে না। যে কোন একটি শ্রুতি সেইখান থেকেই স্বর বলে পবিগণিত হবে যেখান থেকে তাব রঞ্জকত্ব গুণটি প্রকাশ পাচ্ছে। সা এই স্বরটি যখন ছন্দোবতী নামক শ্রুতিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে তখনই তাব রণনটি এমনভাবে রঞ্জন করতে সমর্থ হচ্ছে যে তাকে স্বর বলে স্বীকার করা যায়। এই কারণেই সা-কে ছন্দোবতীতে স্থাপন করা হয়েছে। ধ্রুববীণার প্রসঙ্গেও এই কথ ই বলা হযেছে যে প্রথম তন্ত্রীটি খুবই নিচু স্বরে বাঁধতে হবে এবং এই তন্ত্রীটির পরে আরো দুটি তন্ত্রী ছাড়িয়ে তবে ষড়্জ স্বরকে স্থাপন করতে হবে। অতএব তীব্রা থেকে ষড়্জের পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়।

ছন্দোবতী থেকে বর্তমান স্ববগুলি স্থাপন করে গেলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা যে নি ব্যবহার করি সেটি আগে কাকলী—নি ছিল এবং বর্তমান গা হচ্ছে পূর্বের অন্তর-গান্ধার। যদিচ পূর্বে কাকলী এবং অন্তরের প্রয়োগ স্বল্প নির্দিষ্ট ছিল তথাপি ক্রমে উক্ত স্বরদ্বয়ের অধিকতর ব্যবহার হতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই দুটি স্বরই বর্তমানে স্বাভাবিক নি এবং গা বলে স্বীকৃত হয়েছে। মধ্যম এবং পঞ্চম যথাস্থানেই আছে। ঋষভ এবং ধৈবত বর্তমানে আগের চেয়ে এক শ্রুতি চড়া।

স্বরস্থানের এই পরিবর্তনের মূল কারণ আমার মনে হয় সংবাদী স্বরের সঙ্গে যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা। বর্তমান গা-নি—এই সংবদনটি পূর্বকালের

সংবদনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর। পূর্বে গান্ধার এবং নিষাদের যে শ্রুতিবিভাগ ছিল তাতে এই শুদ্ধস্বরের আয়তত্ব বোধ হয় সুসঙ্গত হয় নি। এই কারণেই বহুকাল পূর্ব থেকেই কাকলী নিষাদ এবং অন্তর-গান্ধারের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং ক্রমে এই শ্রুতিস্থানগুলিই স্বর হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

বর্তমান পদ্ধতিটিও নিতান্ত আধুনিক নয়। বেশ কয়েকশত বৎসর হল এটি চলে আসছে। অথচ, আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ সেই পুরাতন শাস্ত্রের শ্রুতিবর্ণনাটিই হুবহু নকল করে তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবেশ করে এসেছেন। এই কারণেই তাঁদের শুদ্ধঠাটের সঙ্গে তাঁদের বর্ণিত রাগলক্ষণ মিলিযে দেখতে গেলে বিভ্রান্ত হতে হয। এইসব নানা কারণেই মধ্যযুগের শেষের দিকে যে সব সঙ্গীতগ্রন্থ রচিত হযেছে সেগুলির ওপর নির্ভব করা শক্ত এবং বিশেষ বিচার না কবে উক্ত গ্রন্থাদিব উল্লেখকে প্রাধান্য না দেওযাই সমীচীন।

সপ্তস্বরের ক্রমিক আরোহণ এবং অবরোহণকে মূর্ছনা বলা হয। মূর্ছনা শব্দেব অর্থ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু শার্ঙ্গদেব কিছু বলেন নি। "মূর্ছ তে যেন রাগঃ —ঈদৃশ উক্তিতে বিশেষ কিছু বোঝা যায না। তবে আমার মনে হয "মূর্ছন' শব্দের "প্রতিফলন" অর্থটিই এক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ, যে আরোহণ এবং অবরোহণের ভিতর দিয়ে একটি রাগের রূপটি প্রতিফলিত হচ্ছে তাকেই বলে মূর্ছনা।

ষড়জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রামের প্রত্যেকটিতে সাতটি করে মূর্ছনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদের চমৎকার নামও দেওযা হযেছে। মূর্ছনাগুলির উদাহরণ দেখানো হল। স্বরলিপির প্রাচীন রীতি অনুসারে স্বরের ওপর বিন্দু থাকলে সেটি মন্দ্র অর্থাৎ খাদের সুর বোঝাবে, আর,—ওপরে দণ্ড চিহ্ন থাকলে সেটি চড়া অর্থাৎ তার স্বর বোঝাবে।

ষড়জগ্রাম

উত্তরমন্দ্রা—	স	রি	গ	ম	প	ধ	নি
	র্নি	ধ	প	ম	গ	রি	স
রজনী—	নি ̣	স	রি	গ	ম	প	ধ
	ধ ̣	প	ম	গ	রি	স	নি ̣

	°	°					
উত্তরায়তা—	ধ	নি	স	রি	গ	ম	প
						°	°
	প	ম	গ	রি	স	নি	ধ
	°	°	°				
শুদ্ধষড়্জা	প	ধ	নি	স	রি	গ	ম
					°	°	°
	ম	গ	রি	স	নি	ধ	প
	°	°	°	°			
মৎসরীকৃতা	ম	প	ধ	নি	স	রি	গ
				°	°	°	°
	গ	রি	স	নি	ধ	প	ম
	°	°	°	°	°		
অশ্বক্রান্তা	গ	ম	প	ধ	নি	স	রি
			°	°	°	°	°
	রি	স	নি	ধ	প	ম	গ
	°	°	°	°	°	°	
অভিরুদ্গাতা	রি	গ	ম	প	ধ	নি	স
		°	°	°	°	°	°
	স	নি	ধ	প	ম	গ	রি

মধ্যমগ্রাম (পঞ্চম ত্রিশ্রুতিক)

					।	।	।
সৌবীরী	ম	প	ধ	নি	স	বি	গ
	।	।	।				
	গ	রি	স	নি	ধ	প	ম
						।	।
হরিণাশ্বা	গ	ম	প	ধ	নি	স	রি
	।	।					
	রি	স	নি	ধ	প	ম	গ
							।
কলোপনতা	রি	গ	ম	প	ধ	নি	স
	স	নি	ধ	প	ম	গ	রি
শুদ্ধমধ্যা	স	রি	গ	ম	প	ধ	নি
	নি	ধ	প	ম	গ	রি	স

উত্তরমন্দ্রার সঙ্গে এর তফাৎ এই যে এক্ষেত্রে পঞ্চম ত্রিশ্রুতিক।

	°						
মার্গী	নি	স	রি	গ	ম	প	ধ
							°
	ধ	প	ম	গ	রি	স	নি

এইখানেও পূর্ববৎ পঞ্চমের শ্রুতিগত ভেদ একে রজনীর সঙ্গে পার্থক্য প্রদান করছে।

	°	°					
পৌরবী	ধ	নি	স	রি	গ	ম	প
						°	°
	প	ম	গ	রি	স	নি	ধ

উত্তরায়তার সঙ্গে এইানেও পঞ্চমের শ্রুতিতেই প্রভেদ।

	°	°	°				
	প	ধ	নি	স	রি	গ	ম
হৃষ্যকা					°	°	°
	ম	গ	রি	স	নি	ধ	প

এখানেও শুদ্ধষড়্‌জার সঙ্গে পঞ্চমের শ্রুতি অনুসারেই ভেদ বর্তমান।

ওপরের এই মূর্ছনাগুলি হচ্ছে শুদ্ধ মূর্ছনা। এ ছাড়া স্বরের বিকৃতি অনুসারে মূর্ছনা আরো তিন রকমের হয়। শুদ্ধনিষাদের স্থলে কাকলী-নিষাদ হলে তাকে বলে কাকলী-কলিতা। শুদ্ধগন্ধারের স্থলে অন্তরগান্ধার হলে তাকে বলে সান্তরা। আর,—কাকলী-নিষাদ এবং অন্তর-গান্ধার দুটিকে এক সঙ্গে নিলে সেটি হয়—কাকল্যন্তরপেতা বা দ্বয়োপেতা। সুতরাং ১৪টি শুদ্ধ এবং পৃথকভাবে আরো চারটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব শুদ্ধ ৫৬টি মূর্ছনা হতে পারে।

এই যে মূর্ছনাগুলির উল্লেখ করা হল সেগুলি ষড়্‌জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রামের ষড়্‌জ এবং মধ্যমের অবস্থিতি-অনুসারে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তুরীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম—এইভাবেও গণনা করা হয়। যেমন, উত্তরমন্দ্রায় ষড়্‌জ প্রথমে আছে। এতএব এটি প্রথম। রজনীতে ষড়্‌জ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত অতএব এটি দ্বিতীয় মূছনা; ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মধ্যমগ্রামেও সৌবীরীতে মধ্যম প্রথমে থাকায় এটি প্রথম মূছনা; হরিণাশ্বায় মধ্যম দ্বিতীয় থাকায় এটি দ্বিতীয় মূছনা—এইভাবে গণনা করা হয়ে থাকে।

এইভাবে এক একটি গ্রামের দ্বিতীয় স্বর, তৃতীয় স্বর প্রভৃ‍িত ক্রমান্বয়ে গ্রহণ

করলে এক একটি মূর্ছনায় সাতটি করে আরোহণক্রম পাওয়া যাবে ; যেমন,—স রি গ ম প ধ নি—একটি ক্রম; রি গ ম প ধ নি স আর একটি ক্রম ইত্যাদি। তাহলে ৫৬টি মূর্ছনায় আমরা ক্রম পাচ্ছি ৫৬×৭=৩৯২।

মূর্ছনাগুলিতে সাতটি স্বরের আরোহণ এবং অবরোহণ ক্রমিক নিয়মে হয়ে থাকে, এলোমেলো ভাবে হয় না।

ক্রম নির্ণয়ের পরে তানের প্রসঙ্গ। বর্তমান সঙ্গীতে গোটা মূর্ছনাকেই আমরা তানের অন্তর্ভুক্ত করেছি। পূর্বে তান বলতে এই জিনিসটি বোঝাত না। শুদ্ধ মূর্ছনায় আরোহণক্রম থেকে একটি বা দুটি স্বরের লোপ বা অপকর্ষ করে শুদ্ধ তান নির্ণয় করা হত। শুদ্ধ মূর্ছনায় একটি স্বরের লোপ করলে সেটি হল ষাড়ব আর দুটির লোপ করলে সেটি হল ঔড়ব। এই ষাড়ব এবং ঔড়বীকৃত শুদ্ধ মূর্ছনাই হচ্ছে তান। ষড়জগ্রামের মূর্ছনায় পৃথক পৃথক ভাবে চারটি স্বরের লোপ করা যেতে পারে। স্বরগুলি হচ্ছে ষড়্জ, ঋষভ, পঞ্চম এবং নিষাদ। তাহলে ষাডব লোপ করে আমরা প্রতিবারই সাতটি করে তান পাচ্ছি। তাহলে ষাড়ব তান হচ্ছে ৪×৭=২৮টি। মধ্যমগ্রামে ষড়জ, ঋষভ এবং গান্ধার লোপ করে ৩×৭=২১টি ষাড়ব তান হয়। অতএব ষাডব তানের সংখ্যা হচ্ছে ২৮+২১=৪৯।

ষড়্জগ্রাম মূর্ছনায় ষড়্জ-পঞ্চম, গান্ধার-নিষাদ এবং ঋষভ-পঞ্চম বর্জন করলে সাতটি করে ২১টি ঔড়ব তান পাওয়া যাবে; মধ্যমগ্রামের মূর্ছনায় ঋষভ-ধৈবত, গান্ধার-নিষাদ বর্জন করলেও চতুর্দশ ঔড়ব তান পাওয়া যাবে। অতএব ঔড়ব মূর্ছনায় হল ২১+১৪=৩৫টি তান।

বীণার মীড়কেও তান বলা হয়েছে অথবা এক স্বরকে উল্লঙ্ঘন করে বা ঈষৎ স্পর্শ করে অপর স্বরে যাওয়াকেও তান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দ্বিস্বারিক প্রস্তারকেও যখন তান বলে স্বীকার করা হয়েছে তখন মীড় স্বাভাবিক ভাবেই তান আখ্যা পেতে পারে।

সাতটি স্বরের সহযোগে মূর্ছনা সম্পাদিত হলে তাকে পূর্ণা বলা হয়। ষাড়ব বা ঔডব হলে সেগুলি হয় অপূর্ণ মূর্ছনা। সাধারণত মূর্ছনায় স্বরগুলি পর পর আসে কিন্তু যখন স্বরগুলি বীপরীতক্রমে অর্থাৎ উল্টোভাবে উচ্চারিত হয় তখন এই বীপরীতক্রমকে বলে কূটতান। পূর্ণা মূর্ছনার ৫০৪০ প্রস্তার হতে পারে। ইতিপূর্বে ৫৬টি মূর্ছনার কথা বলা হয়েছে। অতএব সব মিলিয়ে পূর্ণ কূটতানের সংখ্যা হচ্ছে—৫৬×৫০৪০=২৮২২৪০।

এইবার অপূর্ণ কূটতানের কথা। অপূর্ণতার কারণ হচ্ছে এক বা দুই স্বরের লোপ। দুটি গ্রাম থেকে একটি করে অন্ত্যস্বর লোপ করলে গ্রামটি ষট্‌স্বা হল। অন্ত্যস্বরদ্বয়ের লোপে পঞ্চমস্বর হল। অন্ত্যস্বরত্রয় লোপ করলে চতুঃস্বর হল। অন্ত্যস্বরচতুষ্টয়ের লোপে গ্রামটি ত্রিস্বর হয়। অন্ত্যস্বরের পাঁচটিকে লোপ করলে সেটি হয় দ্বিস্বব। আর, ষট্‌স্বর লোপ করলে থাকে মাত্র এক স্বর। এই এক স্বরের তো আর প্রস্তার হয় না, অতএব এর আর ভেদ নেই। ষাডব ক্রমের ৭২০টি প্রস্তার হয়, ঔড়বের হয় ১২০টি, চতুঃস্বরের ২৪টি, ত্রিস্বরের ৬টি এবং দ্বিস্বরের দুটি প্রস্তার ভেদ হয়।

এইসব তানের বিশেষ নাম আছে। একস্বর — আর্চিক, দ্বিস্বর—গাথিক, ত্রিস্বর -সামিক, চতুস্বর -স্বরান্তর, পঞ্চস্বর — ঔড়ব,, ষট্‌স্বর—ষাড়ব, সপ্তস্বর —পূর্ণ।

ষড্‌জ এবং মধ্যমগ্রামের চতুর্দশ মূর্ছনার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এই মূছ নাগুলির প্রত্যেকটির শেষের স্বরটি লোপ করে যদি ষাডব করা যায় তাহ:লে নিষাদ এবং গান্ধারের যোগে তাদের চাবটি ভেদ হয়। কেবল মাত্র নিষাদ বাদ দিলে শুদ্ধা এবং সান্তরা গান্ধার থাকে। আর, গান্ধার বাদ দিলে থাকে শুদ্ধা এবং কাকলী নিষাদ।

ষড্‌জগ্রামের উত্তরমন্দ্রা মূছ না এবং মধ্যমগ্রামের শুদ্ধমধ্যা মূছ নায় স্বর সন্নিবেশ একই রকমের। দুটিই ষড্‌জাদ্য।

স রি গ ম প ধ নি

এর থেকে 'নি'-ব লোপ হলে মূছ নাটির শুদ্ধ গান্ধার এবং অন্তরগান্ধারসহ দুটি ভেদ হয়। দুটি গ্রাম মিলিয়ে এক্ষেত্রে ভেদ হল চারটি। অনুরূপভাবে মধ্যমগ্রামের সৌবীরী মূর্ছনা হচ্ছে মধ্যমাদ্য। ষড়্‌জগ্রামে মধ্যমকে প্রথমে রেখে যে মূর্ছনা তার নাম মৎসরীকৃতা।

° ° ° °
নি স রি গ

এখানে শেষস্বর গান্ধারের লোপ করে একে ষাডব করলে শুদ্ধ নি এবং কাকলী —নি সহ দুটি ভেদ পাওয়া যায়। দুটি গ্রাম মিলিয়ে এক্ষেত্রেও ভেদ হল চারটি।

তাহলে উভয় গ্রামে মূর্ছনায় নি এবং গা—র লোপে যে ষাড়বক্রম হল তার ভেদ হল ৮টি। চোদ্দটি মূর্ছনার মধ্যে এই্য চারটি বাদ দিলে রইল

আর দশটি। এই দশটিতে নি এবং গা—দুটিই আছে। অতএব দুটি শুদ্ধ, সান্তরা, কাকলী-কলিতা সহযোগে ১০×৪=৪০টি ভেদ হয়। এই ৪০টির সঙ্গে পূর্বোক্ত চারটি মূর্ছনার ৮ ভেদ যোগ দিলে মোট হল ৪০+৮=৪৮টি ষাড়বের ক্রম। পূর্বেই বলা হয়েছে ষড়বের প্রস্তার সংখ্যা ৭২০। অতএব অপূর্ণ ষাডবের কূটতানের ভেদ হচ্ছে ৪৮×৭২০=৩৪৫৬০।

এর পরে ঔডব কূটতান। ষড়্‌জগ্রামের অশ্বক্রান্তা এবং মধ্যমগ্রামের হরিণাশ্বা—এই দুটি মূর্ছনার প্রথমে গান্ধার রয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি গান্ধারান্ত মূর্ছনা। এই মূর্ছনার শেষ দুই স্বর অর্থাৎ রে এবং সা-র লোপ হলে থাকে গা মা পা ধা নি। এই ঔডব মূর্ছনায় শুদ্ধ, কাকলী—নি, অন্তর গান্ধার এবং তদ্বয়োপেতা নিয়ে চারটি ভেদ হতে পারে। ষড্‌জ এবং মধ্যম—এই দুই গ্রামে উক্ত মূর্ছনার তাহলে ভেদ হল ৮টি।

ধৈবত আগে আছে—এমন দুটি মূর্ছনা হচ্ছে উত্তরায়তা এবং পৌরবী। এই দুটি মূর্ছনার শেষ দুই স্বর মা এবং পা-র লোপ করলে রইল—ধা নি সা রে গা। এক্ষেত্রে শুদ্ধ, কাকলী নি, অন্তর গান্ধার এবং তদ্বয়োপেতার যোগে চারটি ভেদ পাওয়া যাচ্ছে। দুই গ্রাম মিলিয়ে এই ভেদ হল ৮টি।

প্রথমে নিষাদ আছে -এই রকম মূর্ছনা হচ্ছে রজনী এবং মার্গী। এর শেষের দুটি স্বব পা এবং ধা-র লোপ করলে হল—নি সা রে গা মা। এখানেও শুদ্ধ, কাকলী—নি, সান্তরা গান্ধার এবং তদ্বয়োপেতার যোগে চারটি ভেদ পাওয়া যাচ্ছে। উভয় গ্রামে ভেদ হল ৮টি।

তাহলে উপরোক্ত উভয় গ্রামের ছটি মূর্ছনার ভেদ হল -৮+৮+৮= ২৪টি।

মোট ১৪টি মূছনা থেকে ছটি বাদ গেলে রইল ৮টি। এর মধ্যে নিষাদ-হীন চারটি ঔড়ব মূছনা হচ্ছে—

স রি গ ম প — উত্তরমন্দ্রা, ষড়্‌জগ্রাম

ঐ — শুদ্ধমধ্যা, মধ্যমগ্রাম

রে̊ গ̊ ম̊ প̊ ধ̊ — অভিরুদ্গাতা, ষড়্‌জগ্রাম

রি গ ম প ধ — কলোপনতা, মধ্যমগ্রাম

এই চারটি মূর্ছনায় শুদ্ধ ও অন্তর-গান্ধারসহ ৮টি ভেদ পাওয়া যাচ্ছে।

গান্ধারহীন মূর্ছনা চারটি।

পঁ ধঁ নিঁ স রি — শুদ্ধষড়্জা, ষড়্জগ্রাম

ঐ — হৃষ্যকা, মধ্যমগ্রাম

মঁ পঁ ধঁ নিঁ স — মৎসরীকৃতা, ষড়্জগ্রাম

।

ম প ধ নি স — সৌবীরী, মধ্যমগ্রাম

এই চারটি মূর্ছনায় শুদ্ধ ও কাকলী-নি সহ ৮টি ভেদ পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব এই ৮টি মূর্ছনায় ৮+৮=১৬টি ভেদ পাওয়া গেল। তাহলে ঔড়ব ক্রম হল পূর্বের ২৪+১৬=৪০টি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঔড়বের প্রস্তার সংখ্যা হচ্ছে ১২০। সুতরাং অপূর্ণ কূটতানের সংখ্যা হল—১২০× ৪০=৪৮০০

এর পর চতুঃস্বরেব কূটতান।

রজনী এবং মার্গী -এই দুই মূর্ছনার শেষের তিন স্বর ধা, পা, মা-রলোপ হলে রইল -নি সা রে গা। এই চতুঃস্বারিক মূর্ছনার শুদ্ধ, কাকলী, সান্তরা এবং তদ্বয়োপেতার যোগে চারটি ভেদ হয়। উভয়গ্রাম মিলিয়ে হল -৮টি।

চোদ্দটি মূর্ছনার মধ্যে দুটি বাদ দিলে থাকে বারটি। এই বারটির মধ্যে নিষাদ বর্জিত চতুঃস্বব মূর্ছনা হচ্ছে ছটি—উত্তবমন্দ্রা, শুদ্ধমধ্যা, অশ্বক্রান্তা, হরিণাশ্বা, অভিরুদ্গাতা এবং কলোপনতা। প্রত্যেকটির শুদ্ধ এবং সান্তর গান্ধার সহ দুই প্রকার ভেদ হলে—৬টি ভেদ হয়। দুই গ্রাম মিলিয়ে হল ৬+৬=১২টি।

গান্ধার বর্জিত চতুঃস্বর মূর্ছনা হচ্ছে ছটি—উত্তরায়তা, পৌরবী, শুদ্ধ-ষড়্জা, হৃষ্যকা, মৎসরীকৃতা এবং সৌবীরী। এক্ষেত্রেও শুদ্ধ এবং কাকলী সহ প্রত্যেকটির দুটি করে অর্থাৎ ৬টি ভেদ পাওয়া যাচ্ছে। উভয়গ্রাম মিলিয়ে হচ্ছে ১২টি।

নিষাদ বর্জিত এবং গান্ধার বর্জিত চতুঃস্বর মূর্ছনার ভেদ হল ১২+১২= ২৪টি। এর সঙ্গে নিষাদ, গান্ধার যুক্ত পূর্বোক্ত ৮টি ভেদ যোগ দিলে চতুঃ-স্বরের ক্রম হল—২৪+৮=৩২টি। পূর্বেই বলা হয়েছে চতুঃস্বর ক্রমের প্রস্তার সংখ্যা হল -২৪টি। অতএব মোট অপূর্ণ চতুঃস্বারিক কূটতানের সংখ্যা হল—২৪×৩২=৭৬৮।

এবারে ত্রিস্বর কূটতান।

মৎসরীকৃতা এবং সৌবীরী—এই দুটি মূর্ছনার শেষের চারটি স্বর লোপ করে ত্রিস্বর করলে থাকে মা, পা, ধা। এতে গান্ধার এবং নিষাদ না থাকায় দুই গ্রাম হিসাবে দুটি ভেদই মাত্র পাওয়া যায়।

অপর তানগুলি দেখা যাক।

স রি গ	—	উত্তর-মন্দ্রা, ষড়্‌জগ্রাম
ঐ	—	শুদ্ধমধ্যা, মধ্যমগ্রাম
নি̊ স রি	—	রজনী, ষড়্‌জগ্রাম
ঐ	—	মার্গী, মধ্যমগ্রাম
ধ̊ নি̊ স	—	উত্তরায়তা, ষড়্‌জগ্রাম
ঐ	—	পৌরবী, মধ্যমগ্রাম
প̊ ধ̊ নি̊	—	শুদ্ধষড়্‌জা, ষড়্‌জগ্রাম
ঐ	—	হৃষ্যকা, মধ্যমগ্রাম
গ̊ ম̊ প̊	—	অশ্বক্রান্তা, ষড়্‌জগ্রাম
গ ম প	—	হরিণাশ্বা, মধ্যমগ্রাম
রি̊ গ̊ ম̊	—	অভিরুদ্গাতা, ষড়্‌জগ্রাম
রি গ ম	—	কলোপনতা, মধ্যমগ্রাম

এর মধ্যে গান্ধার এবং নিষাদ থাকায় আমরা অন্তরা এবং কাকলীর ভেদ পাচ্ছি। অতএব এই বারটি ত্রিস্বর মূর্ছনার ২৪টি ভেদ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে পূর্বের দুটি মূর্ছনা যোগ করে হল—২৴+২=২৬টি। ত্রিস্বর ক্রমের প্রস্তার সংখ্যা ছয়। অতএব ত্রিস্বর কূটতানের সংখ্যা হচ্ছে—২৬×৬=১৫৬টি।

এবারে দ্বিস্বরতান। প্রথমে কোথায় একাধিক ভেদ পাওয়া যাচ্ছে দেখা যাক।

রি̊ গ̊	—	অভিরুদ্গাতা, ষড়্‌জগ্রাম
রি গ	—	কলোপনতা, মধ্যমগ্রাম
গ̊ ম̊	—	অশ্বক্রান্তা, ষড়্‌জগ্রাম
গ ম	—	হরিণাশ্বা, মধ্যমগ্রাম

ধ় নি়	—	উত্তরায়তা, ষড্‌জগ্রাম
ঐ	—	পৌরবী, মধ্যমগ্রাম
নি় স	—	রজনী, ষড্‌জগ্রাম
ঐ	—	মার্গী, মধ্যমগ্রাম

এই তানগুলিতে শুদ্ধ, অন্তর-গান্ধার এবং শুদ্ধ, কাকলী-নিষাদ ভেদে প্রত্যেকটির দুরকম ভেদ হচ্ছে। অর্থাৎ উক্ত ৮টি তানের ৮×২=১৬টি ভেদ পাওয়া যাচ্ছে

বাকি তানগুলি হল :

স রি	—	উত্তরমন্দ্রা, ষড্‌জগ্রাম
ঐ	—	শুদ্ধমধ্যা, মধ্যমগ্রাম
প় ধ়	—	শুদ্ধষড্‌জা ষড্‌জগ্রাম
ঐ	—	হৃষ্যকা, মধ্যমগ্রাম
ম় প়	—	মৎসরীকৃতা, ষড়্‌জগ্রাম
ম প	—	সৌবীরী, মধ্যমগ্রাম

এগুলিতে গান্ধার বা নিষাদ না থাকায় আর কোন ভেদ নেই। এক্ষেত্রে আমরা ছটি তানই পাচ্ছি। সবশুদ্ধ দ্বিস্বরের ভেদ হল—১৬+৬=২২টি। দ্বিস্বর ক্রমের প্রস্তার সংখ্যা দুই। অতএব দ্বিস্বর কূটতানের সংখ্যা হচ্ছে—২২×২=৪৪টি

অতঃপর একস্বরের কথা। বলা বাহুল্য চোদ্দটি মূর্ছনায় একস্বরের ভেদ চোদ্দটিই হবে।

সব মিলিয়ে পূর্ণ এবং অপূর্ণ কূটতানের সংখ্যা এইরকম :

পূর্ণ কূটতান	২৮২২৪০
অপূর্ণ কূটতান	
ষাড়ব	৩৪৫৬০
ঔড়ব	৪৮০০
চতুঃস্বর	৭৬৮
ত্রিস্বর	১৫৬
দ্বিস্বর	৪৪
একস্বর	১৪
মোট—	৩২২৫৮২

এই যে কূটতানের সংখ্যা দেওয়া হল এর মধ্যে অনেকগুলি পুনরুক্তি রয়েছে পুনরুক্তি শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাক। ষড়্জ গ্রাম এবং মধ্যমগ্রামের তফাৎ শুধু পঞ্চমকে নিয়ে। পঞ্চম ত্রিশ্রুতিক হলেই গ্রামটি মধ্যগ্রাম হয়। এই যে দুটি গ্রামের মূর্ছনা দেখান হয়েছে এদের থেকে পঞ্চমকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দুটি গ্রামের বাকি স্বরে সত্যিকারের কোন ভেদ থাকে না। তফাৎ যেটুকু থাকে সেটুকু হচ্ছে মন্দ্র, মধ্য এবং তার হিসাবে অবস্থিতির তফাৎ। মূলতঃ স্বরের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন এতে হয় না। আমরা ষড্‌জ এবং মধ্যমগ্রামের উভয় মূর্ছনাকেই গ্রহণ করেছি। অতএব মিলিত কূটতানের সংখ্যায় তাদের পুনরুক্তি ঘটছে। এই সব পুনরুক্তিকে আলাদা করে দেখান দরকার।

মধ্যমগ্রামের চতুঃস্বর শুদ্ধমধ্যা মূর্ছনায় (সা, রে, গা, মা) আমরা শুদ্ধ এবং অন্তর—এই দুটি গান্ধারের জন্য দুটি ক্রম পাচ্ছি। প্রত্যেক ক্রমের ২৪টি ভেদ। এই ২৪ × ২ = ৪৮টি ভেদ আগের গণনার মধ্যে ধরা হয়েছে। এই ৪৮টি ভেদের মধ্যে পঞ্চম নেই যা দুটি গ্রামকে পৃথক করেছে। অতএব এই ভেদগুলি পুনরুক্ত হয়েছে।

শুদ্ধমধ্যার ত্রিস্বর মূর্ছনায় (সা রে গা) অনুরূপভাবে গান্ধারভেদে দুটি ক্রম হচ্ছে : ৬ × ২ = ১২।

শুদ্ধমধ্যার দ্বিস্বর মূর্ছনার (সা রে) একটি ক্রমই পাওয়া যায় কেননা এতে গান্ধার নেই। অতএব এখানে দুটি ভেদ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বলা বাহুল্য শুদ্ধমধ্যার একস্বরের একই ভেদ।

অতএব মোট ভেদ হল : ৪৮ + ১২ + ২ + ১ = ৬৩

ষড়্জ গ্রামের চতুঃস্বর মূর্ছনা উত্তরমন্দ্রার চতুঃস্বর ক্রম থেকে একস্বর পযন্ত ঠিক এইভাবেই গণনা করা যেতে পারে। উভয় গ্রামের যে কোন একটি পুনরুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

মধ্যমগ্রামের পঞ্চস্বর মার্গী মূর্ছনার (নি সা রে গা মা) আদিস্বর নিষাদ। এই পঞ্চমবর্জিত মূর্ছনায় আমরা শুদ্ধ, কাকলীভেদে এবং শুদ্ধ, অন্তরভেদে চারিটি ক্রম পাচ্ছি। পঞ্চস্বরের প্রস্তার সংখ্যা ১২০। অতএব এখানে ভেদসংখ্যা হচ্ছে : ১২০ × ৪ = ৪৮০।

চতুঃস্বর মার্গী মূর্ছনায় (নি সা রে গা) অনুরূপভাবে ভেদ হচ্ছে ২৪ × ৪ = ৯৬।

ত্রিস্বর মার্গী মূর্ছনায় (নি সা রে) দুটি নিষাদ পাওয়া যাচ্ছে। এর ভেদ সংখ্যা হচ্ছে : ৬ × ২ = ১২।

দ্বিস্বর মার্গী মূর্ছনায় (নি সা) দুটি নিষাদ পাওয়া যাচ্ছে। এর ভেদ সংখ্যা হচ্ছে ২ × ২ = ৪।

একস্বর নিষাদের একই ভেদ।

মার্গী মূর্ছনার পঞ্চস্বর ক্রম থেকে একস্বর পর্যন্ত মোট ভেদ হল : ৪৮০ + ৯৬ + ১২ + ৪ + ১ = ৫৯৩।

ষড়্জগ্রামের রজনী মূর্ছনাতেও এই একই ভেদ পাওয়া যাবে।

মধ্যমগ্রামের ষট্স্বর পৌরবী মূর্ছনার (অর্থাৎ, ধা নি সা রে গা মা) আদি স্বর ধৈবত। এখানেও নিষাদ এবং গান্ধার ভেদে চারটি ক্রম পাওয়া যাচ্ছে। ছয়টি স্বরের প্রস্তার সংখ্যা ৭২০। তাহলে মোট ভেদ হচ্ছে : ৭২০ × ৪ – ২৮৮০।

পঞ্চস্বর পৌরবী মূর্ছনাবও নিষাদ, গান্ধার ভেদে চারিটি ক্রম হচ্ছে : পঞ্চস্বরের প্রস্তার সংখ্যা ১২০। অতএব মোট ভেদ হল : ১২০ × ৪ = ৪৮০।

চতুঃস্বর পৌববী মূর্ছনায় নিষাদের দুটি ভেদে দুটি ক্রম পাওয়া যাচ্ছে। চতুঃস্বরের প্রস্তার সংখ্যা ২৪। অতএব মোট ভেদ সংখ্যা ২৪ × ২ = ৪৮।

ত্রিস্বর পৌরবী মূর্ছনাতেও নিষাদ থাকায় দুটি ক্রম। অতএব মোট ভেদ সংখ্যা ৬ × ২ = ১২।

দ্বিস্বর পৌরবী মূর্ছনাতে নিষাদ বর্তমানে দুটি ক্রম। মোট ভেদ সংখ্যা হচ্ছে ২ × ২ = ৪।

একস্বর ধৈবতের একই ভেদ।

ষট্স্বর থেকে একস্বর পৌরবীব মোট ভেদ হল :

২৮৮০ + ৪৮০ + ৪৮ + ১২ + ৪ + ১ = ৩৪২৫

ষড্জগ্রামের উত্তরায়তা মূর্ছনা থেকেও এই ভেদ সংখ্যা পাওয়া যায়।

তাহলে পঞ্চমকে বর্জন কবে কূটতানের বিচার করলে পুনরুক্তির মোট সংখ্যা হচ্ছে : ৬৩ + ৫৯৩ + ৩৪২৫ = ৪০৮১।

পূর্বে যে পূর্ণ এবং অপূর্ণ কূটতানের গণনা হয়েছে তাতে ক্রমগুলি ধরা হয়েছিল। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে পূর্ণ ক্রম হচ্ছে ৩৯২, ষাড়ব—৪৮। ঔড়ব -৪০, চতুঃস্বর—৩২, ত্রিস্বর—২৬ এবং দ্বিস্বর—২২। আর চোদ্দটি

একস্বরের মধ্যে সা, নি, ধা—এই তিনটিও পঞ্চম-বর্জিত পুনরুক্তির মধ্যে অতএব চোদ্দ থেকে ৩ বাদ দিয়ে ১১টি ধরা উচিত।

সুতরাং ক্রম হচ্ছে—৩৯২+৪৮+৪০+৩২+২৬+২২+১১=৫৭১।

পুনরুক্তির সংখ্যা হচ্ছে—৪০৮১। দুটি মিলিয়ে হল ৫৭১+৪০৮.= ৪৬৫২। এই সংখ্যাটিকে আমরা পূর্বে যে কূটতানের সংখ্যা দিয়েছি তার থেকে বাদ দিলে প্রকৃত কূটতানের সংখ্যা পাওয়া যাবে।

এই সংখ্যাটি হল: ৩২২৫৮২—৪৬৫২=৩১৭৯৩০।

এর পরে নষ্টোদ্দিষ্ট তান সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। অবশ্য বর্তমানে যে সঙ্গীত প্রচলিত তার পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা নেই কেননা নষ্টতানের স্বরূপ বা উদ্দিষ্ট তানের সংখ্যা নির্ণয়ের প্রয়োজন এ যুগে হয় না; তথাপি প্রাচীনকালে এটি কি ভাবে করা হত জানলে ক্ষতি নেই। বিষয়টি চিত্তাকর্ষক যদিও সমস্ত ব্যাপারটি গাণিতিক বললেই চলে।

নষ্টতান মনে হচ্ছে সংখ্যা অনুসারে একটি কূটতানের স্বরূপ উদ্ঘাটন। যেমন সপ্তস্বরের সহস্রতম প্রস্তারে এই সাতটি সন্নিবেশ কি রকম সেটি নির্ণয় করা। আমরা জানি যে প্রস্তারের স্বর হচ্ছে সাতটি আর এও জানি যে সংখ্যা হচ্ছে সহস্রতম। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ওই সহস্রতম প্রস্তার-সংখ্যায় সাতটি স্বর কিভাবে বিন্যস্ত আছে। যে পদ্ধতি দেওয়া আছে সে অনুসারে প্রস্তার সংখ্যা জানা থাকলে অপরাপর স্বরেরও পরিজ্ঞান হতে পারে।

উদ্দিষ্ট তান কথাটার মানে হচ্ছে—তানের স্বরবিন্যাস অনুযায়ী প্রস্তার সংখ্যা কত হতে পারে সেটি নির্ণয় করা। যেমন, মা গা রে সা—এই কূট তানটি উদ্দিষ্ট হয়েছে। এই স্বরগুলির সাহায্যে আমাকে বের করতে হবে এই চতুঃস্বরের প্রস্তার সংখ্যাটি কত।

এই পরিজ্ঞানের জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করা হ'চ্ছে তার প্রধান উপকরণ হচ্ছে খণ্ডমেরু।

খণ্ডমেরুর গঠন এইরকম:

একটির নিচে একটি করে সাতটি পংক্তি বসাতে হবে। প্রথম পংক্তিটি হবে সপ্তকোষ্ঠিকা, অর্থাৎ প্রথম পংক্তিতে সাতটি ঘর থাকবে। দ্বিতীয় পংক্তিটি তার নিচে ষট্‌কোষ্ঠিকা হবে। প্রথম পংক্তির প্রথম ঘরটির নিচে কিন্তু কিছু বসবে না—প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরটির নিচে থেকে দ্বিতীয় পংক্তি আরম্ভ

হবে। তৃতীয় পংক্তি অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় পংক্তির নিচে পঞ্চকোষ্ঠিকা হবে। চতুর্থটি হবে তার নিচে চতুঃকোষ্ঠিকা। পঞ্চমটি তার নিচে ত্রিকোষ্ঠিকা। ষষ্ঠটি তার নিচে দ্বিকোষ্ঠিকা এবং সপ্তমটি সর্বনিম্নে এককোষ্ঠিকা। এইভাবে সাতটি পংক্তি উপরের পংক্তির প্রথম ঘরটি বাদ দিয়ে পরবর্তী ঘরের তলা থেকে আরম্ভ হবে।

প্রথম পংক্তির প্রথম ঘরে ১ অঙ্ক বসবে। পরের ঘরগুলিতে শূন্য লিখতে হবে। এই সব ঘরে লোষ্ট্র বা ঘুঁটি বসাতে হবে। আলোচ্য তানটির যত সংখ্যা ঘুঁটিও বসবে ততগুলি। যদি তানটি চতুঃস্বর হয় তবে প্রথম চারটি ঘরে ঘুঁটি বসবে। পঞ্চস্বর হলে ঘুঁটি বসবে পাঁচটি ঘরে।

দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম ঘরটিতে ১ অঙ্ক লিখতে হবে। দ্বিতীয় ঘরের সংখ্যা হবে ২। ঊর্ধ্বপংক্তিতে আছে ১ এবং তার নিচের পংক্তিতেও রয়েছে ১। এই অধঃস্থিত সংখ্যার সঙ্গে ঊর্ধ্বস্থিত সংখ্যার সংযোগে হল ২। তারপর দ্বিতীয় পংক্তির অপর ঘরগুলিতে যে সংখ্যা বসবে সেটি হবে সেই কক্ষের যে নম্বর তাকে তার পূর্বের কক্ষের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যা হয় সেইটি। যেমন তৃতীয় কক্ষের সংখ্যা হবে ৩×২=৬। এইভাবে চতুর্থ কক্ষের সংখ্যা ৪×৬=২৪, পঞ্চমের ৫×২৪=১২০ এবং ষষ্ঠের ৬×১২০=৭২০। এই সংখ্যাগুলি থেকে আমরা প্রস্তার সংখ্যাগুলিও পাচ্ছি। দ্বিস্বরের প্রস্তার সংখ্যা ২, ত্রিস্বরের ৬, চতুঃস্বরের ২৪, পঞ্চমের ১২০ এবং ষষ্ঠের ৭২০। শেষোক্ত সংখ্যাকে ৭ দিয়ে গুণ করলে সপ্তস্বরের প্রস্তারসংখ্যা ৫০৪০ও পাওয়া যাবে।

তৃতীয় পংক্তির কক্ষসংখ্যাগুলি হবে তাদের ঠিক ওপরের দ্বিতীয় পংক্তির ঘরের দ্বিগুণ। অর্থাৎ: ২×২=৪, ৬×২=১২, ২৪×২=৪৮, ১২০×২=২৪০, ৭২০×২=১৪৪০।

চতুর্থ পংক্তির ঘরগুলির সংখ্যা হবে দ্বিতীয় পংক্তির ঘরগুলির ত্রিগুণ। অর্থাৎ: ৬×৩=১৮, ২৪×৩=৭২, ১২০×৩=৩৬০, ৭২০×৩=২১৬০।

পঞ্চম পংক্তির ঘরের সংখ্যাও এইভাবে দ্বিতীয় পংক্তির কক্ষসংখ্যার চতুর্গুণ হবে। অর্থাৎ ২৪×৪=৯৬, ১২০×৪=৪৮০, ৭২০×৪=২৮৮০।

ষষ্ঠ পংক্তির কক্ষসংখ্যা হবে দ্বিতীয় পংক্তির কক্ষ সংখ্যার পঞ্চগুণ। অর্থাৎ, ১২০×৫=৬০০, ৭২০×৫=৩৬০০।

সপ্তম পংক্তির কক্ষসংখ্যা দ্বিতীয় পংক্তির শেষ কক্ষসংখ্যার ছয়গুণ। অর্থাৎ ৭২০×৬=৪৩২০।

খণ্ডমেরু ঃ

১	০	০	০	০	০	০
	১	২	৬	২৪	১২০	৭২০
		৪	১২	৬৮	২৪০	১৪৪০
			১৮	৭২	৩৬০	২১৬০
				৯৬	৪৮০	২৮৮০
					৬০০	৩৬০০
						৪৩২০

এবারে উদ্দিষ্ট পরিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা যাক।

সা রে গা মা পা ধা নি—এইভাবে পর পর নির্দিষ্টভাবে সাজ্ঞানকে বলে মূলক্রম। এই মূলক্রমের অন্ত্যস্বর এবং উদ্দিষ্ট তানের অন্ত্যস্বর—এই দুই স্বরের ব্যবধান অনুসারে ঘুঁটি বা লোষ্টচালনা করে অভীষ্ট প্রস্তার সংখ্যাটি বের করতে হবে। বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

উদ্দিষ্ট তানটি ধরা যাক—মা গা রে সা।

মূলক্রম হচ্ছে—সা রে গা মা।

উদ্দিষ্ট তানের অন্ত্যস্বর হচ্ছে—সা; মূলক্রমের অন্ত্যস্বর—মা।

সা থেকে মা হল চতুর্থস্বর। তাহলে প্রথম পংক্তির চতুর্থ কোষ্ঠকে যে ঘুঁটি আছে সেটি উক্ত ঘর থেকে তার নিচে চতুর্থ পংক্তির ১৮ সংখ্যায় চলে আসবে। অন্য কোন পংক্তির ঘরে যাবে না কেননা তানটি চতুঃস্বর এবং উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর মা মূলক্রমের অন্ত্যস্বর থেকে চতুর্থ। এখানে আমরা ১৮ পেলুম। এবারে উদ্দিষ্ট এবং মূলক্রম থেকে সা লোপ করে দিতে হবে। তাহলে তানটি ত্রিস্বর হয়ে গেল, অর্থাৎ মা গা রে। মূলক্রম হচ্ছে রে গা মা এবারে উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর রে থেকে মূলক্রমের অন্ত্যস্বর মা হচ্চে তৃতীয় স্বর। অতএব প্রথম পংক্তির তৃতীয় ঘুঁটি তৃতীয় পংক্তির ৪এর ঘরে আসবে। তাহলে আমরা এ পর্যন্ত ১৮+৪=২২ পেলুম। এখানে দুটি ক্রম থেকেই রে-র লোপ হবে। অতঃপর উদ্দিষ্টের তান হল—মা গা এবং মূলক্রম—গা মা উদ্দিষ্টান্ত গা থেকে মূলক্রমের অন্ত্যস্বর মা হচ্ছে দ্বিতীয় স্বর। অতএব প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরে যে ঘুঁটি আছে তাকে নিচের দ্বিতীয় পংক্তির ১ অঙ্কে বসাতে হবে। এখন পাওয়া গেল ২২+১=২৩। এইখানে দুটি ক্রম

থেকেই গা-র লোপ হল। এর পর রইল শুধু মা। উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর মধ্যম এবং মূলক্রমেও রয়েছে কেবলমাত্র মধ্যম। অতএব ঘুঁটি আর চালান যাবে না। শেষ ঘুঁটিটি ওই প্রথম পংক্তির ১ এই রয়ে গেল। অর্থাৎ আমরা শেষ পর্যন্ত আর একটি সংখ্যাই পেলাম। তাহলে সর্বসমেত মা গা রে সা—এই তানের নির্দিষ্ট প্রস্তার সংখ্যা হল ১৮+৪+১+১=২৪।

এইটি খণ্ডমেরু ছক অনুসারে দেখান গেল।

উদ্দিষ্ট তান :	মা	গা	রে	সা			
মূলক্রম :	সা	রে	গা	মা			
	△	△	△	△			
চতুর্থ ঘুঁটি	১	০	০	০	০	০	০

তৃতীয় ঘুঁটি চালনা

মা গা	△		
গা মা	১	২	৬

দ্বিতীয় ঘুঁটি চালনা

	△	
মা গা রে	৪	১২
রে গা মা		

△	**প্রথম ঘুঁটি চালনা**
১৮	মা গা রে সা
	সা রে গা মা

এব পর একটি সপ্তস্বরের তানের প্রস্তার সংখ্যা কত হতে পারে সেটিও উদাহরণ সহযোগে বুঝলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

ধরা যাক তানটি হচ্ছে : মা গা সা রে ধা নি পা।

মূলক্রম হচ্ছে : সা রে গা মা পা ধা নি।

উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর হচ্ছে পা এবং মূলক্রমের অন্ত্যস্বর নি। নি-থেকে পা হচ্ছে তৃতীয়। অতএব ঘুঁটিটি প্রথম পংক্তির সপ্তম ঘর থেকে তৃতীয় পংক্তির শেষ ঘর ১৪৪০ তে চালিত হবে ; কেননা, তানটি হচ্ছে সপ্তস্বর এবং ব্যবধান হচ্ছে তিন। এই চালনার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ক্রম থেকে পা-র লোপ হল। তানটি এবার ষাড়ব হল।

উদ্দিষ্ট —মা গা সা রে ধা নি

মূলক্রম —সা রে গা মা ধা নি

এখানে উদ্দিষ্ট এবং মূল এই দুটির অন্ত্যস্বর নি হওয়াতে ঘুঁটি চালনার অবকাশ নেই, কেননা ব্যবধান শূন্য। অতএব ঘুঁটি প্রথম পংক্তির শূন্যাঙ্কিত ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠেই রয়ে গেল। এবারে উভয় তান থেকে নি-র লোপ করা হল। রইল ঔড়ব তান :—

উঃ—মা গা সা রে ধা

মূঃ—সা রে গা মা ধা

এখানেও অনুরূপভাবে উভয় অন্ত্যস্বর ধা হওয়াতে ঘুঁটি চালনা বন্ধ রইল এবং ঘুঁটি প্রথম পংক্তির পঞ্চম প্রকোষ্ঠে শূন্যস্থানেই রয়ে গেল। এবারে উভয় ক্রম থেকে ধা-র লোপ হল। রইল চতুঃস্বর তান ঃ

উঃ—মা গা সা রে

মূঃ –সা রে গা মা

উদ্দিষ্টান্ত রে মূলক্রমের অন্ত্যস্বর মা থেকে তৃতীয়। অতএব প্রথম পংক্তির চতুর্থ ঘরের ঘুঁটি তৃতীয় পংক্তির ১২ অঙ্কিত ঘরে এসে বসবে ; কেননা তানটি চতুঃস্বর এবং অন্ত্যস্বরের ব্যবধান তিন। এবারে রে-র লোপ হল। বাকি রইল ত্রিস্বর তান :—

উঃ—মা গা সা

মূঃ—সা গা মা

উদ্দিষ্টান্ত সা মূলক্রমের অন্ত্যস্বর মা থেকে চতুর্থ। এখানে ব্যবধান চতুর্থ হলেও ঘুঁটি প্রথম পংক্তির তৃতীয় প্রকোষ্ঠ থেকে তার নিচে তৃতীয় পংক্তির ৪- অঙ্কিত ঘরে আসবে, কেননা তার নিচে আর ঘর নেই। এটি ত্রিস্বর তান হওয়াতে ঘুঁটি আর কোন প্রকোষ্ঠকেও আশ্রয় করতে পারে না। এখানে বলা প্রয়োজন যে সিংহভূপালের ব্যাখ্যায় গোলমাল রয়ে গেছে। তিনি বলছেন "উদ্দিষ্টান্ত্যঃ ষড়্জো মূলক্রমস্য অন্ত্যান্মধ্যাৎ তৃতীয়ঃ" অর্থাৎ উদ্দিষ্টের শেষস্বর সা মূলক্রমের অন্ত্যস্বর মা থেকে তৃতীয়। অতএব তাঁর মতে— "তৃতীয়পংক্তৌ তৃতীয় কোষ্ঠকে চতুরঙ্কস্থানে লোষ্টকস্থিতিঃ" অর্থাৎ তৃতীয় পংক্তিতে তৃতীয় কোষ্ঠকে ৪ অঙ্কিত স্থানে লোষ্টকের অবস্থিতি হবে। এই ব্যাখ্যা গোঁজামিলের সামিল কেননা মা থেকে সা তৃতীয় নয় চতুর্থ। আসলে যে কারণে ঘুঁটি তৃতীয় পংক্তির ৪ অঙ্কিত ঘরে বসবে সেটি পূর্বেই বলা হয়েছে

এর মূল কারণ হচ্ছে তৃতীয় কোষ্ঠকের শেষ সীমা ৪ অঙ্কিত ঘর পর্যন্ত ; তার বেশি আর চালনার অবকাশ নেই।

এবারে দুটি তান থেকে সা-এর লোপ হল। রইল শুধু :

উঃ—মা গা

মূঃ—গা মা

উদ্দিষ্টান্ত গান্ধার মূলক্রমের অন্ত্যস্বর মধ্যম থেকে দ্বিতীয়। অতএব প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরের ঘুঁটি তার নিচে ১-এর ঘরে বসবে। গান্ধারকেও লোপ করা হল। বাকি রইল উভয় ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র মধ্যম। শেষ ঘুঁটিটি প্রথম ১-এর ঘরেই রয়ে গেল। এক্ষেত্রে ব্যবধান শূন্য হলেও ঘুঁটি শূন্য অঙ্কে চলে আসবে না, কেন না সে চালনার অবকাশ নেই। তাহলে মোট সংখ্যা আমরা পেলাম :—

১৪৪০+০+০+১২+৪+১+১=১৪৫৮। এইটিই হচ্ছে মা গা সা রে ধা নি পা—এই তানের প্রস্তার সংখ্য।

এইবার নষ্ট পরিজ্ঞান কি ভাবে হয় সেটি বলা যাক। এটিও একটি উদাহরণ সহযোগে দেখালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ধরা যাক সপ্তস্বরপ্রস্তারের সহস্রতম ভেদ সংখ্যার তানটি নির্ণয় করতে হবে। তানটি যে সাতস্বরের এটি জানা থাকায় প্রথমেই খণ্ডমেরুর প্রথমপংক্তির সপ্তম ঘরের ঘুঁটিকে তার নিচের ৭২০ সংখ্যার ঘরে বসাতে হবে। এর নিচে আর যে যে সংখ্যা আছে তা সবই সহস্রের ওপর সুতরাং ৭২০ সংখ্যাই হচ্ছে সর্বোচ্চ যেখানে এই ঘুঁটিটি চালনা করা যায়। সহস্রসংখ্যক তানের মধ্যে ৭২০ সংখ্যা পাওয়া গেল; বাকি রইল ১০০০—৭২০=২৮০। এই সংখ্যাটি পূরিত হলেই সমগ্র তানটি পাওয়া যাবে।

এর পরে প্রথম পংক্তির ষষ্ঠ ঘরের ঘুঁটিকে তার নিচে তৃতীয় পংক্তির ২৪০ সংখ্যক ঘরে বসাতে হবে। এখানেও দেখা যাচ্ছে উক্ত সংখ্যক ঘরের নিচে যে যে ঘর আছে তাদের সংখ্যা ২৮০র চেয়ে বেশি। অতএব এই ঘর ছাড়া ঘুঁটি অপর কোন ঘরে চালনা করা যায় না। ২৮০ থেকে ২৪০ পাওয়া গেল ; বাকি রইল ২৮০—২৪০=৪০ সংখ্যা।

অতঃপর প্রথম পংক্তির পঞ্চম ঘরের ঘুঁটিকে তার নিচের দ্বিতীয় পংক্তির ২৪ সংখ্যার ঘরে এনে বসাতে হবে। অপর সব ঘরের সংখ্যাই ৪০ এর চেয়ে

বেশি, সুতরাং ২৪ সংখ্যক ছাড়া অপর কোন ঘরে ঘুঁটি চালনা করা যাবে না। এবার বাকি রইল ৪০ – ২৪ = ১৬।

এর পর প্রথম পংক্তির চতুর্থ ঘরের ঘুঁটিকে তার নিচে তৃতীয় পংক্তির ১২ সংখ্যক ঘরে চালনা করতে হবে। এর নিচের সংখ্যাটি ১৬র চেয়ে বেশি; অতএব এই ঘর ছাড়া ঘুঁটি আর কোনো ঘরে বসতে পারে না। আর বাকি রইল ১৬-১২ = ৪।

এবার প্রথম পংক্তির তৃতীয় ঘরের ঘুঁটিকে তার নিচে দ্বিতীয় পংক্তির ২ সংখ্যার ঘরে বসাতে হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তার নিচে ৪ সংখ্যক ঘর যখন রয়েছে তখন তাতে বসাব না কেন? কিন্তু, সেটা সম্ভব নয়, সাতটি স্বর আমাকে নির্ণয় করতে হবে। এখানে ঘুঁটি বসিয়ে দিলে পাঁচটি স্বর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাও সম্ভব নয় কেননা স্বর নির্ণয় করবার সময় দেখা যাবে ৪ সংখ্যায় ঘুঁটি বসালে স্বরগত ব্যবধান অনুসারে যথার্থ স্বরটিকে পাওয়া যাবে না। এই কারণেই বাকি ৪ সংখ্যাকে ভেঙে ২+১+১ করে নেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য অতঃপর প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরের ঘুঁটিকে তার নিচে ১ সংখ্যায় বসাতে হবে এবং শেষ ঘুঁটিটি প্রথম পংক্তির প্রথম ঘর ১ সংখ্যাতেই থাকবে।

এই ভাবে সহস্র সংখ্যাকে সাতটি বিভিন্ন সংখ্যায় বিভক্ত করা হল। এখন এই সব সংখ্যা থেকে স্বরগুলি নিরূপণ করতে হবে।

এখানেও মূলক্রমটি বসাতে হবে। খণ্ডমেরুর ছকটি এঁকে ঘুঁটিগুলির অবস্থিতি দেখা যাক।

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
×নি						
১	০	০	০	০	০	০
	সা ×	গা ×		পা ×		ধা ×
	১	২	৬	২৪	১২০	৭২০
			রে ×		মা ×	
		৪	১২	৪৮	২৪০	১৪৪০

মূলক্রমের শেষ স্বর হচ্ছে নি। ঘুঁটি রয়েছে নিষাদের ঘরের দ্বিতীয় স্থানে। তাহলে মূলক্রমের নিষাদের পরে দ্বিতীয় স্বর ধা পাওয়া গেল। মূলক্রম থেকে ধৈবত লুপ্ত হল। রইল সা রে গা মা পা নি—এই ক্রম

এবার দেখা যাচ্ছে ঘুঁটি রয়েছে ধৈবতের ঘরে ষষ্ঠস্থানে অধঃস্থিত তৃতীয় প্রকোষ্ঠে। নি থেকে গণনা করলে ধৈবত বর্জিত মূলক্রমের তৃতীয় হচ্ছে মা। অতএব এখানে আমরা মধ্যম পাচ্ছি। এবার মূলক্রম থেকে মধ্যম বর্জিত হয়ে রইল সা রে গা পা নি।

এর পরের ঘুঁটি রয়েছে পঞ্চমের ঘরে পঞ্চম স্থানে অধঃস্থিত দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে। মধ্যমবর্জিত মূলক্রমের নি থেকে গণনা করলে দ্বিতীয় স্বর হচ্ছে পা। অতএব এবারে পা পাওয়া গেল। পঞ্চম বর্জিত হয়ে মূলক্রম রইল সা রে গা নি।

পরবর্তী ঘুঁটি রয়েছে মধ্যমের ঘরে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে অধঃস্থিত তৃতীয় ঘরে। পঞ্চমবর্জিত মূলক্রমের নি থেকে গণনা করে তৃতীয় স্বর হচ্ছে রে। অতএব এবারে রে পাওয়া গেল। মূলক্রম থেকে রে বাদ দিলে থাকে সা গা ন।

এর পরের ঘুঁটি রয়েছে গান্ধার অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে অধঃস্থিত দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে। ঋষভবর্জিত মূলক্রমের নি থেকে গণনা করে দ্বিতীয় স্বর হচ্ছে গা। স্থতরাং এবারে গা পাওয়া গেল। গান্ধার বাদ দিয়ে মূলক্রম রইল সা নি।

পরের ঘুটি রয়েছে ঋষভ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে অধঃস্থিত দ্বিতীয় ঘরে। গান্ধার বর্জিত মূলক্রমের নি থেকে 'দ্বিতীয় স্বর হচ্ছে সা। অতএব সা পাওয়া গেল। বাকি রইল নি। এইটিই নষ্ট তানের প্রথম স্বর।

তাহলে নষ্ট তানটি হল নি সা গা রে পা মা ধা।

খণ্ডমেরুর উর্ধ্ব সংখ্যা এবং শেষ সংখ্যার সংযোগেও নির্দিষ্ট প্রস্তার সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন সপ্তম পংক্তির ৭২০+৪৩২০=৫০৪০ সংখ্যাটি সপ্তস্বরের প্রস্তার সংখ্যা। অনুরূপভাবে ১২০+৬০০=৭২০ হল ষট্‌স্বরের প্রস্তার সংখ্যা। ২৪+৯৬=১২০ হল পঞ্চস্বরের প্রস্তার সংখ্যা। ৬+১৮=২৪ হল চতুঃস্বরের প্রস্তার সংখ্যা। ২+৪=৬ হল ত্রিস্বরের প্রস্তার সংখ্যা। ১+১=২ হল দ্বিস্বরের প্রস্তার সংখ্যা।

তান শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন—তন্যতে বিস্তার্যত ইতি তনোতের্ধাতোঃ অকর্তরি চ—ইত্যাদিনা স্থত্রেণ কর্মণি ঘঞি তান ইতি—রূপং দায়ো লাভ ইতিবৎ। বিস্তারই হচ্ছে তানের ধর্ম। ক্রম অনুযায়ী আরোহণ এবং অবরোহণটুকুই মূর্ছনার কাজ। কিন্তু স্বরের বিবিধ বিন্যাস

হচ্ছে তানের ধর্ম এবং এই বিন্যাসের সংখ্যা যে কত বিরাট তা আমরা দেখলাম। এই বিন্যাসগত ব্যাপ্তির জন্যই তান শব্দটি সার্থকতা লাভ করেছে।

পরিশেষে শার্ঙ্গদেব ষাডব এবং ঔড়বীকৃত শুদ্ধ মূর্ছনায় যেসব তানের কথা আমরা পূর্বে বলেছি সেগুলির নামোল্লেখ করেছেন। এদের যে সব যজ্ঞীয় নামকরণ করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় শুদ্ধতান বহু প্রাচীন যুগ থেকে চলে এসেছে। ষড়জহীন সাতটি শুদ্ধ তানের নাম হচ্ছে—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ এবং রাজসূয়। ঋষভহীন সাতটি শুদ্ধ তানের নাম হল -স্বিষ্টকৃৎ, বহুসৌবর্ণ, গোসব, মহাব্রত, বিশ্বজিৎ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং প্রাজাপত্য। পঞ্চমহীন সাতটি শুদ্ধতান হচ্ছে - অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, সূর্যক্রান্ত, গজক্রান্ত, বলভিং, নাগপক্ষক। নিষাদহীন সাতটি শুদ্ধ তান হল চাতুর্মাস্য, সংস্থা, শস্ত্র, উক্‌থ, সৌত্রামণী, চিত্রা এবং উদ্ভিদ। এগুলি ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত ষড়্‌জহীন সাতটি শুদ্ধতান হচ্ছে সাবিত্রী, অর্ধ-সাবিত্রী, সর্বতোভদ্র, আদিত্যানাময়ন, গবাময়ন, সর্পাণাময়ন এবং কৌণ-পায়ন। ঋষভহীন সাতটি শুদ্ধতান হল—অগ্নিচিৎ, দ্বাদশাহ, উপাংশু, সোমাভিধ, অশ্বপ্রতিগ্রহ, বর্হিরথ, অভ্যুদয়। গান্ধারহীন সাতটি শুদ্ধতান—সর্বস্বদক্ষিণ, দীক্ষ, সোমাখ্য, সমিৎ, স্বাহাকার, তনূনপাৎ, গোদোহণ।

ষড়্‌জগ্রামের ষড়্‌জ-পঞ্চমহীন শুদ্ধ ঔড়বতান—ইড়া পুরুষমেধ, শ্যেন, বজ্র, ইষু, অঙ্গিরা, কঙ্ক। নিষাদ-গান্ধারহীন সাতটি তান জ্যোতিষ্টোম, দর্শ, নন্দ, পৌর্ণমাসক, অশ্বপ্রতিগ্রহ, রাত্রি, সৌভর। পঞ্চম-ঋষভহীন সাতটি তান -সৌভাগ্যকৃৎ, কারীরী, শান্তিকৃৎ, পুষ্টিকৃৎ, বৈনতেয়, উচ্চাটন, বশীকরণ।

মধ্যমগ্রামের ঋষভ-ধৈবতহীন সাতটি শুদ্ধতান—ত্রৈলোক্যমোহন, বীর, কন্দর্পবলশাতন, শঙ্খচূড়, গজচ্ছায, রৌদ্র, বিষ্ণুবিক্রম। নিষাদ-গান্ধারহীন সাতটি তান—ভৈরব, কামদা, অবভৃত, অষ্টকপালক স্বিষ্টকৃৎ, বষট্‌কার এবং মোক্ষদ।

বর্ণ এবং অলঙ্কার ঃ

গানক্রিয়াকে বর্ণ বলা হয়। বর্ণ অর্থে বিবিধ স্বরের সুললিত উচ্চারণও বোঝায়। বর্ণ ধাতুর মানে বিস্তার বা বর্ণন। যে ক্রিয়াতে স্বর এবং পদের বর্ণনার কার্য সাধিত হয় তার আখ্যা বর্ণ।

বর্ণ চার প্রকার—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী।

স্থায়ী—একটি স্বরেরই থেকে থেকে বার বার প্রয়োগকে বলে স্থায়ী বর্ণ। যেমন, সা, সা, সা, সা।

আরোহী—স্বরের আরোহণ। যেমন সা রে গা মা পা ধা নি—এই রকম চড়িয়ে যাওয়াকে আরোহীবর্ণ বলে।

অবরোহী—এই আরোহীর উল্টো অর্থাৎ নীচের দিকে নেমে আসা। যেমন,—নি ধা পা মা গা রে সা।

সঞ্চারী—স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী—এই তিন বর্ণের সংমিশ্রণে যে স্বরবর্ণন হয় তাকে বলে সঞ্চারী। যেমন—সা রে সা রে গা র্সা নি ধা সা রে গা

ওপরে যে স্থায়ী বর্ণের কথা বলা হল তার সঙ্গে কিন্তু রাগসঙ্গীতের স্থায় নামক ব্যাপারের সম্বন্ধ নেই। রাগের স্থিতির জন্য যে প্রয়োগ অথবা রাগসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রয়োগকে স্থায় বলে। আর, স্থায়ীবর্ণ হচ্ছে কেবলমাত্র স্বরের উচ্চারণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়া। এই জন্য স্থায়ীবর্ণ সঙ্গীতশাস্ত্রের স্বরাধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

বর্ণের কথা বলা হল। এর পরে এল অলঙ্কার। বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভকে বলা হয় অলঙ্কার। সন্দর্ভ মানে হচ্ছে পরম্পরাযুক্ত রচনা। অতএব বর্ণবিন্যাস এমন হওয়া উচিত যাতে করে সেটি পরম্পরাযুক্ত হয়; অর্থাৎ এলেমেলো না হয়। এখানে যে "বিশিষ্ট" শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এর একটি তাৎপর্য আছে। শুধু যদি বলা হত—"বর্ণসন্দর্ভকেই অলঙ্কার বলা হয়" তাহলে হয়ত কথাটা সঙ্গত হত না কেননা সঞ্চারী বর্ণের সঙ্গে তাহলে অলঙ্কারের ভেদটা তেমন স্পষ্ট হত না। সঞ্চারী বর্ণেও নানারকম বর্ণবিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যাতে এই রকম গোলমাল না হয় এই কারণেই বলা হল "বিশিষ্ট স্বরসন্দর্ভ।"

নারীদেহে যেমন অলঙ্কার শোভা সম্পাদন করে, কাব্যে যেমন অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার রসগৌরব বৃদ্ধি করে, তেমন সঙ্গীতেও এই অলঙ্কারগুলি মণ্ডণের কাজ করে থাকে।

এই অলঙ্কার প্রকরণে মূর্ছনার প্রথম স্বরকে বলা হয়েছে "মন্দ্র"। মন্দ্রের দ্বিগুণ হচ্ছে "তার"। দ্বিগুণ স্বর অর্থ হচ্ছে অষ্টম স্বর। খাদের সা থেকে অষ্টম অর্থাৎ চড়ার সা হচ্ছে দ্বিগুণ। কল্লিনাথ টীকায় বলেছেন—দ্বিগুণঃ অষ্টমঃ।

মন্দ্র, মধ্য তার—এই তিনটি সপ্তক বর্তমান। অলঙ্কার প্রসঙ্গে মন্দ্রের সা বলতে যে স্বরটিকে বোঝানো হয়েছে তাকে "মধ্য-তার" বলা হয় কেননা এই স্বরটি মধ্য সপ্তকের প্রথম স্বরে এসে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ মন্দ্রসপ্তক ব্যবহার করলে এটি তার স্বর। একেই "মধ্যস্তার" বলা হয়। প্রসন্ন, মৃদু, মন্দ্র—এই সব বিভিন্ন শব্দ মন্দ্র বা খাদের স্বরকেই বোঝায়। দীপ্ত বললে "তার" বা চড়ার স্বর বুঝতে হবে।

প্রাচীন স্বরলিপিতে মন্দ্রস্বর হচ্ছে বিন্দুশিরা। অর্থাৎ, স্বরের মাথায় বিন্দু চিহ্ন ০ থাকলে সেটিকে মন্দ্রস্বর বলে বুঝতে হবে। স্বরের ওপরে উর্ধ্বরেখা থাকলে সেটি হবে তার-স্বর। প্লুতস্বর বললে একটি স্বর তিনবার উচ্চারণীয় বুঝতে হবে। হ্রস্ব-স্বরগুলিকে এইভাবে বোঝানো হয়েছে—স রি গ ম প ধ নি। দীর্ঘস্বর বোঝাতে আ-কার এবং ঈ-কার যোগ করা হয়েছে। যথা, সা রী গা মা পা ধা নী

ক্রম, মূর্ছনা, তান এবং অলঙ্কার—এই শব্দগুলির প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। স্বরের ক্রমিক আরোহণ বা আবরোহণ হচ্ছে ক্রম। সপ্তস্বরের ক্রমিক আরোহণ এবং আবরোহণকে বলা হয় মূর্ছনা। এই যে সাতটি স্বরের মূর্ছনা এর ক্রমটি যদি ভেঙে যায় তাহলেই এটি একটি তান হয়ে গেল। আবার যদি সপ্তস্বরের ক্রম থেকে স্বরের লোপসাধন করা যায়, যেমন স রি গ ম প নি, বা, স রি গ প ধ হয় তাহলেও এগুলি এক একটি তান হয়ে গেল। মূর্ছনা এবং তানে একটি স্বরের একাধিক প্রয়োগ হয় না কিন্তু বর্ণালঙ্কারে সেটি হয়। অলঙ্কার হচ্ছে স্বরের বহুধা বিন্যাস। যখন স্বর-বিন্যাস—স স রি ম গ, রি রি গ প ম, গ গ ম ধ প, ম ম প নি ধ—এইরকম হবে তখন তাকে মূর্ছনা বা তান বলব না সেটি হবে অলঙ্কার।

স্থায়ীবর্ণের অলঙ্কার সাতটি—প্রসান্নদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, ক্রমরেচিত, প্রস্তার এবং প্রসাদ।

আরোহীবর্ণের অলঙ্কার বারটি—বিস্তীর্ণ, নিষ্কর্ষ, বিন্দু, অভ্যুচ্চয়, হসিত, প্রেঙ্খিত, আক্ষিপ্ত, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, উদ্গীত, উদ্বাহিত, ত্রিবর্ণ, বেণী।

সঞ্চারী অলঙ্কারের প্রকার ভেদ পঁচিশটি— মন্দ্রাদি, মন্দ্রমধ্য, মন্দ্রান্ত, প্রস্তার প্রসাদ, ব্যাবৃত্ত, স্খলিত পরিবর্তক, আক্ষেপ, বিন্দু, উদ্বাহিত, ঊর্মি, সম, প্রেঙ্খ, নিষ্কুজিত, শ্যেন, ক্রম, উদ্ঘট্টিত, রঞ্জিত, সন্নিবৃত্তপ্রবৃত্তক, বণুরস, ললিত-স্বর, হুঙ্কার, হ্রাদমান, অবলোকিত।

গীতজ্ঞগণ আরও সাতটি অলঙ্কার পরিকল্পনা করেছেন—তারমন্দ্রপ্রসন্ন, মন্দ্রতারপ্রসন্ন, আবর্তক, সম্প্রদান, বিধুত, উপলোলক, উল্লাসিত।

কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগুলিরই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য বিবিধ স্বরবিন্যাসে আরো অসংখ্য অলঙ্কার সৃষ্টি করা যায়।

বিবিধ অলঙ্কার সাধনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সাধনা থেকে রক্তিলাভ বা রঞ্জকত্ব জ্ঞান হয়। এছাড়া স্বরূপজ্ঞান, স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের বৈচিত্র্যজ্ঞান এই সবই অলঙ্কার নিরূপণে লাভ করা সম্ভব। যে তানের সঙ্গে যে যজ্ঞনাম যুক্ত হয়েছে সেই তানের সম্যক প্রয়োগ হলে সেই যজ্ঞফল লাভ হয়। গান্ধর্বে অর্থাৎ জাতি থেকে রাগসঙ্গীত পযন্ত বিবিধ সঙ্গীত শ্রুতিবিহিত মূর্ছনা এবং তান শ্রেয় বিধান করে। দেশী গানে কূটতান প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়ে রঞ্জকত্ব প্রদান করে থাকে।

এক কথায় প্রাচীন সঙ্গীতে বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণই হচ্ছে মূর্ছনা।

জাতি

জাতি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব কিছু বলেন নি। টীকাকারগণ বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে শ্রুতি, স্বর, গ্রাম সমূহ থেকে যে গীতরূপ জন্মগ্রহণ করে তার নাম জাতি। রাগাদি সব কিছুর জন্মহেতু হচ্ছে এই জাতি।

শুদ্ধ জাতি হচ্ছে সাত প্রকার—ষড়্‌জ প্রভৃতি শুদ্ধ স্বরের নাম থেকে তাদের নামকরণ হয়েছে—ষাড়্‌জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী।

এই জাতির পরিচয়কারী স্বর হচ্ছে ন্যাস, অপন্যাস, অংশ এবং গ্রহ। শুদ্ধ জাতি সাতটি স্বরে সম্পূর্ণ হবে এবং তার-ষড়্‌জে এই গীতির ন্যাস বা সমাপ্তি নিষিদ্ধ। এই সব লক্ষণগুলির বিকৃতি ঘটলে তাকে বিকৃত জাতি বলা হয় কিন্তু বিকৃতি সত্ত্বেও জাতিতে কখন তার-ন্যাসত্ব ঘটবে না। এই নিষেধটি শুদ্ধ এবং বিকৃত উভয়ক্ষেত্রেই বলবৎ থাকবে। অতএব বিকৃত জাতির মধ্যে ন্যাসকে গণনার মধ্যে আনা হয় না।

সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ, অংশ, অপন্যাস—এইগুলির এক একটি করে বর্জন করলে চারটি ভেদ হয়। দুটি ত্যাগ করলে ছটি ভেদ হয়। তিনটি ত্যাগ করলে চারটি ভেদ হয় এবং চারটি বর্জন করলে একটি ভেদ হয়। এইভাবে ষাড়্‌জীর ১৫টি ভেদ হচ্ছে। এর মধ্যে পূর্ণতাহীনের সংখ্যা হচ্ছে ৮টি বাকি ৭টি অন্যান্য লক্ষণে পাওয়া যাচ্ছে।

ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব হলেই অসম্পূর্ণতা ঘটে। ষাড়্‌জী নামক জাতিতে কেবলমাত্র ষাড়বত্ব থেকে অসম্পূর্ণত্ব হয়। অতএব পূর্বোল্লেখ অনুসারে অসম্পূর্ণত্ব হেতু ষাড়্‌জীর কেবলমাত্র ৮টি ভেদ হয়।

সম্পূর্ণত্ববর্জিত ষাড়্‌জীর প্রকারভেদ

সম্পূর্ণত্ব বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব এবং গ্রহ বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব এবং অংশ বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব এবং অপন্যাস বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ এবং অংশ বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ এবং অপন্যাস বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব, অংশ এবং অপন্যাস বর্জিত	১
সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ, অংশ এবং অপন্যাস বর্জিত	১

ষাড়্জীর ইতরলক্ষণবর্জিত প্রকারভেদ

গ্রহ বর্জিত	১
অংশ বর্জিত	১
অপন্যাস বর্জিত	১
গ্রহ এবং অংশ বর্জিত	১
গ্রহ এবং অপন্যাস বর্জিত	১
অংশ এবং অপন্যাস বর্জিত	১
গ্রহ, অংশ এবং অপন্যাস বর্জিত	১
	৭

ষাড়্জীর মোট প্রকারভেদ ৮+৭=১৫

বাকি ছটি জাতিতে ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্বের ১৬টি প্রকারভেদ হতে পারে। এর সঙ্গে সাতটি ইতর লক্ষণবর্জিত প্রকারভেদ যোগ করলে ১৬+৭=২৩টি ভেদ হয়। ষাড়্জী ভিন্ন অপর ছটি জাতির প্রত্যেকটির এই ২৩টি প্রকারভেদ হয়। তাহলে মোট প্রকারভেদ হচ্ছে ৬×২৩=১৩৮। এই সংখ্যার সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত ১৫টি ষাড়্জীর প্রকারভেদ যোগ করলে সবশুদ্ধ পাওয়া গেল ১৩৮+১৫=১৫৩।

আর্যভী থেকে নৈষাদী

ষাড়ব এবং ঔড়ব

সম্পূর্ণত্ব বর্জিত	„	২	২	২	২	২	১
সম্পূর্ণত্ব এবং গ্রহ বর্জিত	„	২	২	২	২	২	২
সম্পূর্ণত্ব এবং অংশ বর্জিত	„	২	২	২	২	২	২
সম্পূর্ণত্ব এবং অপন্যাস বর্জিত	„	২	২	২	২	২	২
সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ এবং অংশ বর্জিত	„	২	২	২	২	২	২
সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ এবং অপন্যাস বর্জিত	„	২	২	২	২	২	১
সম্পূর্ণত্ব অংশ এবং অপন্যাস বর্জিত	„	২	২	২	২	২	২
সম্পূর্ণত্ব, গ্রহ, অংশ এবং অপন্যাস বর্জিত	„	২	২	২	২	২	২
		১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬

১৬+১৬+১৬+১৬+১৬+১৬=৯৬

	আর্ষভী	গান্ধারী	মধ্যমা	পঞ্চমী	ধৈবতী	নৈষাদী
গ্রহ বর্জিত	১	১	১	১	১	১
অংশ বর্জিত	১	১	১	১	১	১
অপন্যাস বর্জিত	১	১	১	১	১	১
গ্রহ, অংশ বর্জিত	১	১	১	১	১	১
গ্রহ, অপন্যাস বর্জিত	১	১	১	২	১	১
অংশ, অপন্যাস বর্জিত	১	১	১	১	১	১
গ্রহ, অংশ, অপন্যাস বর্জিত	১	১	১	১	১	১
	৭	৭	৭	৭	৭	৭

৭+৭+৭+৭+৭+৭=৪২

ষাডব-ঔড়বত্বহেতু প্রকারভেদ—৯৬

ইতরলক্ষণ বর্জিত প্রকারভেদ—৪২

৯৬+৪২=১৩৮

ষাড্‌জীর প্রকারভেদ—১৫

জাতিসমূহের মোট প্রকারভেদ—১৩৮+১৫=১৫৩।

এই বিকৃতভেদ সংসর্গে উৎপন্ন ১১টি জাতি স্বীকৃত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—ষড্‌জ কৈশিকী, ষড্‌জোদীচ্যবা, ষড্‌জ-মধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধার-পঞ্চমী, আন্ধ্রী, নন্দয়ন্তী।

এই মিশ্র জাতিগুলি কোন্ কোন্ জাতির সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে সেটি বলা হয়েছে :—

ষড্‌জ-কৈশিকী	.	ষাড্‌জী এবং গান্ধারী
ষড্‌জ-মধ্যমা	..	ষাড্‌জী এবং মধ্যমা
গান্ধার-পঞ্চমী	..	গান্ধারী এবং পঞ্চমী
আন্ধ্রী	...	গান্ধারী এবং আর্ষভী
ষড্‌জোদীচ্যবা	...	ষাড্‌জী, গান্ধারী এবং ধৈবতী
কার্মারবী	..	নৈষাদী, পঞ্চমী এবং আর্ষভী
নন্দয়ন্তী	..	গান্ধারী, পঞ্চমী এবং আর্ষভী
গান্ধারোদীচ্যবা	..	গান্ধারী, ধৈবতী, ষাড়্‌জী, মধ্যমা

মধ্যমোদীচ্যবা ... গান্ধারী, ধৈবতী, মধ্যমা, পঞ্চমী
রক্তগান্ধারী ... গান্ধারী, নৈষাদী, মধ্যমা, পঞ্চমী
কৈশিকী ... ষাড়্‌জী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, নৈষাদী।

ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলি হচ্ছে—ষাড়্‌জী, ষড়্‌জ-কৈশিকী ষড়্‌জ-মধ্যমা, ষড়্‌জোদীচ্যবা, নৈষাদী, ধৈবতী, আর্ষভী।

মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলি হচ্ছে—গান্ধার-পঞ্চমী, অন্ধ্রী,কার্মারবী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী।

জাতিগুলির পূর্ণত্ব, ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব এইরকম :—

পূর্ণ—কার্মারবী, গান্ধার-পঞ্চমী, ষড়্‌জ-কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা এগুলির ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব স্বীকৃত হয় না।

পূর্ণ এবং ষাড়ব—ষাড়্‌জী, নন্দয়ন্তী, আন্ধ্রী, গান্ধারোদীচ্যবা। এগুলির ঔড়বত্ব স্বীকৃত হয় না।

পূর্ণ, ষাড়ব এবং ঔড়ব—ষড়্‌জমধ্যমা, ষড়্‌জোদীচব্যা, নৈষাদী. ধৈবতী, আর্ষভী, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী।

অতঃপর শার্ঙ্গদেব ভরতাদির মতের উল্লেখ করে বলেছেন যে পঞ্চমী, মধ্যমা এবং ষড়্‌জ-মধ্যমা,—এই তিনটি জাতিতে স্বরসাধারণের প্রয়োগ হয় (শ্রুতিপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। ষড়্‌জ অংশস্বর হলে ষড়্‌জসাধারণ হবে এবং মধ্যম বা পঞ্চম অংশ হলে মধ্যমসাধারণত্ব ঘটবে। কম্বল এবং অশ্বতরের মতের উল্লেখ করে শার্ঙ্গদেব বলছেন, যেসব জাতিতে নিষাদ এবং গান্ধার অল্প সেসব ক্ষেত্রেই এই স্বরসাধারণত্ব ঘটে থাকে। স্বল্প নিষাদ, গান্ধারযুক্ত রাগ, ভাষা প্রভৃতিতেও স্বরসাধারণের প্রয়োগ হয়। ষড়্‌জ-মধ্যমা জাতিতে যখন নিষাদ এবং গান্ধার অংশস্বর হয় তখন স্বরসাধারণের প্রয়োগ হবে না; অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থায় সাধারণ বিকৃত স্বরের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়।

এরপর জাতির অংশসংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে।

জাতি	অংশসংখ্যা	জাতি	অংশসংখ্যা
নন্দয়ন্তী	১	আন্ধ্রী	৪
মধ্যমোদীচ্যবা	১	কার্মারবী	৪
গান্ধার-পঞ্চমী	১	ষড়্‌জোদীচ্যব্যা	৪
ধৈবতী	২	রক্তগান্ধারী	৫

জাতি	অংশসংখ্যা	জাতি	অংশসংখ্যা
গান্ধারোদীচ্যবা	১	গান্ধারী	৫
পঞ্চমী	২	মধ্যমা	৫
নৈষাদী	৩	ষাড়্জী	৫
আর্ষভী	৩	কৈশিকী	৬
ষড়্জ-কৈশিকী	৩	ষড়্জ-মধ্যমা	৭
			৬৩

অতঃপর জাতির লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। জাতির প্রধান লক্ষণ দশটি—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস, বহুত্ব এবং অল্পত্ব। এ ছাড়া আরো তিনটি লক্ষণ হচ্ছে—অন্তরমার্গ, ষাড়ব এবং ঔড়ব। সব মিলিয়ে লক্ষণ হল তেরটি।

গীতের আদিতে যে স্বর নিহিত রয়েছে তাকে বলে গ্রহস্বর, অর্থাৎ যে স্বরে গীত আরম্ভ করা হয় সেটিই হচ্ছে গ্রহস্বর। সাধারণতঃ অংশস্বরটিই গ্রহস্বর বলে পরিগণিত হয়।

যে স্বরটি সঙ্গীতে রক্তকত্ব প্রদান করে, গীতখণ্ডে বা বিদারীতে যার সংবাদী এবং অনুবাদীর বাহুল্য থাকে, যার থেকে তার এবং মন্দ্রের অবস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়, যে স্বর স্বয়ং বা যার সংবাদী, অনুবাদী স্বর প্রভৃতি ন্যাস, অপন্যাস, বিন্যাস এবং গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রাধান্য এবং যোগ্যতা অনুসারে সেই বহুল-প্রযুক্ত স্বরটি বাদী বা অংশ বলে স্বীকৃত হয়। প্রয়োগে বহুলত্ব এবং ব্যাপকত্বই হচ্ছে অংশের সাধারণ লক্ষণ। অংশ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগ, অর্থাৎ অংশই হচ্ছে জাতিরাগাদি বিভাগের হেতু।

মধ্যসপ্তকে অংশস্বর হলে চড়ার দিকে অর্থাৎ তারপ্তসকে সেই স্বর থেকে চতুর্থ স্বর পর্যন্ত আরোহণ করা চলে। এর বেশি আর উচিত নয়। অবশ্য এটি গায়নক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। অধিক চড়াতে অসমর্থ হলে যতটা সুন্দরভাবে পারা যায় ততটা চড়ানোই কর্তব্য। চড়ার দিকে লুপ্ত স্বরকে ধরে গণনা করতে হবে, অর্থাৎ এই যে চতুঃস্বর পর্যন্ত আরোহণের কথা বলা হল এর মধ্যে যদি সঙ্গীতে প্রয়োগের দিক থেকে কোন স্বর লোপ্য থাকে তবে সেইটিকে ধরেই চতুঃস্বর পযন্ত গণনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, মধ্যমস্বর যদি অংশ হয় তবে উক্ত চতুঃস্বরের মধ্যে মধ্যমকেও

ধরতে হবে কেন-না মধ্যমকে বাদ দিলে পা ধা নি এই তিনটি স্বর থাকে, চতুঃস্বর পূর্ণ হয় না। অতএব মধ্যমকে এর মধ্যে ধরে চতুঃস্বর পূর্ণ করতে হবে। সা যদি অংশস্বর হয় তাহলে এ প্রশ্ন ওঠে না কেন-না সা-র পর রে গা মা পা—এই চারটে স্বরই পাওয়া যাচ্ছে। নন্দয়ন্তী নামক জাতি গীতে আরোহণ কেবলমাত্র তার-ষড্‌জ পর্যন্ত হবে, তার বেশি নয়। এই গেল চড়া বা তার-লক্ষণ।

নিচের দিকে কতখানি আসা যেতে পারে সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মধ্যসপ্তকে অংশস্বর হলে মন্দ্রসপ্তকের সেই স্বর পর্যন্ত অবরোহণ করা যেতে পারে অথবা মন্দ্রস্থিত স্বরগ্রামের একেবারে শেষ স্বর পর্যন্ত অবরোহণেও চলতে পারে। অন্যথা, মন্দ্রসপ্তকের ঋষভ অথবা ধৈবত পর্যন্ত অবরোহণ করা যেতে পারে। এইরকম নিয়মাদি নির্দিষ্ট হলেও শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে অবরোহণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়েছে।

যে স্বরে গীতটি সমাপ্ত হয় সেই স্বরটিকে ন্যাসস্বর বলা হয়। একুশটি ন্যাসস্বর স্বীকৃত হযেছে :

জাতি	ন্যাস	জাতি	ন্যাস
ষাড্‌জী	সা	গান্ধারোদীচ্যবা	মা
আর্ষভী	রে	মধ্যমোদীচ্যবা	মা
গান্ধারী	গা	কৈশিকী	নি, পা, গা
মধ্যমা	মা	কার্মারবী	পা
পঞ্চমী	পা	নন্দয়ন্তী	গা
ধৈবতী	ধা	গান্ধার-পঞ্চমী	গা
নৈষাদী	নি	ষড্জ-কৈশিকী	গা
ষড্‌জ-মধ্যমা	সা, মা	আন্ধ্রী	গা
ষড্জোদীচ্যবা	মা	রক্তগান্ধারী	গা

যে স্বরটি গীতের বিদারী বা একটি খণ্ডের সমাপ্তি নির্দেশ করে সেই স্বরকে অপন্যাস স্বর বলা হয়। অপন্যাস স্বরের সংখ্যা ৫৬।

কার্মারবী, নৈষাদী, আন্ধ্রী, মধ্যমা এবং আর্ষভীতে অংশস্বরই অপন্যাসস্বর। ষড্‌জোদীচ্যবা, গান্ধারোদীচ্যবা এবং মধ্যমোদীচ্যবায় ষড্‌জ এবং ধৈবত ; রক্তগান্ধারীতে মধ্যম , গান্ধারীতে ষড্‌জ এবং মধ্যম , ষড়্‌জ-কৈশিকীতে

ষড়্জ, পঞ্চম এবং নিষাদ; পঞ্চমীতে নিষাদ, ঋষভ, পঞ্চম; গান্ধার-পঞ্চমীতে ঋষভ এবং পঞ্চম; ষাড়্জীতে গান্ধার এবং পঞ্চম; ধৈবতীতে ঋষভ, মধ্যম এবং ধৈবত; নন্দয়ন্তীতে মধ্যম এবং পঞ্চম; কৈশিকীতে ঋষভ ছাড়া আর সব স্বরই অপন্যাস হতে পারে (মতান্তরে সাতটি স্বরই অপন্যাস হতে পারে)। ষড়্জ-মধ্যমায় সাতটি স্বরই অপন্যাস হতে পারে। এক্ষেত্রে অংশস্বরই অপন্যাসস্বর।

অংশ এবং অপন্যাস এক—এরকম উনিশটি স্বর আছে। বাকী কেবলমাত্র অপন্যাসস্বরের সংখ্যা ৩৭। সব মিলিয়ে ৫৬টি অপন্যাসস্বর পাওয়া যায়। যদি কৈশিকীতে সাতটি অপন্যাসস্বর হয় তাহলে এই সংখ্যা হবে ৫৭।

যে স্বরটি অংশের সহযোগী (অবিবাদী) এবং গীতের প্রথম বিদারী বা প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক সেই স্বরটিকে সংন্যাস বলা হয়। বিন্যাসস্বরটিও অংশের সহযোগী, তবে এটি বিদারীর শেষে প্রযুক্ত না হয়ে বিদারীস্থিত একটি পাদের শেষে প্রযুক্ত হয়।

অলঙ্ঘন এবং অভ্যাসের দ্বারা উচ্চারিত স্বরের প্রয়োগকে বহুত্ব বলা হয়। স্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করে যাওয়ার নাম লঙ্ঘন। স্বরকে বহুলভাবে স্পর্শ করাই হচ্ছে অলঙ্ঘন। অভ্যাস অর্থে স্বরের আবৃত্তি বোঝায়। স্বরকে এই দুভাবে ব্যবহার করলেই গানে তার বহুত্বের বিকাশ হয়। এই দুটি প্রায় অংশের পর্যায়েই পড়ে, এই কারণে এদের সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব 'পর্যায়াংশ' এই শব্দটি ব্যবহার করছেন। অলঙ্ঘনজনিত যে বহুত্ব সেটি বাদীর অনুরূপ আর অভ্যাসজনিত অর্থাৎ আবৃত্তিহেতু যে বহুত্ব সেটি সংবাদীর তুল্য।

অলঙ্ঘন এবং আবৃত্তি এই দুই প্রকার বহুত্বের মধ্যে তফাৎ আছে। অলঙ্ঘন হচ্ছে স্বরের অত্যাবশ্যিক প্রয়োগ, অর্থাৎ গীতের গতি এবং ভঙ্গি অনুসারে এই স্বরটির বহুল প্রয়োগ এড়াবার জো নেই। আর আবৃত্তি বা অভ্যাস হচ্ছে এমন একটি স্বরের প্রয়োগ যেটি উক্ত বহুলপ্রযুক্ত স্বরের সঙ্গে সংযোগরক্ষার জন্য বারে বারে আসবেই। একটি স্বরের বহুল প্রয়োগ হলে সঙ্গতিরক্ষার জন্য অপর-একটি স্বরের প্রয়োগও প্রায়ই ঘটে থাকে।

বহুত্বের উল্টো অল্পত্বও দুই প্রকার—লঙ্ঘন এবং অনভ্যাস। ঈষৎ স্পর্শ বা অল্প একটু ছুঁয়ে যাওয়াই হচ্ছে লঙ্ঘন। স্বরের লোপসাধনকেও লঙ্ঘন বলা হয় যেমন ষাড়ব বা ঔড়বের ক্ষেত্রে ঘটে।

গীতের অন্তঃপ্রদেশে অর্থাৎ ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতি স্থানগুলি পরিত্যাগ করে গীতের অন্তর্ভাগে মাঝে মাঝে স্বরাদির কখনো লঙ্ঘন, কচিৎ অনভ্যাসে

সৃষ্ট ভঙ্গিবিশেষদ্বারা বৈচিত্র্যসম্পাদনকে অন্তরমার্গ বলা হয়। এই বৈচিত্র্য-গুলি অংশস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করতে হবে। বিকৃত জাতিতে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে এইরকম বলা হয়েছে।

এই অন্তরমার্গ নামক প্রয়োগটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই দিক দিয়ে যে জাতি গানেও বহু কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতার অবকাশ রাখা হয়েছে। অবশ্য এটিও স্বীকার্য যে বহু বন্ধনের মধ্যে এই স্বাধীন প্রয়োগের অবসর কমই ছিল। প্রথম দিকে এই স্বাধীনতা আদৌ ছিল না। পরবর্তী কালে জাতি গানের বিস্তৃতির সময় শিল্পীদের প্রচেষ্টায় এইটি স্বীকৃত হয়।

ষাড়ব এবং ঔড়বের পরিচয় আমাদের জানাই আছে, তবে এত শব্দ থাকতে ঔড়ব-শব্দটি কেন বেছে নেওয়া হল তার কারণ অনুমান করা শক্ত। উড়ু অর্থাৎ নক্ষত্রগণ যেখানে ভ্রমণ করে অর্থাৎ আকাশ বা ব্যোমকে উড়ুব বলে। পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যোম হচ্ছে পঞ্চম। এই হিসাবে ঔড়ব-শব্দটি পঞ্চসংখ্যা নির্দেশ করছে।

সম্পূর্ণ অবস্থা থেকে ষাড়ব এবং ঔড়ব হলে ক্রমেই অল্প থেকে অল্পতরতা ঘটে কেন-না সাতটি স্বর থেকে ছটি এবং তারপরে পাঁচটি স্বর অবলম্বন করা হয়। পঞ্চমী নামক জাতিতে কিন্তু এর বিপর্যয় ঘটে। এক্ষেত্রে ষাড়ব হলে অল্পতরত্ব এবং ঔড়ব হলে অল্পত্ব ঘটে।

এর পরে জাতিগুলির লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে :

ষাড়্‌জী—অংশ এবং গ্রহ স্বর পাঁচটি—সা, গা, মা, পা, ধা। একই গানে অবশ্য পাঁচটি অংশস্বরের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বিকল্পে বা গীত হিসাবে অংশস্বর নির্ধারিত হয়। নিষাদের লোপে এই জাতিটি ষাডব হতে পারে কিন্তু এটি ঔড়ব হবে না। গান্ধার অংশ হলে নিষাদের লোপ হবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ষড়্‌জ, মধ্যম এবং পঞ্চম অংশ হলে স্বর সাধারণ হবে, অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অন্তর-গান্ধার এবং কাকলী-নিষাদের প্রয়োগ হবে। এই জাতিতে সা—গা এবং সা ধা এই দুটি সংগতির বাহুল্য লক্ষিত হয়। এতে ধৈবতাদি মূর্ছনা অর্থাৎ ষড়্‌জগ্রামের উত্তরায়তা মূর্ছনার প্রয়োগ হয়। এর ন্যাস স্বর-ষড়্‌জ, অপন্যাসস্বর গান্ধার অথবা পঞ্চম।

এই জাতিপ্রযুক্ত গীতে এককল, দ্বিকল, এবং চতুষ্কল এই তিন প্রকার পঞ্চপাণি (ষট্‌পিতাপুত্রক) তাল প্রযুক্ত হয়। চিত্র, বৃত্তি এবং দক্ষিণ—

এই তিন মার্গেরও প্রয়োগ হয় এবং মাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা—এই তিন প্রকার গীতকে আশ্রয় করেই ষাড়জী জাতির বিকাশ হয়ে থাকে।

জাতি গানে যে তালের প্রয়োগ হয় তার নাম মার্গতাল। এই মার্গতালের ক্রিয়া দুই প্রকার—নিঃশব্দ ও সশব্দ। নিঃশব্দক্রিয়া চার রকমের—আবাপ, নিষ্ক্রাম, প্রক্ষেপ বা বিক্ষেপ, প্রবেশক। সশব্দক্রিয়াও চার রকম—ধ্রুব, শম্যা, তাল, সন্নিপাত। নিঃশব্দক্রিয়ায় হাতের নির্দেশ এবং আঙুলের সংকোচ বা প্রসারণ বোঝায়। অঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমাঙ্গুলির সংযোগে যে শব্দ করা হয় তাকে বলে ছোটিকা। এই ছোটিকা শব্দপূর্বক হস্তের পাতকে বলা হয় ধ্রুব। দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়া বলে তাল। উভয় হস্তে তালিকা উৎপাদনকে বলে সন্নিপাত। এই নিঃশব্দ এবং সশব্দ ক্রিয়াদ্বারাই মান নিরূপিত হয়।

মার্গতালে চারটি মার্গের অস্তিত্ব আছে—ধ্রুব, চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণ। এই মার্গ অর্থে কি বোঝাচ্ছে সে সম্বন্ধে সিংহভূপাল বলছেন—"মার্গবিশেষেণ মানম্", অর্থাৎ এই মার্গ-শব্দেও মানেরই একটি বিশেষত্ব বোঝাচ্ছে কেন-না মার্গচতুষ্টয় মাত্রাদ্বারা নির্দিষ্ট। ধ্রুবমার্গ একটি মাত্রা বা প্রমাণকলাযুক্ত। চিত্রমার্গে দুই মাত্রা, অর্থাৎ এটি দ্বিমাত্রিক কলাসম্পন্ন। বার্তিকমার্গে চার মাত্রা, অর্থাৎ এটি চতুর্মাত্রিক কলাসম্পন্ন। দক্ষিণমার্গে আট মাত্রা, অর্থাৎ এটি অষ্টমাত্রিক কলাযুক্ত।

এই যে চতুর্মার্গের জন্য আটটি মাত্রার কথা বলা হল এই মাত্রাগুলি সর্বত্র সশব্দ পাতে বা পাতঃকলায় প্রযোজ্য। এগুলি কদাচ আবাপাদি নিঃশব্দ কলায় প্রযুক্ত হবে না। এই মাত্রাগুলির পরিচয়:

ধ্রুবকা বা ধ্রুবা—এক্ষেত্রে 'ছোটিকা' শব্দ উৎপাদনদ্বারা এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয়।

সর্পিণী—বাম প্রদেশে গতিনির্দেশপূর্বক এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

কৃষ্ণা—দক্ষিণ প্রদেশে গতিদ্বারা এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয়।

পদ্মিনী—হস্তের অধোগতিদ্বারা এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

বিসর্জিতা—বহির্গতি নির্দেশদ্বারা এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

বিক্ষিপ্তা—হস্তকুঞ্চনদ্বারা এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

পতাকা—ঊর্ধ্বগতিনির্দেশে এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

পতিতা—করপাতনদ্বারা এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

চিত্রমার্গে ধ্রুবকা এবং পতিতা—এই দুটি মাত্রা প্রযোজ্য। বার্তিকমার্গে ধ্রুবকা, সর্পিণী, পতাকা এবং পতিতা—এই চারটি মাত্রা প্রযুক্ত হয়। দক্ষিণ মার্গে উক্ত আটটি মাত্রাই প্রযোজ্য।

যেখানে মার্গ অবলম্বনে গান গাওয়া হয় সেখানে আবাপাদি নিঃশব্দ-ক্রিয়ার ব্যবহার নেই এবং সশব্দ ধ্রুব, শম্যা, তাল এবং সন্নিপাতের প্রয়োগও সম্ভব নয়। সেখানে কেবলমাত্র মার্গাদির জন্য নির্দিষ্ট উপরোক্ত মাত্রাগুলি প্রয়োগ কর হবে।

সাধারণ অর্থে যে মাত্রা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার পরিচয় স্বতন্ত্র। পূর্বের মাত্রাগুলি মাননিরূপক। মান হচ্ছে কালের পরিমাণ। পাদগুলি সর্বাবস্থায় যে সমানভাবে গাওয়া হয় এমন নয়। গাওয়া বা আবৃত্তির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তনটি কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবৃত্তির পরিবর্তনের ফলে এই যে কালের পরিবর্তন ঘটে এইটিকেই বলে মান। এই পরিবর্তনটিকে শার্ঙ্গদেব বলেছেন বিশ্রান্তিযুক্ত ক্রিয়া। বিশ্রান্তি-শব্দের অর্থ স্থিতি কিন্তু এই স্থিতি অর্থে থেমে যাওয়া বোঝাচ্ছে না, গতির শ্লথভাব বোঝাচ্ছে। যে গতিতে একটি পাদ গাওয়া হচ্ছে তার পরবর্তী পাদটি যদি আরো ধীর গতিতে গাওয়া হয়, তাহলে পূর্ব গতি অপেক্ষা পরের গতিটি মন্থরতর হয়ে এল। এই মন্থরতায় কালের বিশ্রান্তি ঘটছে অর্থাৎ পূর্ব পাদে যে গতিতে শব্দ বা স্বরের উচ্চারণাদি ঘটছে পরবর্তী পাদে শব্দ এবং স্বরাদি তদপেক্ষা অধিকতর বিশ্রাম নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই স্থায়িত্বের দীর্ঘতাই হচ্ছে বিশ্রান্তি এবং এইটিকেই মান বলা হয়। মান হচ্ছে কালের পরিমাণ এবং লয় হচ্ছে এই পরিমাণদ্বারা নির্দিষ্ট গতি। যে কালপরিমাণে একটি ক্রিয়া চলেছে সেই ক্রিয়াতে ছেদ না ঘটিয়ে কালের পরিবর্তনদ্বারা উক্ত ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটলে সেই গতিকে বলা হয় লয়।

যাক, মাত্রার প্রসঙ্গেই আসি। পাঁচটি লঘু অক্ষর (ক, চ, ত, ট, প) উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ কাল লাগে সেই পরিমাণ বা মিতিটুকুকেই বলে মাত্রা। এই পরিমাণ অনুসারেই লঘু, গুরু এবং প্লুত—এই তিনটি মাত্রা নির্ণীত হয়।

এই মাত্রাযোগে যে তাল সম্পাদিত হয় সেটি প্রধানতঃ দুই প্রকার—চতুরস্র এবং ত্র্যস্র। এই দুটিকে যথাক্রমে চচ্চৎপুট এবং চাচপুট—এই দুই নামে অভিহিত করা হয়। এই তালদুটি তিন প্রকার—যথাক্ষর, দ্বিকল এবং চতুষ্কল।

চচ্চৎপুট বা চাচপুট—এই দুই শব্দের গুরু এবং লঘুবর্ণের সমাবেশ অনুযায়ী যে মাত্রাবিন্যাস তাকে বলে যথাক্ষর, অর্থাৎ অক্ষর অনুযায়ী মাত্রাবিন্যাস। এই 'যথাক্ষর'কে 'এককল' নামেও অভিহিত করা হয়।

"চচ্চৎপুটঃ"—এই শব্দটির প্রথম এবং দ্বিতীয় অক্ষর গুরু, তৃতীয়টি লঘু এবং চতুর্থটি গুরু। তাহলে মাত্রা বিন্যাস হল এই রকম—s s। s ; শেষের অক্ষরটি প্লুত হবে শাস্ত্রের এইরকম নির্দেশ আছে। অতএব যথাক্ষর বা এককল চচ্চৎপুট সবশুদ্ধ গুরু চতুর্মাত্রিক হবে—s s s s।

s = গুরু

। = লঘু।

এইভাবে 'চাচপুটঃ' শব্দের মাত্রাবিন্যাস হল s।। s—এই রকম। এটি এককল চাচপুট। যেহেতু মার্গতালে লঘুর অস্তিত্ব নেই সেহেতু এটিকে দেখাতে হবে—s s s এইভাবে।

দ্বিকল চচ্চৎপুটের বিন্যাস এককলের দ্বিগুণ। এটি এই রকম :—

s s
s s
s s
s s

দ্বিকল চাচপুট :—

s s
s s
s s

চতুষ্কল দ্বিকলের দ্বিগুণ :

s s s s
s s s s
s s s s
s s s s

—এটি চতুষ্কল চচ্চৎপুট।

s s s s
s s s s
s s s s

—এটি চতুষ্কল চাচপুট।

ষট্‌পিতাপুত্রক বা পঞ্চপাণি অথবা উত্তর নামক আর-একটি মার্গতালের অস্তিত্ব আছে। এটি এ্যস্রজাতীয়।

ষট্‌পিতাপুত্রক তালের যথাক্ষরবিন্যাস —

S । S S । S
ষট্‌ পি তা পু ত্র কঃ

সিংহভূপাল বলেছেন যে, এর আদি এবং অন্ত্যবর্ণের প্লুতত্ব ঘটবে, অর্থাৎ দশমাত্রিকা যথাক্ষর দ্বাদশমাত্রিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দ্বিকল ষট্‌পিতাপুত্রক :—

S S
S S
S S
S S
S S
S S

চতুষ্কল ষট্‌পিতাপুত্রক :—

S S S S
S S S S
S S S S
S S S S
S S S S
S S S S

আরো দুটি মার্গতাল আছে যাদের নাম উদ্‌ঘট্ট এবং সম্পক্কেষ্টাক। এই প্রসঙ্গে এদের উল্লেখ হয় নি বলে এদের বিবরণ দেওয়া হল না।

মার্গসঙ্গীত যিনি গাইবেন তাঁর একজন অপর সহায় থাকা আবশ্যক। এই সহায়টি গান্ধর্ব এবং মার্গসঙ্গীতে কুশল হবেন। কল্লিনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে জাতি, গ্রামরাগ এবং ষড়্‌বিধ রাগ গান্ধর্ব-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মার্গ অর্থে চিত্র, বার্তিক, এবং দক্ষিণ মার্গ বোঝায়। যদি তাই হয় তাহলে গান্ধর্বও মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্তই বলতে হবে কেন-না জাতি এবং গ্রাম-রাগাদিও চিত্রাদি মার্গ অবলম্বনে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কল্লিনাথ অবশ্য সমগ্র রাগসঙ্গীতকেই গান্ধর্ব হিসাবে ধরেছেন এবং গান্ধর্বকেও মার্গসঙ্গীত বলেই অভিহিত করেছেন। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মার্গভেদে অর্থাৎ চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণ মার্গাদির ভেদ অনুসারে লয়ের ভেদ হয়। চিত্রমার্গে দ্রুত লয়, বার্তিকে মধ্য লয় এবং দক্ষিণে বিলম্বিত লয় প্রযুক্ত হয়।

ষাড়্জী জাতির প্রস্তার একটি গীতসহযোগে দেখান হল। এই ধরনের গানকে বলা হত ব্রহ্মপদ।

তং ভবললাটনয়নাম্বুজাধিকং
নগসুনুপ্রণয়কেলি সমুদ্ভবং
সরসকৃততিলকপঙ্কানুলেপনং।
প্রণমামি কামদেহেন্ধনানলং॥

শার্ঙ্গদেব বলছেন এর সঙ্গে বরাটী রাগের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই গানটিতে ষড়্জ ন্যাস, গান্ধার, পঞ্চম অপন্যাস। গানটিতে বারটি চরণ আছে এবং প্রতিচরণে আটটি লঘু কলা বর্তমান। কোন কোন গ্রন্থে আটটি গুরু কলার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মতটি ভ্রমাত্মক বলে মনে হয় কেন না এক একটি চরণে আটটি গুরু মাত্রা থাকলে এই গীতটি পঞ্চপাণি বা ষট্‌পিতপুত্রক তালে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। চতুষ্কল পঞ্চপাণির প্রতিপাদে চারটি করে গুরু মাত্রার অস্তিত্ব আছে। এই চারটি গুরুকে ভেঙে আটটি লঘুতে পরিণত করে গাইলেই এটি মার্গসম্মত এবং তালসম্মত হয়। কেন এটিকে আটটি লঘুতে পরিণত করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই যে এটি দক্ষিণ মার্গে গাইতে হবে। দক্ষিণ মার্গে আটটি মাত্রার ব্যবহার হয়—এটি পূর্বেই বলা হয়েছে। কল্লিনাথও এই মতেরই সমর্থন করেছেন—"অত্র লঘুশব্দেন পঞ্চলঘ্বক্ষরোচ্চরমিতঃ কালো বিবক্ষ্যতে। তাদৃশা অষ্টৌ লঘবো যস্যাঃ কলায়াঃ সা অষ্টলঘুঃ। এতেনাত্র কলা দক্ষিণমার্গাশ্রিতেতি গম্যতে। তথা চ বক্ষতি—'যোহস্তাস্মাভিঃ কলাসংখ্যা সা দক্ষিণপথে স্থিতা'—ইতি। অতোঽত্র চতুষ্কলস্য পঞ্চপাণের্দ্বিরাবৃত্তিরবগন্তব্যা। যদা তু বৃত্তিমার্গাশ্রয়ণেন চতুর্বিংশতিঃ কলাস্তদা দ্বিকলপঞ্চপাণেশ্চতুরাবৃত্তয়ঃ। যদা পুনশ্চিত্রমার্গাশ্রয়ণেনাষ্টচত্বারিংশৎকলাস্তদা যথাক্ষরপঞ্চপাণেরষ্টাবৃত্তয়ঃ। এবম্ তালান্তরমপ্যূহ্যম্।"

এর অর্থ—এইখানে লঘু-শব্দে পঞ্চলঘু অক্ষরের উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে সেই পরিমাণ কাল বোঝাচ্ছে। এইরূপ আটটি লঘু এর এক একটি কলায় (এখানে পাদ বোঝাচ্ছে) বর্তমান। এতে এই কলাটি যে দক্ষিণ মার্গে আশ্রিত সেটি বোঝাচ্ছে। গ্রন্থকার নিজেও বলছেন—আমরা

সাধারণভাবে যে কলাসংখ্যার কথা বলেছি সেটি দক্ষিণমার্গাশ্রিত। অতএব এক্ষেত্রে যে গানটি বারটি পাদে ভাগ করা হয়েছে সেটি চতুষ্কল পঞ্চপাণির দ্বিরাবৃত্তি এরকমই বুঝতে হবে। যখন বার্তিকমার্গে গাওয়া হবে তখন দ্বিকল পঞ্চপাণিতে আবৃত্তি হবে এবং এই গানটি চতুর্বিংশতি পাদে বিভক্ত হবে। আর, যখন চিত্রমার্গে গাওয়া হবে তখন যথাক্ষর রীতিতে বিন্যাস অনুসারে চতুর্বিংশতির ডবল, অর্থাৎ আটচল্লিশটি কলায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

অষ্টলঘু কলা হিসাবে এই গানটির বিন্যাস দেওয়া হল :—

	ধ্রুবকা	সর্পিণী	কৃষ্ণা	পদ্মিনী	বিসর্জিতা	বিক্ষিপ্তা	পতাকা	পতিতা
(১)	স	স	স	স	প	নধ	পা	ধনি
	তং		ভ	ব	ল	লা		ট
(২)	রি	গম	গ	গ	স	রিগ	ধস	ধ
	ন	য়	নাং		বু	জা		ধি
(৩)	রিগ		রি	গ	স	স	স	স
	কং			।			।	।
(৪)	ধ	ধা	নি	নিস	নিধ	প	স	স
	ন	গ	স্থ		সু	প্র	ণ	য়
(৫)	নি	ধ	প	ধনি	রি	গ	স	গ
	কে		লি		স	মু		দ্র
		°	° °	°				
(৬)	স	ধ	ধনি	প	স	স	স	স
	বং							
(৭)	স	স	গ	স	ম	প	ম	ম
	স	র	স	ক্ল	ত	তি	ল	ক
(৮)	স	গ	ম	ধনি	নিধ	প	গ	রিগ
	পং			কা	ম্ভ	লে	প	
(৯)	গ	গ	গ	গ	স	স	স	স
(১০)	ধ	স	রি	গরি	স	ম	ম	ম
	প্র	ণ	মা		মি	কা		ম
(১১)	ধ	নি	প	ধনি	রি	গ	রি	স
	দে		হে		ন্ধ	না	ন	
(১২)	রিগ	স	রি	গ	স	স	স	স
	লং							

এই গানটি দক্ষিণ মার্গে এইরকম ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এটি যদি বার্তিকমার্গে আচরিত হয় তাহ'লে এক-একটি পাদ এর অর্ধেক হয়ে যাবে। ব্যাপারটি কি রকম হবে সেটি দেখান গেল :—

	ধ্রুবকা	সর্পিণী	পতাকা	পতিতা
বার্তিকমার্গ	তং	০	ভ	ব
	ল	লা	০	ট

ইত্যাদি

এইভাবে কলাবিভাগ করলে গানটি বারটি চরণের স্থলে চব্বিশটি চরণে বিভক্ত হবে।

চিত্রমার্গে প্রত্যেকটি চরণ এরও অর্ধেক হয়ে যাবে :—

	ধ্রুবকা	পতিতা
চিত্রমার্গ	তং	০
	ভ	ব
	ল	লা
	০	ট

ইত্যাদি

এইভাবে কলাবিভাগ করলে গানটি বারটি চরণের স্থলে আটচল্লিশটি চরণে বিভক্ত হয়ে যাবে।

এ ছাড়া অন্যভাবেও গানটিকে বার্তিক এবং চিত্র মার্গে সাজান যেতে পারে। মূলগ্রন্থে অবশ্য এত বিন্যাস নেই, কিন্তু এই বিন্যাসটিও দেওয়া উচিত বলে মনে করি :—

	S		S		দ্বিকল ষট্‌পিতাপুত্রক
বার্তিকমার্গ	ধ্রু	সর্পি	পতা	পতি	
	তং০	ভব	ললা	০ট	S S
	নয়	নাং০	বুজা	০ধি	S S
	কং০	০০	০০	০০	S S প্রথম আবৃত্তি
	নগ	সু০	সুপ্র	ণয়	S S
	কে০	লি০	সমু	০স্তু	S S
	বং০	০০	০০	০০	S S

সর	সক্ক	তিতি	লক	s s	দ্বিতীয় আবৃত্তি
পং০	০কা	স্থূলে	প০	s s	
নং০	০০	০০	০০	s s	
প্রণ	মা০	মিকা	০ম	s s	
দে০	হে০	ন্ধনা	ন০	s s	
লং০	০০	০০	০০	s s	

s

	ধ্রু	পতি	এককল ষট্‌পিতাপুত্রক	
চিত্রমার্গ	তং০ ভব	ললা০ট	s	প্রথম আবৃত্তি
	নয় নাম	বুজা০ধি	s	
	কং০০০	০ ০ ০ ০	s	
	নগস্থং০	স্থূপ্রণয়	s	
	কে০লি০	সমূ০ন্ধ	s	
	বং০০০	০ ০ ০ ০	s	
	সরসক্ক	ততিলক	s	দ্বিতীয় আবৃত্তি
	পং০০কা	স্থূলেপ০	s	
	নং০০০	০ ০ ০ ০	s	
	প্রণমা০	মিকা০ম	s	
	দে০ হে০	ন্ধনা ন০	s	
	লং০০০	০ ০ ০ ০	s	

উদ্ধৃত স্বরলিপি থেকে বোঝা যায় যে পরবর্তী কালের প্রবন্ধসঙ্গীতে যে সুস্পষ্ট কলিবিভাগ হয়েছিল জাতিগায়নের যুগে তার পরিকল্পনা হয় নি, এমন কি রাগসঙ্গীতের আক্ষিপ্তিকাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য বর্তমান অন্তরা এবং সঞ্চারীর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা পরবর্তী কালে যেমন পরিমাণ অনুযায়ী করা হয়েছিল সে যুগে সেরকমভাবে করা হয় নি। এ ছাড়া বিস্তারের অবকাশও অল্পই ছিল এবং গানের ধরন ধারণ দেখে শিল্পীর যে খুব স্বাধীনতা ছিল এমনও মনে হয় না। সমস্ত লক্ষণ এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে স্বাধীন বিস্তারের অবকাশ প্রায় রাখা

হয় নি বললেই চলে। ওরই মধ্যে শিল্পীরা একটু আধটু কাজকর্ম অবশ্যই করতেন।

আর্ষভী—এই জাতিতে নিষাদ, ধৈবত এবং ঋষভ—এই তিনটি অংশ এবং গ্রহস্বর হয়। নিষাদ এবং গান্ধারের প্রাচুর্যহেতু কাকলীত্ব বা অন্তরত্ব ঘটবে না—স্বাভাবিক অর্থাৎ দ্বিশ্রুতিক নিষাদ এবং গান্ধারের প্রয়োগ হবে। এ ছাড়া অপর স্বরগুলির স্বাভাবিক সংগতি থাকবে। পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প থাকাই নিয়ম, অর্থাৎ পঞ্চমের লঙ্ঘন স্বীকৃত হয়েছে। ষাড়ব হলে ষড়্জ বাদ যাবে। ঔড়বত্বে ষড়্জ এবং পঞ্চম বর্জিত হবে। এতে পঞ্চমাদি মূর্ছনার প্রয়োগ হবে।

এই বর্ণনায় একটি ব্যাপারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এটি হচ্ছে ষড়্জ স্বরের বর্জন। বর্ণনায় বলা হয়েছে ষাড়বক্ষেত্রে ষড়্জ বর্জিত হবে। কিন্তু ষড়্জস্বরকে বর্জন করে কি ভাবে গাওয়া সম্ভব হত সেটা বোঝা দুঃসাধ্য।

গান্ধারী—এই জাতিতে সাধারণতঃ রে এবং ধা বর্জিত হয়। সা গা মা পা নি—এই পাঁচটি স্বর গ্রহ এবং অংশ। আর ন্যাসস্বরের সঙ্গে অংশ-স্বরের সঙ্গতি হয়। এই সঙ্গতি ছাড়াও শার্ঙ্গদেব বলছেন—ধৈবতাৎ ঋষভং ব্রজেৎ। এই কথার অর্থ কল্লিনাথ যেভাবে করেছেন তাতে বোঝা যায় যে ধা থেকে রে বা রে থেকে ধা পযন্ত মীড়ের ব্যবস্থা থাকবে। সিংহভূপাল বলছেন, ধৈবত থেকে তারসপ্তকের রে পর্যন্ত আরোহণ করা কর্তব্য। সঙ্গীত-রত্নাকরে উদাহরণস্বরূপ যে গানটির স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে তার স্বরসঙ্গতি লক্ষ্য করলে কল্লিনাথের মতই সমীচীন বলে মনে হয়। ষাড়ব হলে ঋষভের লোপ হবে এবং ঔড়ব হলে ঋষভ এবং ধৈবতের লোপ হবে। পঞ্চম অংশস্বর হলে ষাড়বত্ব ঘটবে না; আর নি-সা বা পা অংশ হলে ঔড়বত্বও ঘটবে না। ধৈবতাদিক মূর্ছনা অর্থাৎ পৌরবী মূর্ছনার প্রয়োগ হবে কেন-না গান্ধারী জাতি মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যমা—মধ্যমায় অংশস্বর ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম এবং ধৈবত। ষড়্জ এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ হয় এবং গান্ধারের প্রয়োগ অল্প। ষাড়বত্ব ঘটলে গান্ধারের লোপ হয়। ঔড়বত্বে নিষাদ এবং গান্ধারের লোপ হবে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ধ্রুবা গানের সঙ্গে এই জাতির প্রয়োগ হত। এই ধ্রুবা গানের বিস্তারিত পরিচয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যাবে। এটি সম্পূর্ণভাবে

নাট্যসঙ্গীত। মধ্যমা জাতি মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। এতে ঋষভাদিক অর্থাৎ কলোপনতা মূর্ছনায় প্রয়োগ হয়।

পঞ্চমী—এতে ঋষভ এবং পঞ্চম অংশস্বর। ষড়্জ গান্ধার, এবং মধ্যমের প্রয়োগ অল্প। ঋষভ এবং মধ্যমের সঙ্গতি ঘটে। পূর্ণত্বে গান্ধার থেকে নিষাদ পর্যন্ত আরোহণ হয়। ষাড়বত্বে গান্ধারের লোপ হয় এবং ঔড়বত্বে নিষাদ এবং গান্ধারের লোপ হয়। ঋষভ অংশস্বর হলে ঔড়বত্ব ঘটবে না। এতে ঋষভাদিক কলোপনতা মূর্ছনায় প্রয়োগ হবে।

পূর্বে বলা হয়েছে পঞ্চমী জাতিতে ষাড়বের ক্ষেত্রে অল্পতরত্ব এবং ঔড়বের ক্ষেত্রে অল্পত্ব ঘটে। এই ব্যতিক্রমটি কি ভাবে ঘটছে সেটি জানা দরকার। পঞ্চমীতে ষাড়বত্ব ঘটলে গান্ধারের লোপ হয়। সাধারণ লক্ষণ অনুসারে এই জাতিতে ষড়্জ এবং মধ্যমের প্রয়োগ অল্প। অতএব ষাড়ব অবস্থাতে সা, গা এবং মা—এই তিনটি স্বরেরই স্বল্পত্ব ঘটছে। পক্ষান্তরে, ঔড়বত্ব ঘটলে গান্ধার এবং নিষাদ—এই দুটি স্বরই বর্জিত হওয়া নিয়ম; কিন্তু নিষাদকে অপন্যাস-স্বর হিসাবে ধরা হয়েছে। অতএব নিষাদের বর্জন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তথাপি নিষাদকে যদি বর্জন করতে হয় তাহলে গান্ধারের অল্পত্বকে স্বীকার করতে হবে। গান্ধার নিষাদের সম্বাদী স্বর—এটি এর প্রধান কারণ। অতএব ঔডবের ক্ষেত্রে অল্পতরত্ব না ঘটে অল্পত্ব ঘটছে।

ধৈবতী—এতে ঋষভ এবং ধৈবত অংশস্বর। আরোহণে ষড়্জ এবং পঞ্চমের লঙ্ঘন নির্দিষ্ট হয়েছে। ষাডবত্বে পঞ্চমের লোপ এবং ঔড়বত্বে ষড়্জ এবং পঞ্চমের লোপ হয়। এতে ঋষভাদিক, অর্থাৎ ষড়্জগ্রামের অভিরুদ্গাতা মূর্ছনার প্রয়োগ হয়।

নৈষাদী—এতে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার অংশস্বর। অংশস্বর ভিন্ন অপর স্বরগুলিরও বহুল প্রয়োগ হয়। ষাড়বত্বে পঞ্চমের লোপ হয় এবং ঔড়ব হলে ষড়্জ এবং পঞ্চমের লোপ হয়। এই জাতিতেও ষড়্জ এবং পঞ্চমের লঙ্ঘন নির্দিষ্ট হয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে এর প্রয়োগ হয়।

ষড়্জ-কৌশিকী—এতে অংশস্বর হচ্ছে ষড়্জ, গান্ধার এবং পঞ্চম। ঋষভ এবং মধ্যমের প্রয়োগ অল্প। ধৈবত এবং নিষাদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক।

ষড়্জোদীচ্যবা—এতে অংশস্বর হচ্ছে ষড়্জ, মধ্যম, নিষাদ এবং ধৈবত। অংশ স্বরগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গতি হয়। এখানে একটি প্রশ্ন উঠছে।

একটি গানে একাধিক অংশস্বর হওয়া নিয়ম নয় তাহলে বিভিন্ন অংশস্বরের মধ্যে সঙ্গতি হবে কেমন করে? এর উত্তর হচ্ছে এই যে অংশস্বর এবং অপর প্রধান স্বরগুলির সঙ্গে সঙ্গতি হবে। যেমন অংশস্বর যদি ষড়্‌জ হয় তাহলে মধ্যম, নিষাদ এবং ধৈবতের সঙ্গে এর সঙ্গতি হবে। এতে মন্দ্র গান্ধারের বহুল প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং ষড়্‌জ-ঋষভের অতিবাহুল্য ঘটে। কিন্তু ষাড়বের ক্ষেত্রে ঋষভের লোপ হয় এবং ঔড়ব হলে ঋষভ-ধৈবতের লোপ হয়। ধৈবত অংশস্বর হলে ষাড়বত্ব ঘটবে না।

সঙ্গীতরত্নাকরে এর যে উদাহরণটি আছে সেটির মধ্যে বিশেষত্ব থাকাতে উদ্ধৃত করা হল :–

শৈলেশসুনুপ্রণয়প্রসঙ্গসবিলাসখেলনবিনোদম্।
অধিকমুখেন্দুনয়নং নমামি দেবাসুরেশ তব রুচিরম্॥

(১)	স	স	স	স	ম	ম	গ	গ
	শৈ				লে			
(২)	গ	ম	প	ম	গ	ম	ম	ধ
	শ		সু					নু
(৩)	স	স	ম	গ	প	প	নি	ধ
	শৈ		লে		শ	সু		নু
(৪)	ধ	নি	স	স	ধ	নি	প	ম
	প্র	ণ	য়		প্র	স		ঙ্গ
(৫)	গ	স	স	স	স	স	স	গ
	স	বি	লা		স	খে		ল
(৬)	ধ	ধ	প	ধ	প	নি	ধ	ধ
	ন	বি	নো				দং	
(৭)	স	গ	গ	গ	গ	গ	স	স
	অ		ধি		ক			
(৮)	নি	ধ	প	ধ	প	ধ	ধ	ধ
	মু		খে					ন্দু
(৯)	স	স	ম	গ	প	প	নি	ধ
	অ	ধি	ক		মুং	খে		ন্দু

		•	।	।				
(১০)	ধ	নি	স	স	ধ	নি	প	ম
	ন	ম	নং		ন	মা		মি
	•							•
(১১)	গ	স	স	স	স	স	স	গ
	দে		বা		সু	রে		শ
					।	।	।	।
(১২)'	ধ	ধ	প	ধ	ম	ম	ম	ম
	ত	ব	রু	চি	রং			

এই সব জাতিগুলি সেকালে প্রচলিত মাগধী শ্রেণীর গীতে বিন্যস্ত হত। ত্রিরাবৃত্তিপদ হচ্ছে মাগধীর বৈশিষ্ট্য; আর অর্ধ-মাগধীর বৈশিষ্ট্য হল দ্বিরাবৃত্তিপদ। এই সব গীত সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এই উদ্ধৃত গীতটি অর্ধমাগধীর পর্যায়ে পড়ে। প্রথম কলায় কেবলমাত্র 'শৈ' 'লে' এই দুটি অক্ষর যোজনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কলায় 'শ' 'সু' 'সু'— এই তিনটি অক্ষর যোজিত হয়েছে। তৃতীয় কলায় একসঙ্গে পাঁচটি অক্ষর 'শৈলেশ সুসু' যোজনা করা হল। এইভাবে দুবার আবৃত্তি ঘটল। সপ্তম কলাতেও 'অ', ধি, 'ক'—এই তিনটি অক্ষর পাওয়া যাচ্ছে। অষ্টমে পাওয়া যাচ্ছে 'মু' 'খে' 'ন্দু'—এই তিনটি। নবম কলায়—অধিক মুখেন্দু এহ ছুটি অক্ষর একসঙ্গে যোজনা করা হয়েছে। অন্য কলাগুলিতে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

ষড্‌জ-মধ্যমা—এতে সাতটি স্বরই অংশ হতে পারে—এবং পরস্পর সঙ্গতি-যুক্ত হয়। নিষাদের প্রয়োগ অল্প কিন্তু গান্ধার অংশ হলে নিষাদের অল্পত্ব হওয়া সম্ভব নয় কেন-না নিষাদ গান্ধারের সম্বাদী স্বর। আর, নিষাদ বাদী হলে তার অল্পত্বের প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। দ্বিশ্রুতিক গান্ধার এবং নিষাদ অংশস্বর হলে ষাডবত্ব বা ঔড়বত্ব ঘটবে না। অপর কোন স্বর অংশ হলেই ষাডবত্ব বা ঔড়বত্ব ঘটা সম্ভব। মাগধী, সম্ভাবিতা এবং পৃথুলা –এই তিন প্রকার গীতেই ষড়্‌জ-মধ্যমা জাতির প্রয়োগ হতে পারে। এতে মৎসরীকৃতা মূর্ছনার ব্যবহার হয়। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এই জাতির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

গান্ধারোদীচ্যবা—এতে অংশস্বর ষড্‌জ এবং মধ্যম। ষাড়ব হলে ঋষভের লোপ হয়। পূর্ণত্বে ষড়্‌জ এবং মধ্যম ছাড়া অপর পাঁচটি স্বরের অল্পত্ব ঘটে। ষাড়বে নি, ধা, পা, গা—এই স্বরগুলির অল্প প্রয়োগ হয়। ঋষভ-ধৈবতের সঙ্গতি ঘটে। এটি নাটকের চতুর্থ অঙ্কে প্রযুক্ত হয়। মূর্ছনা-পৌরবী।

রক্তগান্ধারী—এতে অংশস্বর হচ্ছে সা, গা, মা, পা এবং নি। ষড়্জের সঙ্গে গান্ধারের যে সন্নিধিমেলন ঘটে সেটি ঋষভকে অতিক্রম করে সম্পাদিত হবে। সন্নিধি এবং মেলন এই দুটি শব্দ সম্পর্কে কল্লিনাথ বলছেন যে ভিন্ন লঘুকালযুক্ত দুটি স্বরের সংযোগকে বলা হয় সন্নিধি এবং একলঘুকালযুক্ত দুটি বা তিনটি স্বরের সংযোগ (কল্লিনাথ একে "নৈরন্তর্য" বলেছেন) হচ্ছে মেলন।

পাঁচটি লঘু অক্ষরের (ক, চ, ত, ট, প) উচ্চারণ করতে যতক্ষণ সময় লাগে সেই সময়টুকুকে বলে কাল বা মাত্রা। লঘু হচ্ছে একমাত্রিক, গুরু হচ্ছে দ্বিমাত্রিক এবং প্লুত হচ্ছে ত্রিমাত্রিক। এখানে দেখা যাচ্ছে লঘুরও এক এবং ভিন্ন দুটি বিভাগ ছিল। এটি কিভাবে নির্নীত হয়েছে সে সম্বন্ধে কল্লিনাথ আর কিছু না বললেও ব্যাপারটি বোঝা দরকার। তালাধ্যায়ের টীকায় বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে সব সময়ই যে পাঁচটি লঘুস্বরের আবৃত্তির পরিমাপে লঘু মাত্রা নির্ণয় করা হত এমন নয় অনেক সময় তার কম পরিমাপেও লঘুমাত্রা নির্ধারিত হত। এক্ষেত্রে এক এবং ভিন্ন অর্থে এই বোঝাচ্ছে যে দুটি সমান পরিমাপের মাত্রাযুক্ত স্বরের সংযোগ হলে সেটি হবে মেলন; আর ভিন্ন পরিমাপের মাত্রা-যুক্ত স্বরের সংযোগ হলে সেটি হবে সন্নিধি। আবার একমাত্রিক দুটি স্বরের মাত্রিক বিভাগের বৈষম্য হলেও সেটি এক এবং ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হবে।

সিংহভূপাল এ প্রসঙ্গ তোলেন নি। তিনি কেবলমাত্র বলেছেন যে ঋষভকে অতিক্রম করে ষড়্জ এবং গান্ধারের সংগতি হবে।

রক্তগান্ধারী ষাড়ব হলে ঋষভের লোপ হয় এবং ঔড়ব হলে ঋষভ এবং ধৈবতের লোপ হয়। পঞ্চম অংশস্বর হলে ষাড়বত্ব ঘটবে না। এই জাতিতে নিষাদ এবং ধৈবতের বহুত্ব ঘটে। ষড়্জ, নিষাদ, মধ্যম এবং পঞ্চম অংশস্বর বলে পরিগণিত হলে ঔড়বত্ব ঘটবে না। এতে কলোপনতা মূর্ছনার প্রয়োগ হয়ে থাকে।

কৈশিকী—এই জাতিতে ঋষভ ছাড়া অপর ছটি স্বরই অংশ হতে পারে। নিষাদ এবং ধৈবত অংশ হলে পঞ্চম ন্যাস স্বর হয়। নিষাদ এবং ধৈবত ছাড়া অপর স্বর অংশ হলে নিষাদ এবং গান্ধার ন্যাস হয়। মতান্তরে নিষাদ এবং ধৈবত অংশ হলে নিষাদ, গান্ধার এবং পঞ্চম ন্যাস হতে পারে। ষাড়বত্বে ঋষভের লোপ হয় এবং ঔড়বত্বে ঋষভ এবং ধৈবতের লোপ হয়। ঋষভের প্রয়োগ অল্প এবং নিষাদ-পঞ্চমের বহুল প্রয়োগ হয়। অংশস্বরের মধ্যে

পরস্পর সঙ্গতি হয়। পঞ্চম অংশ হলে ষাড়বত্ব ঘটবে না এবং ধৈবত অংশস্বর হলে ঔড়বত্ব ঘটবে না।

মধ্যমোদীচ্যবা—এই জাতিতে পঞ্চম অংশস্বর। এতে সপ্তস্বরের প্রয়োগ হয় এবং কখনও ষাড়বত্ব বা ঔড়বত্ব ঘটে না। অবশিষ্ট লক্ষণ গান্ধারোদীচ্যবার মত। সৌবীরী মূর্ছনার প্রয়োগ হয়। নাট্যপ্রয়োগ চতুর্থ অঙ্ক।

কার্মারবী—এই জাতিতে নিষাদ, ঋষভ, পঞ্চম এবং ধৈবত অংশস্বর। এতে অন্তরমার্গের প্রয়োগ হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে গীতের অন্তর্ভাগে স্বরাদির বিচিত্র প্রয়োগের নাম অন্তরমার্গ। এই জাতিতে যে সব স্বর অংশ নয় সেগুলিও অন্তরমার্গত্বহেতু অংশস্বরের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। এই কারণে অংশেতর স্বরের প্রয়োগও এতে অল্প হয়। এই সব স্বরের সঙ্গে অংশস্বরের প্রভেদ কিভাবে নির্ণীত হয় সেটি বুঝিয়ে কল্লিনাথ বলছেন যে অংশস্বরগুলি সাধারণত স্থায়ীরূপে থাকবে। অন্তরমার্গে যে সব স্বরের সঞ্চারীভাবে প্রয়োগ হবে সেগুলি হচ্ছে অংশেতর স্বর। স্থায়ী এবং সঞ্চারীবর্ণের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

এই জাতিতে গান্ধারের বহুল প্রয়োগ হয়। অংশস্বরগুলির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষিত হয়। মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা। নাট্যবিনিয়োগ—পঞ্চম অঙ্ক।

গান্ধার-পঞ্চমী—এতে পঞ্চম অংশস্বর। গান্ধার এবং পঞ্চমের সঙ্গতি ঘটে। হরিণাশ্বা মূর্ছনার প্রয়োগ হয়। নাট্যবিনিয়োগ—চতুর্থ অঙ্ক।

আন্ধ্রী—এই জাতিতে গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার এবং পঞ্চম। ঋষভ-গান্ধার এবং নিষাদ-ধৈবতের সঙ্গতি হয়। অংশস্বর থেকে ক্রমান্বয়ে ন্যাসস্বর পর্যন্ত আরোহণ নিয়ম। কিভাবে এই আরোহণ করতে হবে সেটি বুঝিয়ে কল্লিনাথ বলছে এখানে নি, রে, গা, পা-র মধ্যে যখন যেটি অংশস্বর হবে আগে সেটিকে প্রথমে উচ্চারণ করে তারপরে যেগুলি অংশ নয় অথবা পর্যায়াংশস্বর সেইগুলির উচ্চারণ করে ন্যাসস্বর পর্যন্ত পৌছোতে হবে। ষড়্জস্বরের লোপে ষাড়ব হয়। সৌবীরী মূর্ছনার প্রয়োগ হয়।

নন্দয়ন্তী—এই জাতিতে পঞ্চম অংশস্বর এবং গান্ধার গ্রহস্বর। মতান্তরে পঞ্চমও গ্রহস্বর স্বীকৃত হয়। মন্দ্রঋষভের বাহুল্য ঘটে। ষাড়বে ষড়্জের লোপ হয়। হৃষ্যকা মূর্ছনার প্রয়োগ হয়। নাট্যপ্রয়োগ—প্রথম অঙ্ক।

জাতিগুলির পরিচয় প্রদান করা হল। মূল গ্রন্থে প্রত্যেকটির স্বরলিপিসহ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা মূল গ্রন্থ থেকে এই সব স্বরলিপি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র বিশেষত্ব-সম্পন্ন দু-একটি স্বরলিপি উদ্ধৃত করে দেখানো হল।

জাতিপ্রকরণের পরিসমাপ্তিতে শার্ঙ্গদেব বলছেন যে যেখানে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নি সেখানে এককল, দ্বিকল এবং চতুষ্কল—এই তিনটি কলারই ব্যবহার হতে পারে। অনুরূপভাবে চিত্র, বৃত্তি এবং দক্ষিণ—এই তিনটি মার্গ এবং মাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা—এই তিনটি গীতেরও ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ হতে পারে।

শার্ঙ্গদেব তদীয় গ্রন্থে যেসব জাতির উদাহরণ প্রদান করেছেন সেগুলি দক্ষিণ মার্গাশ্রিত। বার্তিকমার্গ আশ্রয় করলে পাদসংখ্যা দ্বিগুণ হবে এবং চিত্রমার্গে পাদসংখ্যা চতুর্গুণ হবে। এ সম্পর্কে ষাড়্জীর উদাহরণপ্রসঙ্গে আলোচন করা হয়েছে।

শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে অংশস্বরে যে রস বর্তমান সেই অনুসারেই জাতির রস নির্ণীত হবে। রত্নাকরের মতে ষড়্জ, ঋষভ—এই দুটি স্বর বীর এবং অদ্ভুত রসে, ধৈবত বীভৎস, ভয়ানকে, গান্ধার, নিষাদ করুণে এবং মধ্যম, পঞ্চম হাস্য এবং শৃঙ্গারে প্রযোজ্য।

রাগ বা রাগের অবয়ব সমূহ জাতিগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। জনক-জাতিসমূহ থেকেই জন্য রাগের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ষাড়্জী জাতিতে বরাটী রাগের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় -একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই জন্য রাগ বলতে গ্রামরাগাদি বিবিধ রাগ বোঝায় এবং এগুলির সঙ্গে জাতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্তমান। কল্লিনাথ এবিষয়ে বুঝিয়ে বলেছেন—

জন্য রাগাংশাঃ, গ্রামরাগাদয়ো দশবিধা অপি জাতীনাং সাক্ষাৎপরম্পরা বা জন্যরাগা এব তেষামাংশা অবয়বাঃ ; তথাচ বক্ষ্যতি রাগান্তরস্যাবয়বো রাগাংশঃ ইতি। রাগৈকদেশা ইত্যর্থঃ। জনকজাতিষু সাক্ষাৎপরম্পরা বা যেষাং জনিকাসু জাতিষু তজ্জ্ঞৈ রাগভেদবিভিদৃ'শ্যন্ত উদ্ভাব্যন্ত ইত্যর্থঃ।

জাতির অন্তর্ভুক্ত এই সঙ্গীতগুলি ব্রহ্মপদ নামে প্রসিদ্ধ এবং এগুলি আসলে শঙ্করস্তুতি। সামবেদের তুল্য এই সব জাতিগানে স্বর, পদ, এবং তালাদির বৈপরীত্য ঘটানো মহা অপরাধ বলে গণ্য হত।

দেবাদিদেব মহাদেব ভ্রমণে বেরিয়েছেন। যেতে যেতে গান ধরেছেন—নানারকমের জাতি গান। সেই অপূর্ব সঙ্গীতে তাঁর ললাটের চন্দ্রকলা থেকে রসক্ষরণ হতে লাগল। এ রস হচ্ছে অমৃতরস। সেই রসধারায় অভিষিক্ত হল ব্রহ্মার মস্তকশোভিত কপাল বা করোটীমালা। অমৃতসংযোগে সেই সব কঙ্কাল-কপাল সজীব হয়ে উঠল। তারাও মহাদেবের সেই মহাসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে লাগল। কপালগীতি নামক সঙ্গীতসম্বন্ধে এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি প্রচলিত।

এই অপূর্ব সঙ্গীতটি কিন্তু এ যুগে শুনলে বিরুদ্ধ ফল হতে পারে কেন-না স্থান, কাল, পাত্র সবই প'রবর্তিত হওয়ায় উক্ত মহাসঙ্গীত এখন বীভৎসরসের উদ্দীপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ষাড়্জী থেকে উৎপন্ন ষাড়্জী কপালের নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :—

ঝণ্টুং ঝণ্টুং
খট্টাঙ্গধরং
দংষ্ট্রাকরালং
তড়িৎসদৃশজিহ্বং
হৌ হৌ হৌ হৌ
হৌ হৌ হৌ হৌ
বহুরূপবদনং ঘনঘোরনাদং
হৌ হৌ হৌ হৌ
হৌ হৌ হৌ হৌ,
উঁ উঁ হাং রৌং
হৌং হৌং হৌং হৌং
নৃমুণ্ডমণ্ডিতং
হুং হুং কহ কহ হুং হুং
কৃতবিকটমুখম্
নমামি দেব ভৈরবম্॥

এইরকম আরও ছ'টি কপালের উল্লেখ আছে—আর্ষভী-কপাল, গান্ধারী

কপাল, মধ্যমা-কপাল, পঞ্চমী-কপাল, ধৈবতী-কপাল এবং নৈষাদী-কপাল। এর মধ্যে ঝণ্টুং ঝণ্টুং—এই অক্ষরগুলির বিশেষ তাৎপর্য আছে। এগুলি উপোহন নামক অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হত। এ সম্বন্ধে তলাধ্যায়ে বিশেষ আলোচনা আছে।

জাতিগানের মত এদেরও লক্ষণ দেওয়া আছে। এইসব গীতি শাস্ত্রাদিতে বড় স্থান পেলেও এগুলি সম্প্রদায় বিশেষের গীত; আর্টের দিক থেকে এদের বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয় না। বহুকাল থেকে এই গানগুলি চলে আসছিল এবং কেবল মাত্রসংস্কার বশেই এদের উল্লেখ করা হয়েছে। জাতি গানের একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। তার মধ্যে কাব্য ছিল রসও ছিল। কিন্তু, এইসব গান জাতিগানের বিকৃতি। ভাষা এবং রুচি কোন দিক দিয়েই এই সঙ্গীত উচ্চস্তরের নয়।

এই রকম আর-এক ধরণের গীতের উল্লেখ আছে তার নাম—কম্বল। উক্ত নামধারী এক নাগ না কি এই সঙ্গীতের প্রচার করেন। এই গীতি পঞ্চমা জাতি থেকে সমুৎপন্ন।

অতঃপর শার্ঙ্গদেব গীতের সংজ্ঞানির্ণয় করেছেন। বিবিধ বর্ণদ্বারা অলঙ্কৃত, পদ এবং লয় সমন্বিত যে গানক্রিয়া তার নাম গীত। পূর্বপ্রচলিত গীতের মধ্যে প্রধান ছিল চারটি—মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা এবং পৃথুলা।

মাগধী গীতি কি রকম ছিল সেটি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক গানটির পদ হচ্ছে—দেবং রুদ্রং বন্দে—মাগধী রীতিতে এর বিন্যাস হবে এই রকম—

মা	গা	মা	ধা	বিলম্বিত লয়
দে		বং		
ধনি	ধনি	সনি	ধা	মধ্যলয়
দে	বং	রু	দ্রং	
রিগ	রিগ	মগ	রিস	দ্রুত লয়
দেবং	রুদ্রং	ব	ন্দে	

উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র চতুর্মাত্রিক কলার গানটি দেখান হয়েছে।' প্রথম কলাটি বিলম্বিত লয়ে গেয় এবং এতে কেবলমাত্র 'দেবং' এই দুটি অক্ষর রয়েছে—এক একটি অক্ষরে দুটি মাত্রা। দ্বিতীয় কলাটি মধ্যলয়ে গাইতে হবে। এখানে পূর্বের "দেবং" এই শব্দটির সঙ্গে পদের পরবর্তী 'রুদ্রং' এই

দুটি অক্ষরও যোজনা করা হল। এক একটি অক্ষর এক একটি মাত্রা অধিকার করেছে। তৃতীয় কলাটি দ্রুত লয়ে গাইতে হবে এবং এই কলায় পদের শেষ অংশ 'বন্দে' এই দুটি অক্ষরও যুক্ত হচ্ছে। তৃতীয় কলায় 'দেবং' 'রুদ্রং' এই দুটি শব্দ এক এক মাত্রা অধিকার করছে। বাকি 'বন্দে' এই দুটি অক্ষর এক একটি মাত্রাবিশিষ্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটি কলায় 'দেবং' এই শব্দটির তিন বার আবৃত্তি ঘটছে। এই ত্রিরাবৃত্তি পদটিই হচ্ছে মাগধী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

আমাদের বর্তমান সঙ্গীতেও যে এক একটি শব্দ বা অক্ষরের বারম্বার আবৃত্তি হয় তার ঐতিহ্যও এই গীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে। বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্য ঠিক এই স্বরলিপিযোগেই বর্তমান পদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছি। ধরা যাক পদটি—তুমি কত দূরে।

মা	গা	মা	ধা
তু	°	মি	°
ধনা	ধনা	র্সনা	ধা
তু°	মি°	ক°	ত
রগা	রগা	মগা	রসা
তুমি	কত	দূ°	রে°

এক্ষেত্রেও 'তুমি' শব্দটি তিন বার আবৃত্তি করা হচ্ছে। পূর্বযুগ হলে এটিকেই বলা হত মাগধী পদ্ধতি।

এর পর অর্ধ-মাগধী। এর উদাহরণ—

মা	রী	গা	সা
দে		বং	
সা	সা	ধা	নী
বং	রু	দ্রং	
পা	ধা	পা	মা
দ্রং	বন্	দে	

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ 'দেবং' শব্দটির আবৃত্তি ঘটছে না কেবলমাত্র বং—এই অক্ষরটি বা 'রুদ্র' শব্দের শুধু দ্র অক্ষরটির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এর আর একটি প্রকারভেদও পরিকল্পিত হয়েছে।

মা	মা	মা	মা
দে		বং	
ধা	সা	ধা	নী
দে	বং	রু	দ্রং
পা	নিধা	মা	মা
রু	দ্রং	ব	ন্দে

দেবং এবং রুদ্রং শব্দের দ্বিরাবৃত্তিই এর গীতের বৈশিষ্ট্য। মাগধীর শেষ কলায় 'দেবং রুদ্রং বন্দে' এসেছে, কিন্তু অর্ধ-মাগধীর শেষ কলায় 'রুদ্রং বন্দে' কথাটি পাওয়া যাচ্ছে।

এই যে একটি অক্ষর বা শব্দকে খণ্ড করে গাওয়া হচ্ছে এবং এতে অর্থবোধ নষ্ট হচ্ছে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে এতে দোষ নেই কেননা গানক্রিয়ার অর্থ নিয়ে এত সূক্ষ্ম বিচার করা হয় না। গানে বিস্তারের এই স্বাধীনতা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সামবেদের নজির দেখিয়ে বলা হয়েছে যে—সামবেদে গীতপ্রধানাবৃত্তিষু অর্থা নাদ্রিয়স্তে। এমন কি বেদশব্দ পর্যন্ত আবৃত্তি পরম্পরায় গীত হয়ে থাকে। সামবেদ প্রভৃতিতে যখন গানের আবেগে পুনরুক্তি বা অর্ধোক্তিকে দোষাবহ বলে মনে করা হয় না তখন এক্ষেত্রেও পদখণ্ডন বা অর্থভঙ্গে দোষ নেই।

এই স্বাধীনতা অবশ্য হিসেব করে পালন করা হয় নি কেননা পরবর্তীকালে গায়কেরা নিজের খুশিতে শব্দগুলিকে ভেঙে অতিশয় বিকৃত করে গেয়ে এসেছেন। বর্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এই দোষটি ভয়াবহভাবে লক্ষিত হয়।

ইতিপূর্বে জাতিগান ষড্জোদীচ্যবার উদাহরণে অর্ধ-মাগধীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সম্ভাবিতা নামক এক শ্রেণীর গীত ছিল। এতে গুরু স্বরের আধিক্য ছিল এবং পদ হত সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত বলতে এই বোঝাচ্ছে যে প্রত্যেকটি কলায় অক্ষর সংখ্যা কম যোজনা করা হত। এক্ষেত্রে গানটি বিলম্বিত লয়েই গাওয়া হত এবং কলা অনুসারে লয়ের পরিবর্তন করা হত না।

ধা	মা	মা	রিগা
ভ		ক্ত্যা	
রী	গা	সা	সা
দে		বং	
নী	ধা	সা	নী
রু		দ্রং	
ধা	নী	মা	মা
ব		ন্দে	

মাগধী এবং অর্ধ-মাগধী-তে মধ্য এবং তৃতীয় কলায় যেমন অক্ষরসংখ্যা প্রথম কলার চেয়ে অধিক হয়েছে সম্ভাবিতায় সেটি হয় নি। এখানে প্রত্যেকটি কলায় মাত্র ছুটি অক্ষর এবং তাও একটি স্বর বাদ দিয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কারণে সংক্ষেপিত পদ বলা হয়েছে।

পৃথুলা শ্রেণীর গীতে লঘুস্বরের প্রাধান্য ছিল।

মা	গা	রী	গা
সু	র	ন	ত
সা	ধনি	ধা	ধা
হ	র	প	দ
ধা	সা	ধা	নী
যু	গ	লং	
পা	নিধপ	মা	মা
প্র	ণ	ম	ত

মতান্তরে এই গীতটি অন্যভাবেও গাওয়া হত। শার্ঙ্গদেব অপর উদাহরণ দেন নি, এটি সিংহভূপাল তাঁর টীকায় দিয়েছেন। উক্ত মতে গানটি গাইলে কলা এবং পদবিভাগ এইরকম হবে :—

সুরনত	হরপদ	যুগলং	প্রণমত
হরপদ	হরপদ	যুগলং	যুগলং
সুরনত	হরপদ	যুগলং	প্রণমত

পূর্বোক্ত সম্ভাবিতা নামক গীতেরও সিংহভূপাল এইরকম বিন্যাস দিয়েছেন—

ভক্ত্যা দেবং রুদ্রং বন্দে
দেবং দেবং রুদ্রং রুদ্রং
ভক্ত্যা দেবং রুদ্রং বন্দে ।

মাগধী এবং অর্ধ-মাগধী গীতি চিত্র এবং দক্ষিণ মার্গে, চচ্চৎপুট অথবা চাচপুট তালে গাওয়া হত। সম্ভাবিতা চচ্চৎপুট তালে বার্তিক মার্গে এবং পৃথুলা দক্ষিণ মার্গে গাওয়াই ছিল সাধারণ নিয়ম।

রাগের অবয়বতত্ত্ব

রাগের অবয়বপ্রতিষ্ঠা বা সংগঠনের রূপবন্ধকে বলে স্থায়। গায়ন-পদ্ধতির বিভিন্ন কলাকৌশলও স্থায়েরই অন্তর্ভুক্ত। স্থায় দুই প্রকার—অসঙ্কীর্ণ আর সঙ্কীর্ণ।

অসঙ্কীর্ণ স্থায়ের প্রকারভেদ হচ্ছে—শব্দসম্বন্ধীয়, ঢালসম্বন্ধীয়, লবনীসম্বন্ধীয়, বহণিসম্বন্ধীয়, বাদ্যসম্বন্ধীয়, যন্ত্রসম্বন্ধীয়, ছায়াসম্বন্ধীয়, স্বরলঙ্ঘিত, প্রেরিত এবং তীক্ষ্ণ।

রাগসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরের বহু প্রকারভেদ পরিকল্পিত হয়েছে; যথা—ভজনসম্বন্ধীয়, স্থাপনাসম্বন্ধীয়, গতিসম্বন্ধীয়, নাদসম্বন্ধীয়, ধ্বনিসম্বন্ধীয়, ছবিসম্বন্ধীয়, রক্তিসম্বন্ধীয়, দ্রুতসম্বন্ধীয়, ভৃতসম্বন্ধীয়, অংশসম্বন্ধীয়, অবধান-সম্বন্ধীয়, অপস্থানসম্বন্ধীয়, নিকৃতিসম্বন্ধীয়, করুণাসম্বন্ধীয়, বিবিধত্বভঙ্গিসম্বন্ধীয়, গাত্রসম্বন্ধীয়, উপশমসম্বন্ধীয়, কাণ্ডারণাসম্বন্ধীয়, নির্জবনসম্বন্ধীয়, গাঢ়সম্বন্ধীয়, ললিতগাঢ়সম্বন্ধীয়, ললিতসম্বন্ধীয়, লুলিতসম্বন্ধীয়, সমসম্বন্ধীয়, কোমলসম্বন্ধীয়, প্রস্তৃতসম্বন্ধীয়, স্নিগ্ধসম্বন্ধীয়, চোক্ষসম্বন্ধীয়, উচিতসম্বন্ধীয়, সুদেশিকসম্বন্ধীয়, অপেক্ষিতসম্বন্ধীয় এবং ঘোষসম্বন্ধীয়। এগুলি হচ্ছে সঙ্কীর্ণ স্থায়।

এছাড়া আরও বহু প্রকার অসঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কীর্ণ স্থায়ের উল্লেখ আছে। এগুলি পূর্বোক্তের মত প্রধান নয়। এই অসঙ্কীর্ণস্থায়গুলি হচ্ছে—বহু, অক্ষর, আড়ম্বর, উল্লসিত, অঙ্গিত, প্রলম্বিত, অবস্খলিত, ত্রোটিত, সম্প্রবিষ্টক, উৎপ্রবিষ্ট, নিঃসরণ, ভ্রামিত, দীর্ঘকম্পিত, প্রতিগ্রাহোল্লাসিত, অলম্ববিলম্বক, ত্রোটিতপ্রতীষ্ট, প্রস্তৃতাকুঞ্চিত, স্থির, স্থায়ুক, ক্ষিপ্ত এবং সূক্ষ্মান্ত।

সঙ্কীর্ণ অপ্রসিদ্ধ স্থায় হচ্ছে—প্রকৃতিস্থ, কলা, আক্রমণ, ঘটনা, সুখ, চালি, জীবস্বর, বেদধ্বনি, ঘন, শিথিল, অবঘট, প্লুত, রাগেষ্ট, অপস্বরাভাস, বদ্ধ, কলরব, ছান্দ, সুকরাভাস, সংহিত, লঘু, অন্তর, বক্র, দীপ্তপ্রসন্ন, প্রসন্নমৃদু, গুরু, হ্রস্ব, শিথিল গাঢ়, দীর্ঘ, অসাধারণ, সাধারণ, নিরাধার, দুষ্করাভাস, মিশ্র।

এখন এইসব প্রকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাক। অসঙ্কীর্ণ স্থায় থেকে শুরু করি।

শব্দসম্বন্ধীয়—সঙ্গীতে একটি কলি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত অথবা যে-কোন

একটি কাজ আর-একটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। এক স্বরে আমরা ছাড়ছি অপর স্বরে আবার ধরছি। এই ছাড়া এবং ধরার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে যাতে রাগের সঙ্গতি রক্ষা হয়। পূর্বে গীত স্থায়টি যে ধ্বনি বা স্বরে এসে শেষ হয়েছে সঙ্গীতের চক্রবালরীতি অনুযায়ী উত্তর স্থায় সেখান থেকে শুরু হলে তাকে বলা হয় শব্দস্থায়।

ঢাল—মুক্তাফল যেমন ঝকমক করে ওঠে তেমনি শ্রুতির ক্ষিপ্রত্বে যে ধ্বনির হঠাৎ আলোড়ন জাগে তাকে বলে ঢাল। এ শব্দটি কোথা থেকে এসেছে বলা শক্ত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ঢাল-শব্দের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। সঙ্গীতরত্নাকর ঢালসম্বন্ধীয় সংজ্ঞানির্ণয় উপলক্ষ্যে বলছেন -ঢালো মুক্তাফলস্যেব চলনং লুণ্ঠনাত্মকং।

লবনী—ঢালস্থায়ে সুকুমার এবং অতিকোমল উচ্চারণযুক্ত অংশকে লবনী বলা হয়।

বহনী—কম্পনযুক্ত আরোহণ এবং অবরোহণকে বহনী বলা হয়। আবার সঞ্চারীবর্ণে স্থিরকম্পন হলেও তাকে বহনীস্থায় বলা হয়। এটি আজকালকার গমকতানের অনুরূপ।

বহনী দু রকম—গীতসম্বন্ধীয় এবং আলপ্তিসম্বন্ধীয়। এছাড়া আরও দুটি প্রকারভেদ আছে - স্থিরা, বেগাঢ্যা। এর পরেও তিনটি প্রকার পরিকল্পিত হয়েছে—হৃত্যা, কণ্ঠা, শির।

হৃদয়োদ্ভব বহনী দু রকমের—খুত্তা এবং উৎফুল্ল।

যে স্বরসঞ্চালন চাপা ধরণের (অন্তর্বিশন্তী ইব) তাকে বলে খুত্তা। এটা অনেকটা খুৎ-খুৎ-খুৎ—এই ধরণের গমকের কাজের মত একটা ব্যাপার বলে মনে হয়। আর যে সুর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তাকে উৎফুল্ল বলে।

আসলে বহনী কথাটার মানে হচ্ছে সুরের সেই গতি যা রাগকে বহন করে চলেছে। বহনী ব্যাপারটা গমকের সঙ্গে জড়িত।

বাদ্যস্থায়, যন্ত্রস্থায় –বীণা প্রভৃতি যন্ত্রসহযোগে যে সব বাহুল্য প্রয়োগ দেখানো হয় তাকে বলে বাদ্যস্থায় বা যন্ত্রস্থায়। আজকাল গানের আসরে ঠুংরি প্রভৃতি গানে শিল্পীরা একটা কাজের উপক্রম করলে অনেক সময় সারেঙ্গি বাদক সেটিকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলেন। যন্ত্রসহযোগে রাগের এই যে পূর্ণতাসাধন এটি যন্ত্রস্থায়। অনুরূপভাবে তবলায় বা খোলে অনেক

সময় জবাব দেওয়া হয় বা গানের ফাঁকে নানা ধরনের বোল তুলে গানকে জমিয়ে রাখা হয়। এটি হচ্ছে বাদ্যস্থায়।

ছায়াস্থায় (কাকু স্থায়)—ছায়াকে কাকুও বলা হয়। কাকু হচ্ছে ধ্বনির বিকার। এ বিষয়ে বাগ্‌গেয়কার-প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, অতএব এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। রাগসঙ্গীতে ছায়াস্থায় ছয় প্রকার—স্বরকাকু, রাগকাকু, অন্যরাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু এবং যন্ত্রকাকু।

স্বরকাকু—নির্দিষ্ট স্বরের যে শ্রুতি তার কিঞ্চিৎ ন্যূনত্ব বা অধিকত্ব হলে তাকে স্বরকাকু বলে।

রাগকাকু—মূল যে রাগে গান গাওয়া হচ্ছে সেই রাগের স্পষ্ট অভিব্যক্তি না হয়ে যদি তার ছায়াপাত ঘটছে বলে মনে হয় তাহলে তাকে রাগকাকু বলা হয়।

অন্যরাগকাকু—যে রাগে গান গাওয়া হচ্ছে সেই রাগের সমশ্রেণীভুক্ত অপর রাগের ছায়াপাত যদি উক্ত রাগে ঘটে তবে সেটি হবে অন্যরাগকাকু। সাদৃশ্য হেতু এই ছায়াপাতের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

দেশকাকু -প্রতি দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী সঙ্গীতে যে ছায়াপাত হয় তাকে বলা হয় দেশকাকু। যেমন বাঙালী যখন খেয়াল বা টপ্পা গান করেন তখন সেটি হিন্দীগান হলেও তাতে বাংলার একটা প্রকৃতিগত ছায়াপাত ঘটে। এইটি হচ্ছে দেশকাকু। আমরা যাকে ঘরোয়ানা বলি সেটাও বলতে গেলে দেশকাকু।

ক্ষেত্রকাকু—ক্ষেত্র মানে হচ্ছে দেহ। প্রতি শিল্পীর যে গাইবার একটা নিজস্ব ঢং আছে সেটি তার একটি দৈহিক প্রভাব অনুসারে রচিত হয়। একে বলে ক্ষেত্রকাকু।

যন্ত্রকাকু—যান্ত্রিক ছায়াপাতকে যন্ত্রকাকু বলে। যন্ত্রস্থায় আর যন্ত্রকাকু কিন্তু এক জিনিস নয়। যন্ত্রস্থায় বলতে যন্ত্রদ্বারা রাগের প্রসার বোঝায় আর যন্ত্রকাকু বলতে সঙ্গীতের ওপর যন্ত্রের কোন একটি বিশেষ প্রভাবকে বোঝায়।

স্বরলঙ্ঘিত স্থায়– স্বরের লঙ্ঘনদ্বারা রাগের যে বৈচিত্র্য সম্পন্ন হয় তাকে স্বরলঙ্ঘিত স্থায় বলে। যেমন ছুটের কাজগুলি। ধরা যাক, বেহাগের অবরোহণে নি, পা, গা, সা—এই চারটে স্বর গেয়ে একটি বৈচিত্র্য সম্পাদন

করা গেল। এখানে একটি করে স্বর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে মধ্যসপ্তকের নিষাদ থেকে কড়ি মধ্যমে অবতরণ করলে দুটি স্বরকে লঙ্ঘন করা হল। এই জিনিসটাই হচ্ছে স্বরলঙ্ঘিত স্থায়।

প্রেরিত স্থায়—এটিও স্বরলঙ্ঘিতের অনুরূপ। খাদ থেকে তির্যক্ গতিতে ঊর্ধ্বে স্বর উৎক্ষিপ্ত হলে তাকে বলে প্রেরিত স্থায়।

তীক্ষ্ণ স্থায়—তারসপ্তকে পূর্ণশ্রুতি হবার পরও সেই স্বর কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ প্রতীয়মান হলে তাকে তীক্ষ্ণ বলা হয়, অর্থাৎ স্বরটা ঠিক শ্রুতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না অথচ কানে যেন কিছু চড়া ঠেকছে। গাইবার ভঙ্গিতে এটি হয়। এটিকে কিন্তু কাকুর পর্যায়ে ফেলা উচিত ছিল কেননা কাকুদ্বারাই এটি ঘটতে পারে। আসলে তীক্ষ্ণ স্থায় এবং স্বরকাকুর মধ্যে প্রভেদ নেই।

এই গেল দশটি অসঙ্কীর্ণ স্থায়। এইবার অপর ভেদগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

ভজন—রঞ্জকত্বগুণ সমধিক থাকলে তাকে ভজন বলা হয়। রত্নাকর ভজন সম্বন্ধে বলছেন—বাগস্যাতিশয়াধানং প্রযত্নাৎ ভজনং মতম্। সিংহ-ভূপাল এখানে রাগের রঞ্জকত্ব অর্থ করেছেন। এই অর্থই সঙ্গত। রাগের অতিশয়াধান অর্থ এ নয় যে রাগের ব্যবহার অত্যন্ত গোঁড়াভাবে করতে হবে।

ভজন অর্থে আজকাল কেবলমাত্র ভক্তিরসাশ্রিত গান বোঝায়। এই ধরণের গানগুলির প্রধান গুণ রঞ্জকত্ব। মধ্যযুগে প্রচলিত মধুর এবং সুললিত গান-গুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক রচনার প্রাধান্য ছিল বলেই বোধহয় ভক্তি রসাশ্রিত এই শ্রেণীয় গান ভজন বলেই অভিহিত হয়েছে। রত্নাকরের সংজ্ঞা থেকে মনে হয় মধ্যযুগে মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন গানই ভজন বলে পরিচিত ছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গানগুলি স্বতই মাধুর্যসহকারে রচিত হত এবং এইভাবে এই বিশেষ ধারাটি পরে ভজন আখ্যায় পরিচিত হয়েছে।

স্থাপনা—রাগের গতি নিশ্চল হবামাত্র তাকে উদ্দীপিত করে আবার স্থাপনা করাকে বলে স্থাপনা স্থায়।

গতি—মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সবিলাস গতি হচ্ছে গতি স্থায়।

নাদ—স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্যে স্থূলীকৃত অতি মধুর স্বরকে বলা হয় নাদস্থায়। নাদ-শব্দের একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে নন্দন করে বলেই এই শব্দটি নাদ নামে অভিহিত।

ধ্বনি—স্বরের দীর্ঘতর প্রয়োগ হলে তাকে ধ্বনি স্থায় বলা হয়। সিংহ-ভূপাল বলেছেন এটি গমকের সঙ্গে যুক্ত।

ছবি—এই শব্দটির পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুকুমার কান্তিযুক্ত উক্ত লক্ষণসমন্বিত স্থায়কে ছবি বলা হয়।

রক্তি—অনুরাগসঞ্চারী স্বরকে রক্তিযুক্ত বলা হয়। যে স্থায়ে রঞ্জকত্বের আধিক্য তাকে রক্তি স্থায় বলে।

দ্রুত—স্বরের বেগে উচ্চারণকে দ্রুত বলা হয়।

ভৃত—ধ্বনির ভরণ বা পূর্ণতা হেতু উচ্চারণের ঘনত্বকে ভৃত বলা হয়।

অংশ—একটি রাগে অপর রাগের অবয়ব সন্নিবিষ্ট হলে তাকে অংশ বলা হয়, অর্থাৎ মূলরাগে অন্য রাগের অংশ প্রক্ষিপ্ত হলে সেটি হবে অংশ স্থায়। ইতিপূর্বে অন্যরাগ কাকুর আলোচনা উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে প্রকৃত রাগে সাদৃশ্য হেতু সমশ্রেণীর অপর রাগের ছায়াপাত ঘটলে তাকে অন্যরাগ কাকু বলা হয়। এই অন্যরাগ কাকুর সঙ্গে তাহলে অংশের তফাৎ কি? তফাৎ হচ্ছে এই যে এক্ষেত্রে প্রকৃত রাগে যে অপর রাগের অবয়ব সন্নিবিষ্ট হচ্ছে সেটি যে সব সময় প্রকৃত রাগের সমশ্রেণীয় হবে এমন নয়, বৈচিত্র্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য ভিন্ন শ্রেণীর রাগেরও প্রক্ষেপ করা হয়।

অংশ সাত রকমের—কারণাংশ, কার্যাংশ, সজাতীয়াংশ, সদৃশাংশ, বিসদৃশাংশ, মধ্যস্থাংশ, অংশাংশ।

কারণাংশ—কার্যভূত রাগে কারণভূত রাগের যে অংশ প্রক্ষিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কারণাংশ। যেমন, রামকৃতিতে কোলাহলের অংশ। শার্ঙ্গদেব এটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। বর্তমান ঠাট অনুসারে কেদারা যদি কার্যভূত রাগ হয় তার সঙ্গে কারণভূত রাগ কল্যাণের মিশ্রণ হলে সেটা হবে কারণাংশ।

কার্যাংশ—এটি হচ্ছে কারণাংশের উল্টো অর্থাৎ কারণভূত রাগে কার্যভূত রাগের প্রক্ষেপ। শার্ঙ্গদেব উদাহরণস্বরূপ ভৈরবীজনক ভৈরব রাগে ভৈরবীর অংশের উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে কারণভূত রাগ কল্যাণে যদি কেদারার ছায়াপাত ঘটে তবে সেটি হবে কার্যাংশ।

সজাতীয়াংশ—কার্য কারণ সম্বন্ধ ছাড়াও সমজাতীয় রাগের মিশ্রণ ঘটলে সেটি হবে সজাতীয়াংশ। প্রাচীন যুগের সঙ্গীতের উল্লেখ করে সিংহভূপাল

বলেছেন যে ষাড়্জী প্রভৃতি জাতি থেকে সমুৎপন্ন সজাতীয় রাগের মিশ্রণ হচ্ছে সজাতীয়াংশ।

সদৃশাংশ—সদৃশাংশ হচ্ছে সজাতীয়াংশের আর একটু ঘনিষ্ঠ রূপ। বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত রাগের মিশ্রণ হচ্ছে সদৃশাংশ। যেমন, ভৈরবীতে আশাবরীর মিশ্রণ হলে তাকে বলা যায় সদৃশাংশ।

বিসদৃশাংশ—যে রাগে গান গাওয়া হচ্ছে তাতে বিসদৃশ একটি রাগের কোন অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তাহলে তাকে বলে বিসদৃশাংশ। আজকাল প্রায়ই এটা ঘটছে আগেও ঘটত।

মধ্যস্থাংশ—খুব সাদৃশ্য নেই অথবা বৈসাদৃশ্য নেই এই রকম রাগমিশ্রণকে বলা হয় মধ্যস্থাংশ, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশটি মধ্যম শ্রেণীর।

অংশাংশ—রত্নাকর বলছেন, অংশে অংশান্তর সঞ্চারাৎ অংশাংশ ইতি কীর্তিতঃ। যতদূর আন্দাজ করতে পারা যায় তাতে মনে হয় রাগাদির আংশিক মিশ্রণ হলে তাকে অংশাংশ আখ্যা দেওয়া যায়।

অবধান—যে স্থায়টি আয়াস বা অবধানতার সঙ্গে করা যায় সেইটি হচ্ছে অবধান স্থায়।

অপস্থান—বিনা আয়াসেই যে কাজটি ধ্বনির প্রাচুর্যে যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয়—সেই ক্রিয়াকে বলা হয় অপস্থান স্থায়।

নিকৃতি—নিকৃতি-শব্দের আভিধানিক অর্থ অপকা' বা দৈন্য। স্বরের দৈন্য অথবা ন্যূনত্বহেতু রাগস্থাপনায় যে দৈন্য সূচিত হয় তাকে নিকৃতি স্থায় বলা উচিত। শার্ঙ্গদেব বলছেন নিকৃতি-শব্দের সাধারণ অর্থ থেকেই এই স্থায়টির স্বরূপ স্পষ্ট বোঝা যাবে। সিংহভূপাল এই আখ্যার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—যে স্থায়েষু নিকৃতিরন্যূনাধিকত্বং তে নিকৃতি-সম্বন্ধিনঃ। নিকৃতি-শব্দের অর্থ তিনি করেছেন অন্যূন বা অধিকত্ব। অথচ, নিকৃতির মানে ঠিক তার উল্টো—দৈন্য বা অল্পত্ব। তাঁর নিজের হয়ত এবিষয়ে দ্বিধা ছিল বলে তিনি পার্শ্বদেব থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করে নিজ মতকে সমর্থন করেছেন। পার্শ্বদেবও বলছেন—অন্যূনাধিকতা তজ্‌জ্ঞৈর্নিকৃতিঃ পরিগীয়তে। একটি সাধারণ শব্দের অর্থনির্ণয়ে কেন এরকম ভ্রান্তি হল বোঝা দুঃসাধ্য।

করুণা—রাগবিস্তৃতিতে যেখানে করুণার ভাব প্রস্ফুটিত হয় সেই কার্য হচ্ছে করুণা স্থায়।

বিবিধ স্থায়—অনেক ভঙ্গিযুক্ত স্থায়ের নাম বিবিধ।

গাত্র—গাত্র বা দেহ হিসাবে গায়নপদ্ধতির যে প্রভেদ তাকে গাত্র স্থায় বলে। দেহভেদে সঙ্গীতেরও ভেদ হয়। প্রত্যেকের কণ্ঠ তার দেহের অনুপাতে সংগঠিত হয় এবং একজনের দেহ অপরের অনুরূপ নয়। অতএব দেহ অনুসারে প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যেই তারতম্য বর্তমান এবং সঙ্গীতেও সেই তারতম্যের প্রকাশ ঘটে।

ইতিপূর্বে ক্ষেত্রকাকুতে একই বিষয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এ দুটির মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই।

উপশম—তীব্রতম ধ্বনির পর শীঘ্র মন্দ্রে প্রশমিত হলে তাকে উপশম স্থায় বলে।

কাণ্ডারণা—বৃক্ষকাণ্ডে যেমন দ্রুতগতি আরোহণ করা হয় তেমনি মন্দ্র-মধ্য-তার স্থানে অক্লেশে সঞ্চরণকে কাণ্ডারণা স্থায় বলে, অর্থাৎ রাগ বস্তারে স্বরের সুগমতাই হচ্ছে কাণ্ডারণা স্থায়।

নির্জবন—সরল, কোমল, রঞ্জক এবং অতি সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী স্বরে রাগবিস্তারকে বলা হয় নির্জবন স্থায়।

গাঢ়—শৈথিল্যহীন প্রচুর স্বরযুক্ত রাগবিস্তারকে গাঢ়-স্থায় বলে।

ললিত গাঢ়—গাঢ় স্থায় মৃদুতাযুক্ত হলে তাকে ললিত গাঢ় বলা হয়।

ললিত—সবিলাস গতিকে ললিত স্থায় বলে।

লুলিত—মৃদু এবং ঘূর্ণিত গতিকে লুলিত বলা হয়।

সম—বেগ বিলম্বরহিত অর্থাৎ মধ্যমানে গান করাকে সম বলে

কোমল—সুকুমার গতিকে কোমল বলা হয়।

প্রসৃত—প্রসারযুক্ত অর্থাৎ বিস্তারসম্পন্ন গতিকে প্রসৃত বলে।

স্নিগ্ধ—রুক্ষতাবর্জিত রাগবিস্তার।

চোক্ষ—উজ্জ্বল, দীপ্তিমান স্বরবিস্তার।

উচিত—যে রাগ বিস্তারে ঔচিত্যবোধ রক্ষিত হয় তাকে উচিত স্থায় বলে।

সুদেশিক—বিদগ্ধ জনের অর্থাৎ সহৃদয় বা রসিকজনের প্রিয় যে রাগকৃত্য তাকে বলা হয় সুদেশিক স্থায়। রত্নাকর বলছেন—সুদেশিকো বিদগ্ধানাং বল্লভঃ। দেশিক-শব্দের অর্থ আচার্য, শিক্ষক, গুরু, অর্থাৎ অত্যন্ত শিক্ষিত শিল্পী কর্তৃক মার্জিত স্বরবিস্তারই হচ্ছে এই শব্দটির তাৎপর্য।

অপেক্ষিত—স্বরের যে কাজটি পূর্ণতালাভের জন্য পূর্বের কাজটির অপেক্ষা রাখে তাকে বলে অপেক্ষিত স্থায়।

ঘোষ স্থায়—মন্দ্র স্থানে স্নিগ্ধমধুর কম্পন এবং গমকযুক্ত ধ্বনিকে ঘোষ স্থায় বলা হয়। গাম্ভীর্যপূর্ণ মাধুর্যই এই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য।

বহ—রাগবিস্তারে স্বরের কম্পনাত্মক কাজকে বহসম্বন্ধীয় স্থায় বলা হয়।

উল্লাসিত—স্বরের সবেগ ঊর্ধ্বগতিকে উল্লাসিত স্থায় বলে।

তরঙ্গিত—যে ক্রিয়ায় স্বর গঙ্গাতরঙ্গের মত প্রবাহিত হয় তার আখ্যা তরঙ্গিত স্থায়।

প্রলম্বিত—অর্ধপূর্ণ কলসে জল যেমন দুলতে থাকে এইরকম দোলনযুক্ত স্বরের কাজকে প্রলম্বিত স্থায় বলে।

অবস্খলিত—আরোহণে মন্দ্র স্থানকে যে স্থায় অল্পকালের মধ্যেই পরিত্যাগ করে তাকে অবস্খলিত স্থায় বলে।

ত্রোটিত—একটি স্বরে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর অগ্নিবৎ তারস্বর স্পর্শ করে সেই স্থানে ফিরে আসার নাম ত্রোটিত স্থায়।

সংপ্রবিষ্ট—অবরোহণে স্বরের ঘনত্বকে সংপ্রবিষ্ট স্থায় বলে।

উৎপ্রবিষ্ট—আরোহণে স্বরের ঘনত্বকে উৎপ্রবিষ্ট স্থায় বলে।

নিঃসরণ—স্বরের নির্গমনকে নিঃসরণ স্থায় বলে।

ভ্রামিত—স্বরের ভ্রমণ বা সঞ্চরণকে ভ্রামিত স্থায় বলে।

দীর্ঘকম্পিত—স্বরের দীর্ঘ কম্পনকে দীর্ঘকম্পিত স্থায় বলে।

প্রতিগ্রাহ্যোল্লাসিত—খেলার বল যেমন মাটিতে পড়ে আবার লাফিয়ে ওঠে তেমনি স্বরের নিক্ষেপ এবং উৎক্ষেপণের পর তাকে গ্রহণ করাকে প্রতি-গ্রাহ্যোল্লাসিত স্থায় বলা হয়।

অলম্ববিলম্বক—প্রথমে দ্রুত গাইবার পর বিলম্বিত মানে গাওয়াকে অলম্ব-বিলম্বক বলা হয়।

ত্রোটিতপ্রতীষ্ট—তার এবং মন্দ্র এই উভয় স্থানের মধ্যে প্রথমকে অর্থাৎ তারস্থানকে পরিত্যাগপূর্বক দ্বিতীয় অর্থাৎ মন্দ্রস্থানকে স্বীকার করে গান করার আখ্যা ত্রোটিতপ্রতীষ্ট স্থায়।

প্রসৃতাকুঞ্চিত—যে ধ্বনি বিস্তৃত হবার পর কুঞ্চিত বা সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তাকে প্রসৃতাকুঞ্চিত স্থায় বলা হয়।

স্থির—স্থায়ী বর্ণে স্থিত স্বরের কম্পনকে স্থির স্থায় বলে। স্থায়ী বর্ণ সম্বন্ধে বর্ণালঙ্কারপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

স্থায়ুক—এটি স্থির স্থায়েরই অনুরূপ তবে কাজটি একটি স্বরকে অধিকার করে না, দুটি বা তিনটি স্বর নিয়ে নিষ্পন্ন হয়।

ক্ষিপ্ত—তারস্বরে প্রসারিত ক্রিয়াকে ক্ষিপ্ত স্থায় বলা হয়।

সূক্ষ্মান্ত—প্রথম দিকটা স্থূলভাবে আরম্ভ করে শেষের দিকটা সূক্ষ্মভাবে সমাপ্ত করলে তাকে সূক্ষ্ম স্থায় বলে। সিংহভূপাল সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ করেছেন অল্পতা।

প্রকৃতিস্থ—অবিকৃত শব্দ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেলে তাকে প্রকৃতিস্থ বলা হয়।

কলা—শব্দকে সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করা।

আক্রমণ—প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত ক্রিয়াকে আক্রমণসম্বন্ধীয় স্থায় বলা হয়।

ঘটনা—যে সব কাজ শিল্পী কর্তৃক ঘটিত অর্থাৎ স্বকীয়তায় সম্পূর্ণ তাকে বলা হয় ঘটনাসম্বন্ধীয় স্থায়।

সুখ—সুখদায়ক সাঙ্গীতিক ক্রিয়া।

চালি—একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে স্বরচালনাকে বলে চালি। রত্নাকর বলছেন একে দেশীয় ভাষায বলা হত জক্কা। এই রকম কোন শব্দ ভারতের কোথাও প্রচলিত আছে কিনা জানি না। ভঙ্গি বোঝাতে চালি কথাটা এখনও আমরা ব্যবহার করি; যেমন—অমুখ সুরের অমুক চাল। এই চাল এবং চালি এক বস্তু।

জীবস্বর—অংশস্বরকে জীবস্বর বলা হয়। এই জীবস্বরকে মুখ্য করে যে স্থায় অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে জীবস্বর। রাগালপ্তিতে নানাবিধ স্থায়ের প্রয়োগ জীবস্বরকে মুখ্য করে অভিব্যক্ত করা হয়।

বেদধ্বনি—যে স্থায় বেদধ্বনির মত প্রতিভাত হয় তাকে বেদধ্বনি স্থায় বলে।

ঘনত্ব—অন্তঃসারযুক্ত স্বরসংগঠিত স্থায়।

শিথিল—যে স্থায়ে স্বরের শৈথিল্য অনুভূত হয় তাকে শিথিল স্থায় বলে।

অবঘট—কষ্টসাধ্য স্থায়।

প্লুত—অত্যন্ত বিলম্বিত গায়ন।

রাগেষ্ট—যে কাজটি না হলে রাগ অপরিপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয় তাকে বলে রাগেষ্ট। এটি পূর্ববর্ণিত অপেক্ষিত স্থায়ের অনুরূপ।

অপস্বরাভাস—যে কাজটি সুস্বরযুক্ত হলেও অপস্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাকে বলা হয় অপস্বরাভাস।

এই প্রসঙ্গে অলঙ্কারশাস্ত্রের রসাভাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত শাস্ত্রানুযায়ী রসের ক্ষেত্রে অনৌচিত্য প্রযুক্ততা ঘটলে, অর্থাৎ সাদা কথায় উচিত সম্বন্ধ না হলে তাকে বলা হয় রসাভাস। এক্ষেত্রেও স্বরের প্রযুক্ততায় অনৌচিত্য ঘটলে তাকে বলা হয়েছে অপস্বরাভাস; অর্থাৎ, রসসৃষ্টি হলেও তা অনৌচিত্যদোষে সুস্বরের অন্তর্গত হতে পারে না।

বদ্ধ স্তব্ধ অর্থাৎ আড়ষ্ট ধরণের কাজকে বদ্ধ স্থায় বলে।

কলরব—মধুর ধ্বনির প্রাচুর্য্য হচ্ছে কলরব স্থায়।

ছান্দস—রত্নাকর বলছেন—ছান্দসঃ অচতুরপ্রিয়ঃ, অর্থাৎ যা অচতুরের প্রিয় তাই হচ্ছে ছান্দস। সিংহভূপাল ব্যাখ্যা করেছেন—যস্তু ছান্দসানাম্ অচুতরানাম্ অবিদগ্ধানাম্ প্রিয়ঃ স ছান্দসঃ। ছান্দস বলতে এখানে অচতুর বা অরসিক বোঝান হয়েছে। ছান্দাসশব্দের অর্থ হচ্ছে বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ যিনি বেদের অধ্যাপনা করেন। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কি কারণে অচতুর বলা হল সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা,তবে এইটাই অনুমান হয়যে সে যুগের শ্রোত্রিয়-গণের গম্ভীর প্রকৃতি এবং নিরস স্বভাবই এবম্বিধ আখ্যাব হেতু। তাঁরা বোধ করি সুললিত সঙ্গীত পছন্দ করতেন না এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবের তত্ত্ব-সঙ্গীত তাঁদের মনোরঞ্জন করত। ছান্দস সম্ভবত সেই ধরণের নিরস সঙ্গীত। তবে, এখানে সামগানের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে এমন ধারণা করলে ভুল হবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিয়ম প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই এই ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

সুকরাভাস—সঙ্গীতটি দুষ্কর হলেও গাইবার গুণে সুখগেয় মনে হলে তাকে বলে সুকরাভাস, অর্থাৎ আসলে জিনিসটা দুষ্কর কিন্তু সৌকর্যের সঙ্গে অভিব্যক্ত হওয়ার দরুণ সুসাধ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এইজন্যই এর নাম সুকরাভাস।

সংহিত—ঘণ্টানাদের মত অনুরণনযুক্ত স্বরে তার স্থান থেকে মন্দ্র স্থানে প্রত্যাগমনের নাম সংহিত। সংহিত-শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্রীকৃত বা যুক্ত। চড়া থেকে খাদ পর্যন্ত স্বরগুলির একত্রীকরণকেই সংহিত বলা হয়েছে।

ঘণ্টানাদ এই শব্দে বোঝা যাচ্ছে যে একাজটী গমকযুক্ত হবে। গমক না থাকলে ঘণ্টানাদের মত স্বর উচ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়।

লঘু—গুরুত্বরহিত সঙ্গীত। সিংহভূপাল বলছেন—যত্ত গুরুত্বেন হীন লাঘবেন গীয়তে স লঘুরিত্যুচ্যতে।

অন্তর—ধ্রুবক এবং আভোগের মাঝামাঝি কলিকে বলা হয় অন্তর। প্রবন্ধসঙ্গীতের চারটি কলি আছে—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। শেষ কলি আভোগ এবং মাঝের কলি ধ্রুবের মধ্যবর্তী আর একটি কলির যোজনা করা হত—তার নাম অন্তর। এটি সেকালের সালগ-সূড় প্রবন্ধে যুক্ত হত। বর্তমানে অন্তরা আমাদের গানের প্রধান কলি।

বক্র—বক্র গতিকেই বক্রস্থায় বলা হয়। সোজাভাবে গাইবার সময় দু-একটি স্বরকে লঙ্ঘন করে পরবর্তী স্বর গেয়ে আবার পূর্ববর্তী লঙ্ঘিত স্বরে ফিরে এসে তারপর সুরের অগ্রগতি সাধন করাকে বলে বক্র স্থায়।

দীপ্তপ্রসন্ন—তার স্থানে অর্থাৎ চড়ার দিকে স্বর সহজ এবং অবিকৃত থাকলে তাকে বলে দীপ্তপ্রসন্ন। শুধু অবিকৃত নয় স্বরের দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্যও থাকা চাই।

প্রসন্নমৃদু—সুসাধ্য এবং কোমল ধ্বনিযুক্ত স্বরকে বলা হয় প্রসন্নমৃদু।

গুরু—লঘুর উল্টো অর্থাৎ যা হাল্কাভাবে গাওয়া যায় না, যথেষ্ট গুরুত্ব সংযোগ করে গাইতে হয় সেই ধরণের কাজকে বলে গুরু স্থায়।

হ্রস্ব—খর্ব কাজকে হ্রস্ব স্থায় বলে।

শিথিলগাঢ—স্বরপ্রাচুর্য সত্ত্বেও যদি শৈথিল্য বর্তমান থাকে তাহলে তাকে বলা হয় শিথিলগাঢ

দীর্ঘ—দীর্ঘ বা বিলম্বিত কাজকে দীর্ঘ স্থায় বলে।

অসাধারণ—সবাইকার কণ্ঠে সবরকম সুরের কাজ হয় না। কোনো কোনো শিল্পীর শব্দগুণে বা শরীরগুণে কোনো কোনো দুরূহ সুরের কাজ অনায়াসে এবং অবিকৃতভাবে সম্পন্ন হয়। একে বলে অসাধারণ।

সাধারণ—সকলেই যে ক্রিয়া করতে সমর্থ তাকে সাধারণ বলা হয়।

নিরাধার—যে ক্রিয়া কম্পন প্রভৃতি কোনো প্রচেষ্টাকে আশ্রয় না করে স্বতই নির্বাহিত হয় তাকে নিরাধার বলে।

দুষ্করাভাস—কাজটি আসলে সুকর বা সুসাধ্য কিন্তু দুষ্করভাবে করা হচ্ছে এরকম দেখানো হয়—এই প্রচেষ্টার নাম দুষ্করাভাস।

মিশ্রক—মিশ্রণযুক্ত স্থায়কে মিশ্রক বলা হয়।

বিভিন্ন স্থায়ের বর্ণনা এইখানেই শেষ হয়েছে। স্থায়প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক এই কারণে যে প্রতিটি স্বরের কাজকে কিভাবে বিচার এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেটি এইসব নাম বা বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। বর্তমান সঙ্গীতালোচনায়ও আমরা এইসব আখ্যার বহুল ব্যবহার করতে পারি।

আমাদের বর্তমান সঙ্গীতের প্রথম কলির নাম স্থায়ী। এই স্থায়ী আখ্যাটি স্থায় থেকেই এসেছে। স্থায়ীতেই রাগের অবয়ব যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থায়ী নামক বর্ণের সঙ্গে স্থায়ী নামক গানের কলির সম্বন্ধ নেই। স্থায় বা রাগের সংগঠন এবং অভিব্যক্তি থেকেই স্থায়ী নামক কলির পরিকল্পনা হয়েছে।

গমক

স্বরের কম্পনকে গমক বলে। এই কম্পন এলোমেলো হলে চলবে না—শ্রোতৃচিত্তসুখাবহ হওয়া চাই, অর্থাৎ কম্পনের একটি বিশিষ্ট রূপকেই গমক বলা হয়। গমক-শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় উপলক্ষ্যে সিংহভূপাল পার্শ্বদেবের সঙ্গীতসময়সার থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন।

স্বশ্রুতিস্থানসম্ভূতাং ছায়াং শ্রুত্যন্তরাশ্রয়াম্।
স্বরো যদ্গময়েদ্গীতে গমকোঽসৌ নিরূপিতঃ॥

বর্তমানেও গমক অর্থে আমরা অনুরূপ ক্রিয়াই বুঝি। অতএব টীকা অনাবশ্যক। গমককে সেকালে 'বাগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এখনো এই শব্দটি কোথাও প্রচলিত আছে কি না জানি না।

শার্ঙ্গদেব পোনেরোটি গমকের উল্লেখ করেছেন। এগুলির বর্ণনা দেওয়া হল:

তিরিপ—এটি খুব দ্রুত কম্পনের কাজ শুনতে অনেকটা অল্পনাদযুক্ত ডমরুধ্বনির মত। পরিমাণ অনুসারে হিসেব করলে এটিকে একটি দ্রুতের চতুর্থাংশবেগে অনুষ্ঠিত বলা যায়। দ্রুতের পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চলঘু অক্ষর (ক, চ, ত, ট, প) উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তার অর্ধেক কাল।

স্ফুরিত—দ্রুতের তৃতীয়াংশ পরিমিতবেগে অনুষ্ঠিত হলে সেই কম্পনকে বলা হয় স্ফুরিত।

কম্পিত—দ্রুতের অর্ধাংশ পরিমিত বেগে অনুষ্ঠিত গমককে বলা হয় কম্পিত।

লীন—দ্রুতমানে স্বরের কম্পনকে বলা হয় লীন।

আন্দোলিত—লঘুবেগযুক্ত গানে বেগে আন্দোলিত স্বরকম্পনকে বলা হয় আন্দোলিত।

বলি—বিবিধ বক্রত্বযুক্ত বেগে উচ্চারিত স্বরের কম্পনকে বলা হয় বলি।

ত্রিভিন্ন—মন্দ্র, মধ্য, তার—এই তিন স্থানে অবিশ্রান্ত ভাবে ঘন-সন্নিবেশিত স্বরসমূহের কম্পনকে বলে ত্রিভিন্ন।

কুরুল—গ্রন্থিসংযুক্ত কণ্ঠে কোমলভাব পূর্ববর্ণিত বলির' ন্যায় অনুষ্ঠিত কম্পনকে বলে কুরুল।

আহত—অগ্রিম বা আগের স্বরটিকে আহত করে নিবৃত্ত হলে যে কম্পন অনুভূত হয় তাকে বলে আহত। আহত অর্থে আগের স্বরটিকে একবার স্পর্শ করে নিবৃত্ত হওয়া বোঝাচ্ছে। সিংহভূপাল বলছেন—অগ্রিমং পুরস্তঃ স্থিতং স্বরমাহত্য শীঘ্রং সকৃৎ স্পৃষ্টা নিবৃত্ত আহত ইত্যুচ্যতে।

উল্লাসিত—উত্তরোত্তর ক্রম অনুসারে এক স্বর থেকে অপর স্বরে আরোহণ পূর্বক যে কম্পন অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে উল্লাসিত।

প্লাবিত—প্লুতমানে কম্পনকে প্লাবিত বলে। তিন মাত্রা পরিমিত কালকে প্লুত বলে, অর্থাৎ ক, চ, ত, ট, প—এই পাঁচটি লঘু অক্ষর তিন বার উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সেই কালকে বলা হয় প্লুত। এটি দীর্ঘকালব্যাপী অনুষ্ঠিত গমক।

গুম্ফিত—হৃদয়সমুত্থিত হুঙ্কারধ্বনিযুক্ত গম্ভীর কম্পনকে গুম্ফিত বলা হয়। সিংহভূপাল একে 'হুম্ফিত' বলেছেন। 'হৃদয়ঙ্গম'—এই শব্দটির অর্থ আমরা 'হৃদয় সমুত্থিত' করেছি;—সিংহভূপাল এটি প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অর্থাৎ মনোহর।

মুদ্রিত—মুখ মুদ্রিত করে যে কম্পন অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে মুদ্রিত।

নামিত—স্বরসমূহের নমনদ্বারা মন্দ্র স্থানে যে কম্পন অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে নামিত।

এ ছাড়া এইসব গমকের মিশ্রণে আরো বহু প্রকার গমকের উদ্ভব হতে পারে—এগুলি স্থায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

আলাপ ও আলপ্তি

রাগের আলপনকেই আলপ্তি বলা হয়। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—রাগালপন-মালপ্তিঃ প্রকটীকরণং মতম্। সিংহভূপাল টীকায় বলেছেন—"যেন স্বরসন্দর্ভেণ রাগঃ প্রকটীক্রিয়তে সা আলপ্তিঃ, অর্থাৎ যে স্বরসন্দর্ভ কর্তৃক 'রাগ প্রকটিত হয় তাকে বলে আলপ্তি।

আলপন, আলাপ এবং আলপ্তি—এই তিনটি শব্দ নিয়েই কল্লিনাথ সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। আ+লপ্+ঘঞ্—এইভাবে আলাপ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এই ঘঞ্ প্রত্যয় আবির্ভাবসূচক। আ+লপ্+ক্তি—এই হচ্ছে আলপ্তি। এই ক্তি-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ক্তি-প্রত্যয় তিরোভাবসূচক। আলাপন হচ্ছে ল্যুট প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং ক্লীবলিঙ্গ। আবির্ভাব এবং তিরো-ভাবের মধ্যবর্তী অর্থাৎ স্থিতিসূচক প্রত্যয় হচ্ছে ল্যুট। এই তিনটি লিঙ্গের সমাবেশে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ এবং উপচয়, অপচয় আর স্থিতি—এই তিনটী অবস্থাকেই পাওয়া যাচ্ছে। আলপন-শব্দে কেবলমাত্র স্থিতি এবং আলপ্তি শব্দে তিরোভাবের অবস্থা বোঝালেও স্থিতি অবস্থায় আবির্ভাব এবং তিরোভাব—এই দুটি সাধারণভাবে রয়েছে। এই কারণে আবির্ভাব না হলে অবস্থিতি সম্ভব নয় এবং স্থিতির শেষ পরিণতিই তিরোভাব। সুতরাং আলপন শব্দটির সঙ্গে আবির্ভাব এবং তিরোভাব—এই দুটিরই সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধটি কি রকম? না কাকাক্ষির অনুরূপ। কাকের একমাত্র চক্ষু যেমন উভয় গোলকেই চক্ষুর কার্য সম্পাদন করে সেইরকম একবিষয়ের সঙ্গে উভয় বিষয়ের সম্বন্ধ থাকলে তাকে কাকাক্ষি ন্যায় বলে। এক্ষেত্রেও আলপনশব্দটি আলাপ এবং আলপ্তি দুটি বিষয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ রক্ষা করছে। অতএব আলপন শব্দে আলপ্তি এবং আলাপ দুটিকেই বোঝান যেতে পারে।

আলপন-শব্দটি এইভাবে প্রযুক্ত হলেও শার্ঙ্গদেবের মতে রাগের প্রকটী করণে আলপ্তি-শব্দই যুক্তিযুক্ত। রাগের আবির্ভাব ঘটলেই বিচিত্র বর্ণ, অলঙ্কার, গমক, স্থায় এবং প্রয়োগভঙ্গি ভেদে তিরোভাব কার্য্যটি নিষ্পন্ন হয়। আবির্ভাব এবং স্থিতি না হলে যখন তিরোভাব সম্ভব হয়, না তখন আলপ্তির মধ্যেই আবির্ভাব এবং স্থিতির ভাবটিও বর্তমান এবং এদিক দিয়ে আলপ্তির

সঙ্গে আলাপ এবং আলপনের সমানার্থতা ঘটছে। এইটিই হচ্ছে আলপ্তি-শব্দকে সমর্থনের উদ্দেশ্য।

আলপ্তি দুই প্রকার—রাগালপ্তি এবং রূপকালপ্তি। রাগালপ্তি কেবলমাত্র রাগকে কেন্দ্র করেই বিস্তারিত হয়। এটি রূপকের বা গানের মত অঙ্গযুক্ত নয়।

রাগালপ্তির ব্যাপ্তিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক-একটি ভাগকে স্বস্থান বলা হয়।

যে স্বরে রাগ উপবেশন করে সেই স্বরকে বলে স্থায়ী স্বর। রাগের একটি প্রধান স্বরকেই বেছে নিয়ে স্থায়ী স্বর করা নিয়ম এই রাগালপ্তিতে। স্থায়ী স্বরকে এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে এটিকে কেন্দ্র করে গাইলে বা বাজালে রাগের উঁচু নিচু সব পর্দাতেই সুর লাগান সম্ভব হয়।

স্থায়ী স্বর থেকে আরোহণক্রমে চতুর্থস্বরকে দ্ব্যর্ধস্বর বলা হয়। আলপ্তির প্রথম পর্যায় হচ্ছে এই দ্ব্যর্ধস্বরের অধস্থিত স্বর পর্যন্ত চালন। এই দ্ব্যর্ধস্বর যদি এমন একটি স্বর হয় যা সেই রাগের বর্জিত স্বর তাহলে সেই স্বরটিকে বাদ দিয়ে তার পরের স্বরটিকে দ্ব্যর্ধস্বর স্থির করতে হবে। এই ক'টি পর্দার সুরসঞ্চালনকালে রাগসঙ্গীতে কম্পন, গমক প্রভৃতি সর্বপ্রকার কর্তব্যই করতে হবে। এই সব কর্তব্যকে মুখচাল বলা হয়।

এর পরে এই স্বরসঞ্চালনকে আর একটু বাড়িয়ে নিয়ে দ্ব্যর্ধস্বরটিকেও আলপ্তির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্ব্যর্ধস্বর পর্যন্ত যথারীতি আলাপের পর ক্ষান্তি বা ন্যাস হচ্ছে দ্বিতীয় স্বস্থান। কল্লিনাথ বলছেন দ্বিতীয় স্বস্থানেও স্থায়ীতে ন্যাস করতে হবে কিন্তু সিংহভূপাল দ্ব্যর্ধস্বরেই ন্যাসনের কথা বলেছেন। শার্ঙ্গদেব বলছেন—দ্ব্যর্ধস্বরে চালয়িত্বা ন্যসনং তদ্দ্বিতীয়কম্।' অতএব দ্ব্যর্ধস্বরে ন্যাসন বা স্থায়ী স্বরে ন্যসন—দুটিকেই স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

স্থায়ী স্বর থেকে অষ্টম স্বরটি হচ্ছে দ্বিগুণ। দ্ব্যর্ধস্বর এবং দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্বর হচ্ছে অর্ধস্থিত স্বর। দ্ব্যর্ধস্বর থেকে অষ্টম স্বরের মধ্যবর্তী এইসব স্বরে সঞ্চালন হচ্ছে তৃতীয় স্বস্থান। এই চালনার পর স্থায়ী স্বরে অথবা দ্ব্যর্ধস্বরে কিম্বা অর্ধস্থিত স্বরেও ন্যাসন করা যেতেপারে।

অতঃএব অষ্টম স্বর অর্থাৎ দ্বিগুণ স্বর বা ততোধিক চড়িয়ে সম্পূর্ণ আলপ্তির পর স্থায়ী স্বরে ন্যাসন হচ্ছে চতুর্থ স্বস্থান।

এই চারটি স্বস্থানে রাগালপ্তি সম্পূর্ণ হচ্ছে। এইভাবে রাগের আবির্ভাব

ঘটছে। এরপর ধীরে ধীরে নানা প্রকার স্থায়ের প্রয়োগে বিবিধ চাতুর্যসহকারে এবং স্বরের কোনো রকম বিকৃতি না ঘটিয়ে অংশ বা প্রধান (একে জীবস্বর বলা হয়েছে) স্বরকে অভিব্যক্ত করিতে হবে। এইভাবে রাগের অবস্থিতি ঘটবে। বিবিধ স্থায়প্রয়োগের কারণ বিবিধ বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করা যাতে রাগের প্রতীয়মানত্ব হয়।

এর পরে রূপকালপ্তি। প্রবন্ধসঙ্গীত অর্থাৎ সাধারণ গানের চারটে কলি আমরা রাগ এবং তালে গেয়ে থাকি। এই প্রবন্ধের আকৃতিকে সাধারণভাবে অবলম্বন করে যে স্বরচালনা তাকে বলে রূপকালপ্তি। আলঙ্কারিক দৃশ্যকাব্য রূপকের সংজ্ঞানির্ণয় উপলক্ষ্যে বলেছেন—রূপারোপাৎ তু রূপকম্, অর্থাৎ রূপের আরোপ হচ্ছে রূপক। যেমন রাম হচ্ছে প্রকৃত রূপ এবং নটের ওপর সেই রূপের আরোপ করা হচ্ছে। অথবা, নটকর্তৃক রাম রূপায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেইরকম অর্থাৎ নিবদ্ধ সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট রূপ রয়েছে স্বরালাপে সেই রূপটিকেই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রবন্ধসঙ্গীতের অনুকরণে এই রূপায়ণকেই বলা হয়েছে রূপকালপ্তি। এতে তালও প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

রূপকালপ্তি দু রকম—প্রতিগ্রহণিকা এবং ভঞ্জনী।

রাগালপ্তি উপলক্ষ্যে বিবিধ স্থায় প্রদর্শনপূর্বক যদি রূপকের অর্থাৎ প্রবন্ধ-সঙ্গীতের অবয়বটি গ্রহণ করা হয় তবে তাকে প্রতিগ্রহণিকা রূপকালপ্তি বলে অর্থাৎ আলপ্তি এখানে রূপককে প্রতিগ্রহণ করছে।

ভঞ্জনী রূপকালপ্তি আবার দু রকম—স্থায়ভঞ্জনী এবং রূপকভঞ্জনী। যখন প্রবন্ধের অনুরূপ রূপকে সংস্থিত স্থায়ের নানাপ্রকার বিচিত্র রীতি প্রদর্শিত হয় তখন সেটি হয় স্থায়ভঞ্জনী। এইটি যদি আরও বিভিন্ন ভঙ্গিতে নানা প্রকার বৈচিত্র্যসহকারে অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে বলে রূপকভঞ্জনী।

তাহলে সমগ্র আলাপের রূপ হল এই রকম :—

প্রথমে চারটি স্বস্থানে পরিব্যপ্ত আলাপে রাগের আবির্ভাব ঘটবে, তারপর বিবিধ স্থায়ের সাহায্যে রাগের প্রধান স্বরকে পরিব্যক্ত করে রাগের স্থিতি ঘটবে। অতঃপর আলপ্তির মাধ্যমে গানের সম্পূর্ণ অবয়বটি প্রস্ফুটিত হয়ে ধীরে ধীরে রাগের তিরোভাব ঘটবে।

এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষে শার্ঙ্গদেব বলছেন যে বর্ণালঙ্কার সম্পন্ন গমকস্থায়চিত্রিত বহু ভঙ্গিতে মনোহর এই প্রক্রিয়াকে আলপ্তি বলা হয়। ধ্বন্যাত্মকভাবে গ্রহণ করলে এই উক্তিতে একটি স্ত্রীরূপের ইঙ্গিত

পাওয়া যাচ্ছে। টীকাকার কল্লিনাথ এইটি উল্লেখ করে বলছেন—বিশেষণ সাম্যাৎ স্ত্রী সমাধির্ধ্বন্যতে, অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোকের বিশেষণ দিয়ে আলপ্তিকে ভূষিত করা হয়েছে। উদাহরণ সহযোগে তিনি ব্যাপারটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বর্ণালঙ্কারসম্পন্না কামিনী কামী জনকে দর্শন করলে স্বীয় পয়োধরাদি অঙ্গ কিঞ্চিৎ প্রদর্শনের পর বিলাস সহকারে তাদের আবৃত করে; আবার আবৃত অঙ্গকে সলজ্জভাবে পুনঃপ্রকটিত করে। আলপ্তিতেও এই লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াতেও স্বস্থানচতুষ্টয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি রাগের কিঞ্চিৎ প্রকাশের পর তিরোভাব ঘটছে। এই তিরোভূত রাগের কিঞ্চিদংশ আবার প্রতিগ্রহ ভঞ্জনী প্রভৃতি রূপকালপ্তিতে প্রকটিত হচ্ছে। আলাপ-শব্দটি পুংলিঙ্গ। পুরুষের গুণানুসারে এতে আবির্ভাবের সূচনা হয়েছে। আলাপন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। নপুংসকত্বের গুণ অনুসারে এতে স্থিতি ঘটছে। সংক্ষেপে এটিও বোঝানো হয়েছে। কল্লিনাথের নিজস্ব উক্তিটিও এখানে উদ্ধৃত করি।

বর্ণালঙ্কার সম্পন্নেত্যাদি। অত্র বিশেষণসাম্যাৎ স্ত্রী সমাধির্ধ্বন্যতে। যথা বর্ণালঙ্কারাদিসম্পন্না কামিনী কামুকদর্শনে কদাচিদাবিভূর্তং কুচদেশাদিকং স্বাঙ্গং কিঞ্চিদ্দর্শয়তি এবম্ স বলাসং তত্তিরোভাবয়তি। কদাচিত্তিরোভূতং প্রতিগ্রহভঞ্জনীভ্যাং তদ্রাগং প্রকটীকরোতি ইতি সহৃদয় প্রতিভাবিষয় এ বাহর্থ। আলাপস্ত পুমাড্‌গ্মশ্বাদিকমিব সদা রাগমাবির্ভাবয়তি। নপুংসকমিবালপনং তদুভয়সাধারণস্থিতিং সূক্ষ্মেক্ষিকয়াবগন্তব্যম্॥ ইতি রূপকালপ্তিঃ॥

রাগপ্রসঙ্গ

রাগপ্রসঙ্গে আমরা পাঁচটি গীতির উল্লেখ পাচ্ছি যেগুলিকে অবলম্বন করে রাগসঙ্গীত বিস্তৃত হত। এই পাঁচটি গীতি হচ্ছে—শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। রাগগুলির সাধারণ নাম ছিল গ্রামরাগ।

অবক্র এবং ললিতস্বরযুক্ত গীতির নাম শুদ্ধা। বক্র, সূক্ষ্ম এবং মধুর স্বরসম্পন্ন গমকসংযুক্ত গীতির নাম ভিন্না। মন্দ্র মধ্য, তার—এই তিন স্থানে পরিব্যাপ্ত, দ্রুতকম্পনযুক্ত, গমকসম্পন্ন, অখণ্ডিতস্থিতি, গাঢ়স্বরসম্পন্ন গীতির নাম গৌড়ী। এই গীতি গৌড়ে প্রচলিত ছিল। কল্লিনাথ বলছেন—গৌড় প্রিয়ত্বাৎ গৌড়ী ইতি অবগন্তব্যা। "বেসরা"র প্রকৃত নাম বেগস্বরা। সংক্ষেপে একে বলা হয় বেসরা। এর অপর নাম রাগগীতি। স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী—এই চতুর্বর্ণসমৃদ্ধ, বিশেষ রক্তিযুক্ত, আবেগে উচ্ছল যে যে গীতি তার নাম বেসরা। আর,—শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী এবং বেসরা—এই চারটি গীতির মিশ্রণে যে গীতির উৎপত্তি তার নাম সাধারণী।

ইতিপূর্ব আমরা মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি গীতির পরিচয় পেয়েছি। এসব গানের উদাহরণ দেখবার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে এবং এদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা করিতে পারি। অতঃপর শুদ্ধা, ভিন্না প্রভৃতি গীতির উদাহরণও শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। গ্রামরাগের প্রস্তার উপলক্ষ্যে যে সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই গানগুলির পরস্পরের প্রভেদ স্পষ্টভাবে বোঝা কঠিন। মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রভৃতি গীতি থেকে এই পঞ্চগীতির প্রভেদ কি—এই প্রশ্নের অবতারণা করে কল্লিনাথ জানাচ্ছেন যে মাগধী প্রভৃতি গীতে পদ এবং তালের প্রাধান্য, কিন্তু শুদ্ধা প্রভৃতি গীতি প্রধানত স্বরাশ্রিত অর্থাৎ রঞ্জকত্বপ্রধান। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ক্রমে ক্রমে গানে আর্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে। গীত এবং রাগের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে গীতের প্রধান দিক হচ্ছে অবয়ব এবং বাণী। বিবিধ অঙ্গদ্বারা বদ্ধ, সুর-পদ-তাল এবং মার্গত্রয়যুক্ত যে গান তাকেই বলে গীত বা গীতি আর, রাগ হচ্ছে পূর্বোক্ত জাতির মত গ্রহ, অংশ প্রভৃতি দশটি লক্ষণযুক্ত স্বরানুষ্ঠান যার প্রাধান্য কেবলমাত্র স্বরের সন্নিবেশে। রাগ গীতকেই আশ্রয় করে তাকে কাব্যলোক থেকে সুরলোকে উত্থিত করছে।

শুদ্ধাগীতিতে আশ্রিত গ্রামরাগ—

শুদ্ধকৈশিক মধ্যম	—	ষড়্জগ্রাম
শুদ্ধসাধারিত	—	„
ষড়্জগ্রাম	—	„
পঞ্চম	—	মধ্যমগ্রাম
মধ্যমগ্রাম	—	„
ষাড়ব	—	„
শুদ্ধকৌশিক	—	„

ভিন্নাগীতিতে আশ্রিত গ্রামরাগ—

ভিন্নকৌশিক মধ্যম	—	ষড়্জগ্রাম
ভিন্নষড়্জ	—	„
ভিন্নতান	—	মধ্যমগ্রাম
ভিন্নকৌশিক	—	„
ভিন্নপঞ্চম	—	„

গৌড়ীগীতিতে আশ্রিত গ্রামরাগ—

গৌড়কৈশিক মধ্যম	—	ষড়্জগ্রাম
গৌড়পঞ্চম	—	„
গৌড়কৈশিক	—	„

বেসরা বা রাগগীতির অন্তর্ভুক্ত গ্রামরাগ—

টক্ক	—	ষড়্জগ্রাম
বেসরষাড়ব	—	„
সৌবীর	—	„
বোট্ট	—	মধ্যমগ্রাম
মালবকৈশিক	—	„
মালবপঞ্চম	—	„
টক্ককৈশিক	—	ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম
হিন্দোল	—	„

সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত গ্রামরাগ—

রূপসাধার	—	ষড়্জগ্রাম

শক	—	"
ভম্মাণপঞ্চম	—	"
নর্ত	—	মধ্যমগ্রাম
গান্ধার পঞ্চম	—	"
ষড়্‌জকৈশিক	—	"
ককুভ	—	ষড়্‌জ ও মধ্যমগ্রাম

এই তিরিশটি গ্রামরাগের পর আটটি উপরাগের উল্লেখ করা হয়েছে। শকতিলক, টক্ক সৈন্ধব, কোকিলাপঞ্চম, রেবগুপ্ত, পঞ্চমষাড়ব, ভাবনাপঞ্চম, নাগগান্ধার, নাগপঞ্চম।

রাগের সংখ্যা কুড়িটি।

শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল (দুই প্রকার), ভাস, মধ্যমষাড়ব, রক্তহংস, কোহলহাস, প্রসব, ভৈরব, ধ্বনি, মেঘ, সোম, কামোদ (দুই প্রকার), আম্রপঞ্চম, কন্দর্প, দেশাখ্য, কৈশিক-ককুভ, নট্টনারায়ণ।

অতঃপর পনেরটি গ্রামরাগের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি হচ্ছে ভাষা-রাগের জনক। গ্রামরাগের আলাপ প্রকারকে ভাষা বলা হয়। ভাষা শব্দ এখানে প্রকার বাচক। এইরকম আলাপের প্রকারভেদ থেকেই বিভাষা এবং অন্তরভাষা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

এই গ্রামরাগ এবং তাদের থেকে উদ্ভূত ভাষা, বিভাষা রাগগুলির উল্লেখ করা গেল :

সৌবীর—সৌবীর, বেগমধ্যমা, সাধারিতা, গান্ধারী– এই চারটি ভাষা।

ককুভ - ভিন্নপঞ্চমী, কাম্বোজী, মধ্যমগ্রামা, রগন্তী, মধুরী, শকমিশ্র– এই ছটি ভাষা।

ভোগবর্ধনী, আভীরিকা, মধুকরী—এই তিনটি বিভাষা।

শালবাহনিকা—এই একটি অন্তরভাষা।

টক্ক—ত্রবণা, ত্রবণোদ্ভবা, বৈরঞ্জী, মধ্যমগ্রামদেহা, মালববেসরী, ছেবাটী, সৈন্ধবী, কোলাহলা, পঞ্চম লক্ষিতা, সৌরাষ্ট্রী, পঞ্চমী, বেগরঞ্জী, গান্ধার-পঞ্চমী, মালবী, তানবলিতা, ললিতা, রবিচন্দ্রিকা, তানা, অম্বহেরিকা, দোহ্যা, বেসরী—এই একুশটি ভাষা।

দেবারবর্ধনী, আন্ধ্রী, গুর্জরী, ভাবনী—এই চারটি বিভাষা।

পঞ্চম—কৈশিকী, ত্রাবণী, তানোদ্ভবা, আভীরী, গুর্জরী, সৈন্ধবী, দাক্ষিণাত্যা, আন্ধ্রী, মাঙ্গলী, ভাবণী—এই দশটি ভাষা।

ভম্মাণী, অন্ধালিকা—এই দুটি বিভাষা।

ভিন্নপঞ্চম—ধৈবতভূষিতা, শুদ্ধভিন্না, বরাটী, বিশালা—এই চারটি ভাষা।

কৌশলী—এই একটি বিভাষা।

টক্কৈশিক—মালবা, ভিন্নবলিতা—এই দুটি ভাষা।

দ্রাবিড়ী—এই একটি বিভাষা।

হিন্দোল (এর অপর নাম প্রেঙ্খক)—বেসরী, চ্যুতমঞ্জরী, ষড়্‌জমধ্যমা, মধুরী, ভিন্নপৌরালী, গৌড়ী, মালববেসরী, ছেবাটী, পিঞ্জরী—এই নটি ভাষা।

বোট্ট—মাঙ্গলী,—এই একটি ভাষা।

মালবকৈশিক—বাঙ্গালী, মাঙ্গলী, হর্ষপুরী, মালববেসরী, খঞ্জনী, গুর্জরী, গৌড়ী, পৌরালী, অর্ধবেসরী, শুদ্ধা, মালবরূপা, সৈন্ধবী, আভীরিকা—এই তেরটি ভাষা।

কাম্বোজী, দেবারবর্ধনী—এই দুটি বিভাষা।

গান্ধারপঞ্চম—গান্ধারী—এই একটি ভাষা।

ভিন্নষড়্‌জ—গান্ধারবল্লী, কচ্ছেল্লী, স্বরবল্লী, নিষাদিণী, ত্রবণা, মধ্যমা, শুদ্ধা, দাক্ষিণাত্যা, পুলিন্দকা, তম্বুরা, ষড়্‌জভাষা, কালিন্দী, ললিতা, শ্রীকণ্ঠিকা, বাঙ্গালী, গান্ধারী, সৈন্ধবী—এই সতেরটি ভাষা।

পৌরালী, মালবা, কালিন্দী, দেবারবর্ধনী—এই চারটি বিভাষা।

বেসরষাড়ব—নাদ্যা, বাহ্যষাডবা—এই দুটি ভাষা।

পার্বতা, শ্রীকণ্ঠী—এই দুটি বিভাষা।

মালবপঞ্চম—বেদবতী, ভাবনী, বিভাবনী—এই তিনটি ভাষা।

তান—তানোদ্ভবা—এই একটি ভাষা।

পঞ্চমষাড়ব—পোতা—এই একটি ভাষা।

রেবগুপ্ত—শকা—এই একটি ভাষা।

(উপরাগ) পল্লবী—এই একটি বিভাষা।

ভাসবলিতা, কিরণাবলী, শকবলিতা—এই তিনটি অন্তরভাষা।

এই ভাবে ছিয়ানব্বইটি ভাষা, কুড়িটি বিভাষা এবং চারটি অন্তরভাষা পাওয়া যাচ্ছে।

ভাষা রাগের চারটি প্রকারভেদ আছে—মুখ্যা, স্বরাখ্যা, দেশাখ্যা এবং উপরাগজা।

মুখ্যা ভাষা হচ্ছে অনন্যোপজীবিনী অর্থাৎ যেটি স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কল্লিনাথ বলছেন—অনন্যোপজীবিত্বং স্বরদেশাপেক্ষয়া প্রবর্তমানত্বম্ তেন বিনা স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্তমানা অত্র মুখ্যাঃ. অর্থাৎ যেটি কেবলমাত্র স্বর এবং দেশকর্তৃক প্রবর্তিত নয়, যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে—কাউকে অবলম্বন করে গঠিত হয় নি, সেটিই হচ্ছে মুখ্যা। উদাহরণস্বরূপ শার্ঙ্গদেব বলছেন—শুদ্ধা, আভীরী, রগন্তী এবং তিন প্রকার মালববেসরী—এই ছ'টি ভাষা হচ্ছে মুখ্যা। যে তিনটি মালববেসরীর কথা বলা হয়েছে তার একটি টক্কভাষা অপরটি হিন্দোল ভাষা এবং আর-একটি মালবকৈশিক ভাষা। শুদ্ধা এবং আভীরীর এইরকম প্রকারভেদ থাকলেও শার্ঙ্গদেব এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

স্বরজ ভাষা বা স্বরগত বৈশিষ্ট্য থেকে যে ভাষার উৎপত্তি তাকে বলে স্বরাখ্য ভাষা। যেমন—গান্ধারী, পঞ্চমী, ধৈবতভূষিতা, ষড়্জমধ্যমা, স্বরবল্লী, নিষাদিনী, মধ্যমা—এইগুলি।

দেশাখ্য ভাষা দেশজ বা দেশ থেকে সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি বা বংশ থেকে যে সব ভাষার উৎপত্তি হয়েছে তাদেরও বোধ হয় দেশাখ্যের মধ্যেই ধরতে হবে। এর উদাহরণ—সৌবীরী, কাম্ভোজী, শকমিশ্র, শাল-বাহনিকা, সৈন্ধবী, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জরী, দাক্ষিণাত্যা, আন্ধ্রী, মাঙ্গলী, হর্ষপুরী, গৌড়ী, কচ্ছেল্লী, পুলিন্দকা, বাঙ্গালী, পল্লবী প্রভৃতি।

অপরগুলিকে উপরাগজ বলা হয়ে থাকে। সিংহভূপাল বলছেন মুখ্যা, স্বরাখ্যা এবং দেশাখ্যার মিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি উপরাগজ। উপরাগ থেকে উৎপত্তি হলেও তাকে উপরাগজ বলা যায়।

এই যে চার প্রকার ভাষার কথা বলা হল এগুলি মতঙ্গ কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে। যাষ্টিক আবার অপর আখ্যা দিয়েছেন। সেই নামগুলি হল—সঙ্কীর্ণা, দেশজা, মূলা এবং ছায়ামাত্রা। কল্লিনাথ বলছেন মূলা হল মুখ্যা ভাষা, সঙ্কীর্ণা স্বরাখ্য ভাষা, দেশজা দেশাখ্য ভাষা এবং ছায়ামাত্রা উপরাগজা ভাষা।

এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে একই ভাষা বিভিন্ন গ্রামরাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব এর কারণ সম্বন্ধে এক কথায় বলেছেন যে নামের দিক থেকে সাম্য হলেও এদের লক্ষণে প্রভেদ ছিল। পূর্বে বলা

হয়েছে যে ভাষা শব্দ প্রকারবাচক এবং আলাপের প্রকারভেদ থেকেই এরও প্রকারভেদ নির্ণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই ভেদ বিভিন্ন দেশ এবং স্বরের প্রভাব অনুসারেই হয়েছে।

যে গ্রামরাগগুলির (এর সঙ্গে ভাষারাগকেও ধরতে হবে) কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে কেউ কেউ মার্গরাগ আখ্যা দিয়েছেন। ক্রমে এই রাগগুলি পরিবর্তিত হতে হতে দেশীরাগের পর্যায়ে এসে পড়ল। দেশীরাগহেতু এদের আখ্যাও পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো চারটি নামে—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ, অর্থাৎ বহুমিশ্রণের ফলে এদের কেবল মূলের অঙ্গোৎপন্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই অঙ্গরাগগুলিও বহুকাল ধরে চলে এসেছে। এই কারণে এদেরও পূর্বপ্রসিদ্ধ এবং অধুনাপ্রসিদ্ধ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পূর্বপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ হচ্ছে আটটি—শঙ্করাভরণ, ঘণ্টারব, হংসক, দীপক, রীতি, কর্ণাটিকা, লাটী, পাঞ্চালী। পল্লবী নামেও একটি দেশী রাগ প্রচলিত ছিল।

পূর্বপ্রসিদ্ধ ভাষাঙ্গ হচ্ছে এগারটি—গাম্ভীরী, বেহারী, শ্বসিতা, উৎপলী, গোলী, নাদান্তরী, নীলোৎপলী, ছায়া, তরঙ্গিণী, গান্ধারগতিকা, বেরঞ্জী।

পূর্বপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াঙ্গ হচ্ছে বারটি—ভাবক্রী, স্বভাবক্রী, শিবক্রী মকরক্রী, ত্রিনেত্রক্রী, কুমুদক্রী, দম্ভক্রী, ওজক্রী, ইন্দ্রক্রী, নাগক্রী, ধন্যক্রী, বিজয়ক্রী।

বিবিধ ক্রিয়াকলাপে এই সব রাগ গাওয়া হত।

পূর্বপ্রসিদ্ধ উপাঙ্গ হচ্ছে তিনটি—পূর্ণাটী, দেবাল, গুরুঞ্জিকা।

সর্বসমেত এই চৌত্রিশটি প্রাক্‌প্রসিদ্ধ রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর পরে অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গাদির উল্লেখ করা যাক।

অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ তেরটি—মধ্যমাদি, তোড়ী, বঙ্গাল, ভৈরব, বরাটী, গুর্জরী, গৌড়, কোলাহল, বসন্তক, ধন্যাসী, দেশী, দেশাখ্য।

অধুনাপ্রসিদ্ধ ভাষাঙ্গ হচ্ছে নটি—ডোম্বক্রী, সাবরী, বেলাবলী, প্রথম-মঞ্জরী, আদিকামোদিকা, নাগধ্বনি, শুদ্ধবরাটিকা, নট্টা, কর্ণাটবঙ্গাল।

অধুনাপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াঙ্গ তিনটি—রামকৃতি, গৌড়কৃতি, দেবকৃতি।

অধুনাপ্রসিদ্ধ উপাঙ্গ সাতাশটি—কৌন্তলীবরাটিকা, দ্রাবিড়ীবরাটিকা, সৈন্ধবীবরাটিকা, উপস্থানবরাটিকা, হতস্বরবরাটিকা, প্রতাপবরাটিকা—এই ছটি বরাটীর প্রকারভেদ। তোড়ীর দুটি উপাঙ্গ হচ্ছে—ছায়াতোড়িকা, তুরুষ্ক-

তোড়িকা। গুর্জরীর চারটি উপাঙ্গ হচ্ছে—মহারাষ্ট্রী গুর্জরী, সৌরাষ্ট্রীগুর্জরী, দক্ষিণাগুর্জরী, দ্রাবিড়ীগুর্জরী। অপর উপাঙ্গ রাগগুলি হচ্ছে—ভুচ্ছিকা, স্তম্ভতীর্থিকা, ছায়া-বেলাবলী, প্রতাপবেলাবলী, ভৈরবী, কামোদসিংহলী, ছায়ানট্টা, রামকৃতি, ভল্লাতিকা, মল্লারী, গৌড়মল্লার, কর্ণাট, দেশবাল, তৌরুষ্ক, দ্রাবিড়।

এই বাহান্নটি শার্ঙ্গদেবের সময়কার অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগ।

সব মিলিয়ে আমরা যে সংখ্যা পাচ্ছি তা হচ্ছে এই :

গ্রামরাগ — ৩০

উপরাগ — ৮

রাগ — ২০

ভাষা — ৯৬

বিভাষা — ২০

অন্তর ভাষা — ৪

পূর্বপ্রসিদ্ধ

রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ — ৩৪

অধুনাপ্রসিদ্ধ

রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ — ৫২

২৬৪

মোটমাট যাবতীয় প্রকারভেদ সহ তৎকালীন রাগের সংখ্যা হল—২৬৪।

এই অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে বিচার করা হয় নি। হয়ত সম্ভবও ছিল না। কয়েকটি অঙ্গরাগের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কি ভাবে হয়েছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়. কেন না মিশ্রণটা কিভাবে হয়েছে সেটি নির্ণয় করা শক্ত। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—যেমন বঙ্গাল।

প্রথমে আমরা দেখছি বঙ্গাল বিংশতি প্রকার রাগের অন্যতম। দুই প্রকার বঙ্গাল রাগের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একটিতে গ্রহ এবং অংশস্বর—নি, মন্দ্র-গান্ধার এবং তারমধ্যমের ব্যবহার আছে। অপরটি ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্ভুক্ত মন্দ্রহীন। এর গ্রহ, অংশ, ন্যাস—সা। এর পর আমরা বঙ্গালকে পাচ্ছি মালবকৌশিক গ্রামরাগের ভাষা হিসাবে। এ ক্ষেত্রে গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে—মা, ন্যাসস্বর—সা, সংবাদী—রে এবং নি। এই সব পরিবর্তন

কি ভাবে সাধিত হয়েছে সেটা খুব স্পষ্ট উদাহরণ না পেলে বোঝা সম্ভব নয়।

রাগসঙ্গীতের বিস্তৃতির আলোচনায় 'ভাষা'র স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে বলা হয়েছে ভাষারাগ প্রকারবাচক। আলাপের ভেদে এই ভাষার বৈষম্য হয় কিন্তু ভাষার আসল অর্থ, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশভাষার আশ্রয়ে মূলরাগের পরিবর্তন—এইটিই প্রগতির দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমে মাগধী প্রভৃতি গীতে যে জাতি অবলম্বিত হত সেগুলির উৎপত্তি ছিল স্বর থেকে। গ্রামরাগের বেলায় দেখা যাচ্ছে নানা জাতি এবং দেশের প্রভাব এসেছে, যেমন সৌবীর, টক্ক (টক্ক), মালব, শক, নর্ত, দ্রাবীড়, পল্লব, গান্ধার, গৌড়,—এইসব। ক্রমে এইসব সুর আরও বিস্তৃত হয়ে নানা ভাষায় ছড়িয়ে পড়ায় তাদের বহুল পরিবর্তন হল। ভাষারাগগুলি এই পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য বহন করে।

নট্টরাগ বিংশতি রাগের অন্যতম ছিল, কিন্তু ক্রমে এটি একটি ভাষাঙ্গে পরিণত হয়। শার্ঙ্গদেবের সময় এটি একটি ভাষাঙ্গ ছিল। মালব ছিল টক্ক এবং টক্ককৈশিকের ভাষা। ক্রমে এটি রাগাঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বরাটী প্রথমে ছিল পঞ্চমের ভাষা, পরে রাগাঙ্গের পর্যায়ভুক্ত হয়। গুর্জরী ছিল টক্কনামক গ্রামরাগের অন্তরভাষা এবং পঞ্চমের ভাষা। পরে এইটিও রাগাঙ্গে পরিণত হয়। দেশাখ্য প্রথমে বিংশতি রাগের অন্যতম ছিল, পরে এটি উপাঙ্গ পর্যায়ে এসে পড়ে। রামকৃতি ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ দুই পর্যায়েই পাওয়া যায়।

ভাষারাগের বিকৃতি থেকে বিভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কোনো একটি গ্রামরাগের অন্তর্ভাগে স্বরাদির বৈচিত্র্য বা কোন দেশগত, জাতিগত, ভঙ্গিদ্বারা বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হলে তাকে অন্তরভাষা বলা হত। 'অন্তর'-শব্দটির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুসারে এই অনুমানই সঙ্গত।

বলা বাহুল্য ক্রিয়াঙ্গ রাগগুলি নানা পূজাপার্বণ এবং ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত সঙ্গীত থেকে এসেছে। এই সব সঙ্গীতে ক্রমে কিছুটা রাগসঙ্গীতের প্রভাব পড়েছিল। এর ফলেই এই ধরণের বহু গান রাগসঙ্গীতের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

উপাঙ্গগুলি হচ্ছে এই অঙ্গরাগগুলির মিশ্ররূপ। ভাষাঙ্গ, রাগাঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে অতিসামীপ্যহেতু এগুলি উপাঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত আমরা সঙ্গীতের যে পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করলাম তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

আমাদের ইতিহাস যেখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে মাগধী, অর্ধ-মাগধী সম্ভাবিতা, পৃথুলা—এইসব গানের প্রাধান্য দেখতে পাই। এইসব গীতিকে আশ্রয় করে জাতিগায়ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। জাতিগুলি ষড়্জাদি বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে গঠিত হয়েছে। প্রথমে ছিল সাতটি শুদ্ধজাতি। পরে এই জাতিগুলির সংমিশ্রণে আরও এগারটি জাতির উদ্ভব হয়েছিল।

পরবর্তী যুগে পাঁচটি গীতি প্রাধান্য লাভ করে। এগুলি হচ্ছে—শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। এই গীতিগুলিকে আশ্রয় করে যে গায়নপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তা আর জাতি নামে পরিচিত নয় তার আখ্যা হল গ্রামরাগ। ষড়্জ এবং মধ্যগ্রামের বিশিষ্ট স্বরবিন্যাসে এদের উৎপত্তি কিন্তু জাতিগায়নপদ্ধতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল নিবিড়। দেশ দেশান্তরে বা বিভিন্ন জাতিতে এই গ্রামরাগের ব্যাপ্তির ফলে বহুতর মিশ্রণ ঘটল। এই মিশ্রণ অনুসারে মূল থেকে যে পরিবর্তন সাধিত হল সেই পরিবর্তনের পরিমাণ অনুসারে তাদের নাম হল,—ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা। ভরত বলেছেন, নাটকে হীন জাতিরা যে ভাষা ব্যবহার করত তাকে বলা হত বিভাষা। হীনজাতীয়দের মধ্যে যে গীত প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যে সব গীতের অভ্যুদয় হয়েছিল হয়তো সে সব গীত দিয়েই বিভাষার সূত্রপাত হয়। আরো পরিবর্তন এবং মিশ্রণের ফলে যে নতুন শ্রেণীকরণ হল তার পরিচয়স্বরূপ আখ্যাগুলি হল—রাগ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। এই পর্যায়ে আমরা দেখছি রাগসঙ্গীত বিভিন্ন দেশী ক্রিয়াকলাপেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাগসঙ্গীত এইভাবে দেশী সঙ্গীতের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করল। ধীরে ধীরে এই অঙ্গরাগগুলিও ক্রমাগত মিশ্রণের ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল। তখন একটি মাত্র বৃহৎ শ্রেণী অবশিষ্ট রইল,—সেটি হচ্ছে—রাগ। এই বৃহৎ শ্রেণীটি আজও স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে।

এইবারে গ্রামরাগগুলির লক্ষণ নির্ণয় করা যাক। এই উপলক্ষে একটা কথা বলা আবশ্যক। গ্রামরাগগুলি দেশীরাগের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ বা কুড়িটি রাগ—এইগুলি দেশীর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষাকেও প্রায় দেশী বলেই স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং গ্রামরাগের কৌলীন্য সর্বাধিক এবং এগুলিই হচ্ছে মূল বা জনকরাগ।

গীতিসহযোগে গ্রামরাগ অনুষ্ঠানের পূর্বে আলাপ, করণ এর আচরণ গায়নবিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাতির সঙ্গে গ্রামরাগের একটি প্রধান পার্থক্য এইখানে। গ্রামরাগের গীতিগুলি অর্থাৎ শুদ্ধা ভিন্না প্রভৃতি মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রভৃতির চেয়ে পৃথক ছিল—এটিও আর একটি পার্থক্য। তা সত্ত্বেও এই দুটি গীতবিধির মধ্যে বিশেষ ঐক্য ছিল। একই রকম তাল এবং স্বর-বিন্যাস দেখে বিশেষ তফাৎ যে কোথায় ছিল সেটা বোঝা কঠিন।

গ্রামরাগের ব্যাপারে সবশুদ্ধ পাঁচটি অনুষ্ঠান আচরিত হত। প্রথমে রাগালাপ তথা রূপকালাপ অতঃপর করণ, বর্ধনী, পরিশেষে আক্ষিপ্তিকা। শার্ঙ্গদেব রাগালাপের পর করণও দিয়েছেন। এটি আলাপেরই একটি দীর্ঘায়িত অঙ্গ। আক্ষিপ্তিকা হচ্ছে আসল গানটি। এটিতে চচ্চৎপুট প্রভৃতি তাল থাকত, চিত্রাদি মার্গ প্রদর্শিত হত এবং যথানিয়মে স্বর এবং পদ গ্রথিত হত। এইসব গীতে আমরা প্রবন্ধসঙ্গীতের মত কলির বিন্যাস পাই না। আকৃতির দিক দিয়ে জাতিগানের উদাহরণের সঙ্গে আক্ষিপ্তিকার পার্থক্য তেমন বিশেষ কিছু নেই। প্রবন্ধসঙ্গীতকে অবলম্বন করেও রাগসঙ্গীতের বিস্তৃতি ঘটেছে, কিন্তু প্রবন্ধসঙ্গীতে রাগানুষ্ঠান হচ্ছে সম্পূর্ণ দেশী অনুষ্ঠান। শার্ঙ্গদেব স্পষ্টভাষায় বলেছেন গ্রামরাগের ব্যাপারে করণী, বর্তণী প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাষা, রাগ এবং অঙ্গরাগ পর্যন্তই সীমা নির্ধারণ করেছেন। তার বাইরে আর কোন গীতকে তিনি যথার্থ রাগসঙ্গীত বলে স্বীকার করেন নি।

শুদ্ধসাধারিত গ্রামরাগ।

একটি ষড়্জমধ্যমা নামক জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে তারষড়্জ। নিষাদ এবং গান্ধারের প্রয়োগ অল্প। ন্যাসস্বর মধ্যম। এটি সম্পূর্ণজাত য়। এতে ষড়্জাদি মূর্ছনা অর্থাৎ উত্তরমন্দ্রার প্রয়োগ হয়। আরোহীতে প্রসন্নান্ত অলঙ্কারের ব্যবহার হয়। প্রসন্নান্ত অলঙ্কার হচ্ছে প্রথমে তারষড়্জ এবং পরে দুটি মন্দ্রষড়্জের সন্নিবেশ। নাটকের গর্ভসন্ধিতে এর বিনিয়োগ হয়। রস—বীর এবং রৌদ্র। দিবসের প্রথম প্রহরে গেয়।

এটি ষড়্জগ্রামের রাগ। নিষাদ এবং গান্ধার অল্প হাওয়ায় এ দুটি স্বর কাকলী এবং অন্তর হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ এর প্রাচীন স্বরলিপিটি উদ্ধৃত করি :

আলাপ—সা পা ধা রীপাপাধারী পাধা সাসা পাধানীধা পামামা রীপা
ধারী পাধারী পাধাপাধাপাপা সাসা মা । সা গা রী সা । মগরি সাসা
সারিগ পাধারীপাধারীপাধাপাধাসাসা সারীগামাধাপানীধাপানীধাপা
সা সা ।

করণ—সস পপ ধধ রিরি পপ ধস সা ২ রিরি পপ ধনি পপ রিপ ধস
সা সা ২ ধধ মম গরি গম রিগ মম মগরিগ সসা ২ সস ধস রিগ সস
পধ নিধপ মম ।

গীত ঃ

উদয়গিরিশিখরশেখরতুরগখুরক্ষতবিভিন্নঘনতিমিরঃ ।
গগনতলসকলবিলুলিত সহস্রকিরণো জয়তু ভানুঃ ॥

(১)	স	স	ধ	নি	প	প	প	প
	উ	দ	য়	গি	রি	শি	খ	র
(২)	ধ	ধ	নি	নি	রি	রি	পা	পা
	শে	খ		র	তু	র	গ	খু
(৩)	রি	প	প	প	ধ	নি	প	ম
	র		ক্ষ	ত	বি	ভি		ন্ন
(৪)	ধ	ম	ধ	স	স	স	স	স
	ঘ	ন	তি	মি	রঃ			
(৫)	ধ	ধ	স	ধ	স	রি	গ	স
	গ	গ	ন	ত	ল	স	ক	ল
(৬)	রি	গ	প	প	প	প	প	প
	বি	লু	লি	ত	স	হ		স্র
(৭)	ধ	ম	ধ	ম	স	স	স	স
	কি	র		ণো	জ	য়		তু
(৮)	প	ধ	নিধ	প	ম	প	ম	ম
	ভা				নুঃ			

এই স্বরলিপিতে প্রথম স্বরটি মধ্যষড়্‌জ দেখান হয়েছে ; কিন্তু নিয়মানু-
।
সারে এটি তারষড়্‌জ অর্থাৎ সা হওয়া উচিত ছিল।

এটি হচ্ছে শুদ্ধাগীতির উদাহরণ অর্থাৎ সরল এবং ললিতস্বরসম্পন্ন গীত। অবশ্য সরল এবং ললিতস্বরসম্পন্ন বললে একটা কিছু ধারণা করবার মত স্পষ্ট বস্তু বোধগম্য হয় না কেননা সঙ্গীতমাত্রই ললিতস্বরসম্পন্ন। অতএব উদাহরণ থেকে শুদ্ধাগীতির প্রকৃত রূপটি অন্য গীত থেকে ভিন্ন করে বোঝবার উপায় নেই।

এর পর ষড়্‌জগ্রামরাগ। এটিও শুদ্ধাগীতির অন্তর্ভুক্ত। এটির উৎপত্তি-স্থল ষড়্‌জমধ্যমা জাতি। গ্রহ এবং অংশ হচ্ছে তারষড়্‌জ। গ্রামরাগটি সম্পূর্ণ জাতীয়। ন্যাসস্বর হচ্ছে মধ্যম, অপন্যাস ষড়্‌জ। আরোহণে শেষ স্বর হচ্ছে সা। এতে ষড়্‌জাদি মূর্ছনার প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং কাকলী নিষাদ ও অন্তরগান্ধারের প্রয়োগ হয়। গ্রামরাগটি বর্ষায় প্রযুক্ত হয় এবং দিবসের প্রথম যামে অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয়।

শুদ্ধকৈশিক গ্রামরাগ শুদ্ধাগীতির অন্তর্ভুক্ত। এটি কার্মারবী এবং কৈশিকী থেকে সঞ্জাত অর্থাৎ মধ্যমগ্রামসম্বন্ধীয়। গ্রহ এবং অংশস্বর—তারষড়্‌জ, অন্ত্যস্বর—পঞ্চম। কাকলীনিষাদের ব্যবহার হয়। এতে ষড়্‌জাদি মূর্ছনার প্রয়োগ হয়ে থাকে। রস—বীর, রৌদ্র এবং অদ্ভুত। নাট্যপ্রয়োগ নির্বহণসন্ধি। কাল—শিশির, প্রথম যাম।

ভিন্নকৈশিকমধ্যম গ্রামরাগটি ভিন্নাগীতির অন্তর্ভুক্ত। গ্রহ, অংশস্বর হচ্ছে ষড়্‌জ। ন্যাসস্বর মধ্যম—ষড়্‌জও হতে পারে। ষড়্‌জাদ্য মূর্ছনার ব্যবহার হয়। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। রস—বীর, অদ্ভুত। কাল—দিবসের প্রথম যাম।

ভিন্নতান গ্রামরাগটি ভিন্নাগীতির অন্তর্ভুক্ত। এটি মধ্যমগ্রামের মধ্যমা এবং পঞ্চমী—এই দুই জাতির মিশ্রণে সঞ্জাত। এর গ্রহ এবং অংশস্বর পঞ্চম। ঋষভের প্রয়োগ অল্প। অন্ত্যস্বর মধ্যম কিন্তু মধ্যমের প্রয়োগও এতে অল্পই হয়ে থাকে। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ বিধেয়। সঞ্চারী বর্ণের প্রসন্নাদি অলঙ্কারে এই রাগের শোভা বর্ধিত হয়। রস—করুণ। কাল—দিবসের প্রথম যাম।

ভিন্নকৈশিক গ্রামরাগটি মধ্যমগ্রামস্থ ভিন্নাগীতির অন্তর্ভুক্ত। এটি

কৈশিকী এবং কার্মারবী এই দুটি জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। এর অংশ এবং অপন্যাস স্বর ষড়্‌জ। এটি সম্পূর্ণজাতীয়। কাকলীনিষাদ প্রযুক্ত হয়। আরোহণে প্রসন্নমধ্য অলঙ্কার যুক্ত হয়। মূর্ছনা—ষড়জাদ্য উত্তরমন্দ্রা। রস—বীর। কাল—মধ্যমযাম।

গৌড়পঞ্চম গ্রামরাগটি ষড়্‌জগ্রামস্থ ধৈবতী এবং ষড়্‌জমধ্যমা জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রহ এবং অংশস্বর ধৈবত, অন্ত্যস্বর মধ্যম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে গৌড়পঞ্চম গ্রামরাগে পঞ্চম স্বরটি বর্জিত। এক্ষেত্রে কেন যে এর নাম গৌড়পঞ্চম হল সেটা অনুমান করা শক্ত। কাকলীনিষাদ এবং অন্তরগান্ধার প্রযুক্ত হয়। আরোহণে প্রসন্নমধ্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। রস—ভয়ানক, বীভৎস। প্রয়োগ—বিপ্রলম্ভ, উদ্ভট পরিস্থিতি বা নর্তন। কাল-গ্রীষ্ম, মধ্যম যাম।

গৌড়কৈশিক গ্রামরাগটি কৈশিকী এবং ষড়্‌জমধ্যমা জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ষড়্‌জ এবং মধ্যম—এই দুটি গ্রামের মিশ্রণ হয়েছে কেন না কৈশিকী মধ্যম গ্রামের এবং ষড়্‌জমধ্যমা ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে এই দুই গ্রামের মিশ্রণটি কিভাবে ঘটল? কল্লিনাথ এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এর গ্রহ এবং অংশস্বর ষড়্‌জ হওয়াতে এতে যে ষড়্‌জাদ্য মূর্ছনার ব্যবহার হয় সেটি হচ্ছে ষড়্‌জ-গ্রামের উত্তরমন্দ্রা। অপরদিকে এতে মধ্যমগ্রাম অনুযায়ী ত্রিশ্রুতিক পঞ্চম এবং চতুঃশ্রুতিক ধৈবতের প্রয়োগ হতে পারে (সং.র:—পৃ ২৯ অ্যাডায়ার সংস্করণ)।

গৌড়কৈশিক গ্রামরাগে গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে—সা। অন্ত্যস্বর পঞ্চম। কাকলীনিষাদের ব্যবহার হতে পারে। এটি সম্পূর্ণজাতীয়। আরোহণে প্রসন্নাদি অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। রস—করুণ, বীর রৌদ্র, এবং অদ্ভুত। কাল —দিবসের মধ্যম যাম।

বেসরষাড়ব গ্রামরাগটি ষড়্‌জমধ্যমা জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি সম্পূর্ণজাতীয়। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর - মধ্যম। কাকলী নিষাদ এবং অন্তরগান্ধারের প্রয়োগ হয়। আরোহীতে প্রসন্নাদি অলঙ্কার এবং মধ্যমাদ্য মূর্ছনার ব্যবহার হয়। রস—শান্ত, শৃঙ্গার। কাল দিবসের অপরার্ধ।

বোট্ট নামক গ্রামরাগটি পঞ্চমী এবং ষড়্‌জমধ্যমা জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। এটি সম্পূর্ণজাতীয়। গ্রহ এবং অংশস্বর—পঞ্চম। অন্ত্যস্বর—মধ্যম।

গান্ধারের প্রয়োগ অল্প। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়। পঞ্চমাদি মূর্ছনা ব্যবহৃত হয়। এই মূর্ছনাটি হৃষ্যকা হওয়াই বিধেয় কেন না এটি মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আরোহীতে প্রসন্নান্ত অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। রস—হাস্য, শৃঙ্গার। কাল—দিবসের শেষ প্রহর।

মালবপঞ্চম গ্রামরাগটি মধ্যমা এবং পঞ্চমী জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। গ্রহ এবং অংশস্বর—পঞ্চম। মূর্ছনা—মধ্যমগ্রামের হৃষ্যকা। আরোহীতে প্রসন্নান্ত অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। গান্ধারের ব্যবহার অল্প। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়। রস—হাস্য, শৃঙ্গার। প্রয়োগ—বিপ্রলম্ভ, কঞ্চুকীপ্রবেশ।

রূপসাধার গ্রামরাগটি সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত। এটি নৈষাদী এবং ষড়্জমধ্যমার মিশ্রণে উৎপন্ন। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—মধ্যম। সম্পূর্ণজাতীয়। ঋষভ এবং পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প। কাকলীনিষাদের ব্যবহার আছে। আরোহণে প্রসন্নমধ্য অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। মূর্ছনা—ষড়্জাদ্য। রস—বীর, অদ্ভুত।

শক গ্রামরাগটি সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত। ষাড়জী এবং ধৈবতী জাতির মিশ্রণে এটি উৎপন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণজাতীয়। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। কাকলীনিষাদ এবং অন্তরগান্ধার প্রযুক্ত হয়। মূর্ছনা—ষড়্জাদ্য। আরোহীতে প্রসন্নমধ্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। রস—বীর। বিনিয়োগ—নির্বহণসন্ধি।

সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত ভম্মানপঞ্চম গ্রামরাগটি শুদ্ধমধ্যমা জাতি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। গ্রহ এবং অংশস্বর—ষড়্জ। ন্যাসস্বর—মধ্যম। সম্পূর্ণজাতীয়। গান্ধারের ব্যবহার অল্প। কাকলীনিষাদের ব্যবহার আছে। মূর্ছনা—ষড়্জাদিক। অলঙ্কার—আরোহীবর্ণের প্রসন্নমধ্য। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত। বিনিয়োগ-নাটকে পথভ্রান্ত বা বনভ্রান্ত অবস্থা।

নর্ত গ্রামরাগটি সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত এবং মধ্যমা ও পঞ্চমীর সহযোগে উৎপন্ন। গ্রহ এবং অংশস্বর—পঞ্চম। ন্যাসস্বর-মধ্যম। মূর্ছনা—পঞ্চমাদিক। গান্ধারের ব্যবহার অল্প। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়। অলঙ্কার—সঞ্চারীবর্ণের প্রসন্নমধ্য। রস—হাস্য, শৃঙ্গার। বিনিয়োগ—নৃত্যাদি অনুষ্ঠান। কল্লিনাথের বিচারে চতুঃশ্রুতিক পঞ্চমের প্রয়োগ হলে রাগটি ষড়্জগ্রাম সম্বন্ধীয় হবে।

ষড়্জকৈশিক গ্রামরাগটি সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত। এটি কৈশিকী

জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রহস্বর—ঋষভ। অংশস্বর—ষড়্জ। নিষাদ এবং গান্ধার বিষয়ে ন্যাসস্বর হয়। ঋষভের প্রয়োগ অল্প। মন্দ্রষড়্জ এবং মন্দ্রগান্ধারের ব্যবহার হয়। অলঙ্কার—আরোহীবর্ণের প্রসন্নাদি। মূর্ছনা—ষড়্জাদিক। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত।

এর পর শার্ঙ্গদেব অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গের জনক গ্রামরাগগুলির উল্লেখ করেছেন। এই উপলক্ষে প্রথমে শুদ্ধাগীতির অন্তর্ভুক্ত মধ্যম গ্রামরাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মধ্যমগ্রাম নামক গ্রামরাগটি গান্ধারী, মধ্যমা এবং পঞ্চমী জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ্রহ এবং অংশস্বর—মন্দ্রষড়্জ। ন্যাসস্বর—মধ্যম। মূর্ছনা-সৌবীর। অলঙ্কার—আরোহণে প্রসন্নাদি। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়। রস—হাস্য, শৃঙ্গার। বিনিয়োগ - মুখসন্ধি।

গ্রামরাগ মধ্যমগ্রাম থেকে মধ্যমাদি নামক রাগাঙ্গের উদ্ভব হয়েছে। এর লক্ষণও মধ্যমগ্রামের মতই কেবল গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে মধ্যম। গ্রীষ্মের প্রথম প্রহরে এটি গাইবার নিয়ম। মধ্যমগ্রামে আরোহণে প্রসন্নাদি অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় এবং সৌবীর মূর্ছনার প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে কল্লিনাথ টীকায় বলছেন যে ম̊া ম̊া মা—এই অলঙ্কারটির প্রয়োগ হবে কেননা এখানে গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে মধ্যম। সাধারণতঃ, স̊া স̊া, সা—এইটিই হচ্ছে প্রসন্নাদি অলঙ্কার কিন্তু মধ্যমের প্রাধান্য থাকাতে এখানে ম̊া ম̊া মা—এই অলঙ্কারটিকেই প্রসন্নাদি বলে ধরতে হবে।

এর পরে গ্রামরাগ মালবকৈশিক।

এই রাগটি কৈশিকী জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর—ষড়্জ। এতে কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়। মূর্ছনা ষড়্জাদিক। অলঙ্কার—আরোহণে প্রসন্নমধ্য। বিনিয়োগ—বিপ্রলম্ভ। কাল—হেমন্ত, দিবসের শেষ প্রহর।

মালবশ্রী রাগাঙ্গটি মালবকৈশিক গ্রামরাগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এরও গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস স্বর হচ্ছে ষড়্জ কিন্তু এই ষড়্জ কেবল মন্দ্র এবং তারস্থানে প্রযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে ষড়্জ অংশস্বর হলেও অপরাপর স্বরগুলি দুর্বল নয় তাদেরও প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। এই লক্ষণটিকে শার্ঙ্গদেব বলছেন

—'সমস্বরা'। কল্লিনাথ এই শব্দটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন যে স্বরের সমত্ব অর্থে এখানে অল্পত্ব, বহুত্ব দ্বারা যে বৈষম্য হয় তার অভাব বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ ষড়্জ অংশস্বর হওয়া সত্ত্বেও অপরাপর স্বরগুলি সমান বলসহকারেই প্রযুক্ত হবে।

গ্রামরাগ ষাড়ব।

এটি শুদ্ধাগীতিতে আশ্রিত। শার্ঙ্গদেব বলছেন যে বিকারী-মধ্যমা জাতি থেকে ষাড়ব নামক গ্রামরাগের উদ্ভব হয়েছে। কল্লিনাথ ব্যাখ্যায় বলছেন মধ্যমাজাতির শুদ্ধভেদ এবং বিকৃতভেদ তেইশটি। শুদ্ধাবস্থাকে পরিত্যাগ করে বিকৃতাবস্থাপ্রাপ্ত মধ্যমাই হচ্ছে বিকারিমধ্যমা। ষাড়ব নামক গ্রামরাগটি এই বিকারিমধ্যমা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এই গ্রামরাগের অংশ এবং ন্যাসস্বর-মধ্যম, কিন্তু গ্রহস্বরটি হচ্ছে তার সপ্তকের মধ্যম। গান্ধার এবং পঞ্চম—এই দুটি স্বর দুর্বল। গান্ধারটি হচ্ছে অন্তরগান্ধার এবং নিষাদ হচ্ছে কাকলী-নিষাদ। মধ্যমাদিক মূর্ছনার প্রয়োগ হয়। অলঙ্কার—প্রসন্নান্ত। রস—হাস্য, শৃঙ্গার। বিনিয়োগ—পূর্বরঙ্গ। কাল—পূর্বযাম।

এই গ্রামরাগটিতে গান্ধার এবং পঞ্চম দুর্বল বটে কিন্তু বর্জিত নয়। অতএব সিংহভূপালের টীকায় 'গান্ধারপঞ্চমহীন' এই উক্তি যথার্থ নয়। কেন যে সপ্তস্বর হওয়া সত্ত্বেও এর নাম ষাড়ব হল এর কারণ নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়ে সিংহভূপাল মতঙ্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে নাটকের পূর্বরঙ্গে ষাড়বের প্রয়োগের জন্য ষাড়বকে অপর দুটি রাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। ব্যাপারটি মোটেই পরিষ্কার নয়, কেন না দুটি রাগ কি কি, তার উল্লেখ করা হয় নি এবং কেনই বা পূর্বরঙ্গে প্রয়োগের জন্য একে মুখ্য বলে স্বীকার করতে হবে তারও কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি।

ষাড়ব গ্রামরাগটি থেকে তোড়িকা নামক রাগাঙ্গের উদ্ভব হয়েছে। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর হচ্ছে মধ্যম। এতে তারসপ্তকের ষড়্জস্বর ব্যবহৃত হয় এবং পঞ্চমস্বর কম্পনযুক্ত হয়। এর গান্ধারটি মন্দ্রসপ্তকের গান্ধার। অপর স্বরগুলিও এই রাগাঙ্গে দুর্বল নয়। এদের শার্ঙ্গদেব 'সমেতরস্বর" বলেছেন। কল্লিনাথ বলছেন—সমা ইতরে স্বরা যস্যাং সা তথোক্তা। অস্যামংশত্বেন বহুলান্মধ্যমাদন্যস্বরাঃ প্রয়োগে মিথঃ সমবলা

ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ অংশস্বহেতু এই রাগাঙ্গে মধ্যমের বহুলত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু মধ্যম ছাড়া অপর স্বরগুলিও প্রয়োগের দিক থেকে সমবলসম্পন্ন।

বঙ্গাল নামক রাগাঙ্গটিও যাড়ব গ্রামরাগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর হচ্ছে মধ্যম। এটি হর্ষে বিনিযুক্ত হয়॥

গ্রামরাগ ভিন্নষড়্জ।

এটি ভিন্নাগীতিকে আশ্রয় করে আছে। এর উৎপত্তি ষড়্জদীচ্যবতী নামক জাতি থেকে। ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত। গ্রহ এবং অংশস্বর—ধৈবত। ন্যাসস্বর—মধ্যম। মূর্ছনা—উত্তরায়তা। অলঙ্কার—সঞ্চারীবর্ণের প্রসন্নান্ত বা মন্দ্রান্ত। অন্তরগান্ধার এবং কাকলীনিষাদ প্রযুক্ত হয়। রস--বীভৎস, ভয়ানক।

ভিন্নষড়্জ থেকে রাগাঙ্গ ভৈরবের উদ্ভব হয়েছে। এরও অংশস্বর ধৈবত এবং ন্যাসস্বর মধ্যম। এই রাগাঙ্গটিও ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত। একে সমস্বর বলা হয়েছে, অর্থাৎ অংশস্বর ধৈবত হওয়া সত্ত্বেও অপর প্রযোজ্য স্বরগুলি দুর্বল নয়। সার্বভৌমোৎসবে বা প্রার্থনায় এর ব্যবহার হয়। শার্ঙ্গদেব বা টীকাকারদ্বয় সার্বভৌমোৎসবের কোন পরিচয় দেন নি। এটা লক্ষ করা যায় যে গ্রামরাগ ভিন্নষড়্জের প্রয়োগ হচ্ছে বীভৎস এবং ভয়ানক রসে কিন্তু তার থেকে উদ্ভূত ভৈরবরাগাঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে উৎসব এবং প্রার্থনায়। রসের দিক থেকে জন্য ও জনকরাগের এরকম তারতম্য কেন হল তার কোন ব্যাখ্যা নেই। বস্তুতঃ এইরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে যার সদুত্তর মেলে না।

গ্রামরাগ ভিন্নপঞ্চম।

এটি মধ্যমা এবং পঞ্চমী—এই দুই জাতির সহযোগে উৎপন্ন হয়েছে। এর গ্রহ এবং অংশস্বর ধৈবত। ন্যাসস্বর পঞ্চম। এতে কখনো কখনো কাকলী-নিষাদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অলঙ্কার—সঞ্চারী বর্ণের প্রসন্নান্ত। মূর্ছনা—পৌরবী। রস—ভয়ানক, বীভৎস। বিনিয়োগ--নাটকে সূত্রধারপ্রবেশ।

বরাটী নামক রাগাঙ্গটি এই গ্রামরাগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অংশস্বর ধৈবত। গ্রহ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। মন্দ্রমধ্যম এবং তারধৈবতের প্রয়োগ হয়। অপরস্বরগুলি সমবলসম্পন্ন। রস—শৃঙ্গার।

এর পর শার্ঙ্গদেব গুর্জরীরাগের জনক পঞ্চমষাড়ব নামক উপরাগটির পরিচয় দিয়েছেন। গুর্জরীরাগটি কোনও গ্রামরাগ থেকে উদ্ভূত হয় নি। এই উপরাগটি মধ্যগ্রামসম্বন্ধীয় এবং ধৈবতী ও আর্ষভী—এই দুই জাতির

সহযোগে উৎপন্ন। গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর ঋষভ। তবে, কখনো কখনো ন্যাসস্বর মধ্যমও হয়ে থাকে। কাকলীনিষাদের প্রয়োগও কোনও ক্ষেত্রে হতে পারে। মূর্ছনা—কলোপনতা। অলঙ্কার—প্রসন্নাদি এবং প্রসন্নান্ত (আরোহণে)। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত। বিনিয়োগ—নারীহাস্য।

গুর্জরী বা গুর্জরিকা রাগাঙ্গের গ্রহ এবং অংশস্বর হচ্ছে ঋষভ। ন্যাসস্বর—মধ্যম। মধ্যসপ্তকের মধ্যম স্বর এবং তারসপ্তকের ঋষভ প্রযুক্ত হয়। এই রাগাঙ্গে ঋষভ এবং ধৈবতের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়।

গ্রামরাগ টক্ক ষড়্জমধ্যমা এবং ধৈবতী—এই দুই জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর ষড়্জ। কাকলীনিষাদ এবং অন্তরগান্ধারের ব্যবহার আছে। পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প। সঞ্চারী বর্ণের প্রসন্নান্ত অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। মূর্ছনা—উত্তরমন্দ্রা। বিনিয়োগ-রুদ্রের হর্ষ। কাল—বর্ষা, দিবসের শেষ প্রহর। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, যুদ্ধবীর। কল্লিনাথ টীকায় বলছেন বীররস তিন প্রকার—দানবীর, দয়াবীর এবং যুদ্ধবীর। এটি যুদ্ধবীরে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

টক্কের রাগাঙ্গ গৌড়ের গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর হচ্ছে নিষাদ। এটি পঞ্চমবর্জিত।

টক্কের আর-একটি রাগাঙ্গ হল কোলাহল। এতে টক্কের সব লক্ষণই প্রযোজ্য তবে স্বরগুলির তারগতি হয়। এইরকম তারস্বরের সার্থকতা কি এবং কি করেই বা এত চড়ায় গান গাওয়া হত তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তা ছাড়া সব স্বরই যদি তারগ্রামে গাওয়া হয় তাহলে সে তো শেষ পর্যন্ত টক্করাগেই পরিণত হল কেন না সপ্তক বদল করলেই আর কোন তফাৎ নেই। একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে টক্করাগটিকে যদি চড়ার দিকে গাওয়া হয় তাহলে সেটি "কোলাহল" হয়ে পড়বে। কোলাহল রাগটি তাহলে কিন্তু যথার্থই কোলাহলে পরিণত হবার সম্ভাবনা।

গ্রামরাগ হিন্দোল ষাড়্জী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, নৈষাদী এই পাঁচটি জাতির সহযোগে উৎপন্ন, অর্থাৎ এটি ষড়্জ এবং মধ্যমগ্রামের মিশ্রণে উদ্ভূত কেন না ষাড়্জী, নৈষাদী -এই দুটি জাতি ষড়্জগ্রামের অন্তর্গত এবং গান্ধারী, পঞ্চমী—এই দুটি মধ্যমগ্রামস্থ জাতি। শার্ঙ্গদেব বলছেন-ধৈবত্যার্ষভিকাবর্জ্যস্বরনামকজাতিজঃ। এর অর্থ হচ্ছে এই যে ধৈবতী এবং আর্ষভী—এই দুটি জাতিকে বর্জন করে অপর স্বরের নামে যে পাঁচটি জাতি পরিচিত,

অর্থাৎ ষাড়্‌জী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, নৈষাদী—এদের থেকেই হিন্দোল উৎপন্ন হয়েছে। বিকৃত জাতি বলতে ষড়্‌জ কৈশিকী প্রভৃতিকে বোঝায়—তাদের সঙ্গে হিন্দোলের সম্পর্ক নেই।

হিন্দোলে ঋষভ এবং ধৈবত—এই দুটি স্বর বর্জিত। গ্রহ, অংশ, ন্যাস-স্বর—ষড়্‌জ। অলঙ্কার—আরোহীবর্ণের প্রসন্নাদি; মূর্ছনা—মধ্যমগ্রামের শুদ্ধমধ্যা। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ হয়। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত।

হিন্দোলের দ্বিগ্রামত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব কেবলমাত্র মধ্যমগ্রামের শুদ্ধমধ্যা মূর্ছনাপ্রয়োগের কথা বলেছেন। কল্লিনাথ এ বিষয়ে আলোচনা করে বলছেন চতুঃশ্রুতিক পঞ্চমের প্রয়োগ হলে এটি ষড়্‌জগ্রামসম্বন্ধীয় হবে। কেউ কেউ ধৈবত লোপ পছন্দ করেন না এবং তার বদলে পঞ্চমের লোপ করতে চান। সে ক্ষেত্রেও গ্রামরাগটি ষড়্‌জগ্রামসম্বন্ধীয় হবে কেননা পঞ্চমের লোপে মধ্যমগ্রামত্ব ঘটতে পারে না। কেবল ঋষভের লোপ হলে চতুঃশ্রুতিক পঞ্চমের প্রয়োগে এটি ষড়্‌জগ্রামসম্বন্ধীয় গ্রামরাগ বলে পরিগণিত হবে।

বসন্ত নামক রাগাঙ্গটি হিন্দোল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। হিন্দোল ঔড়ব-জাতীয় কিন্তু বসন্ত সম্পূর্ণ-জাতীয় রাগাঙ্গ, অর্থাৎ এতে ঋষভ এবং ধৈবত বর্জিত নয়। অপরাপর লক্ষণ হিন্দোলের মত। বসন্তের অপর নাম দেশী হিন্দোল। এটি সম্ভোগে বিনিয়োগ করা হয়। কাল—বসন্ত, চতুর্থপ্রহর।

হিন্দোলের রস হচ্ছে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত—আর এই রাগ থেকে উদ্ভূত বসন্ত সম্ভোগে প্রযুক্ত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কিভাবে রসের বিচার হয়েছে সেটি বোঝা শক্ত। রত্নাকর অনুসারে সা এবং রে বীর, রৌদ্র এবং অদ্ভুত রসের উদ্দীপক, ধা বীভৎস রসের পরিচায়ক, গা এবং নি করুণরসের ব্যঞ্জনা করে; মা এবং পা হাস্য আর শৃঙ্গার রসবোধক। হিন্দোলের ক্ষেত্রে ঋষভ এবং ধৈবত ব্যবহৃত হয় না। অতএব এতে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, করুণ, হাস্য এবং শৃঙ্গার—এই সবগুলিই পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু শার্ঙ্গদেব কেবল বীর, রৌদ্র, এবং অদ্ভুত রসের কথাই বলেছেন। হয়ত বা ষড়্‌জ স্বরটি গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর হওয়ায় বীর, রৌদ্র এবং অদ্ভুত-রসের প্রাধান্য এতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু সেইরকম হলে বসন্তরাগের ক্ষেত্রে অন্যথা হওয়া উচিত নয়। বসন্তরাগে ঋষভ এবং ধৈবত—এই দুটি স্বরের যোগ হচ্ছে। এক একটি বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত; অপরটি বীভৎস রসের উদ্দীপক। এক্ষেত্রেও

ষড়্‌জস্বরের প্রাধান্য রয়েছে। পরন্তু তার সঙ্গে বীভৎস-রসেরও যোগ হয়েছে। অতএব এটি সম্ভোগে প্রযুক্ত হবার বিশেষ কারণ কি সেটা বোঝা যায় না। এটি যে একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই অথচ রস-বিনিয়োগের রীতিনীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ তেমন বিচার করেন নি। সাতটি স্বরের এককভাবে বিভিন্ন রসোদ্দীপক ক্ষমতা থাকলেও সমষ্টিগত-ভাবে প্রযুক্ত হলে সব মিলিয়ে একটা নতুন রসের সৃষ্টি হয় এটাই হচ্ছে মূলকথা, কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা সঙ্গীতসাহিত্যে পাওয়া যায় না। যাই হোক, তর্কের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র হলেও বসন্তকে আমরা শৃঙ্গার-বহির্ভূত রসে প্রয়োগের কথা ভাবতেই পারি না।

শুদ্ধগীতির অন্তর্ভুক্ত শুদ্ধকৈশিকমধ্যম গ্রামরাগটি ষড়্‌জমধ্যমা এবং কৈশিকী—এই দুই জাতির সহযোগে উৎপন্ন। এই গ্রামরাগটিকে ষড়্‌জ-গ্রামসমুৎপন্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে অথচ মধ্যমগ্রাম-সম্বন্ধীয় কৈশিকী জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়াতে এর সঙ্গে ষড়্‌জগ্রামের একটা বিরোধ ঘটছে। শার্ঙ্গদেব এই বিরোধের কোনো ব্যাখ্যা দেন নি কিন্তু টীকাকার কল্লিনাথ বিষয়টির বিচার করেছেন। তিনি বলছেন যে শুদ্ধকৈশিকমধ্যম গ্রামরাগটি ঋষভ এবং পঞ্চমবর্জিত ঔড়বজাতীয়। মধ্যমগ্রামে পঞ্চমের লোপ নেই কেননা পঞ্চমের বিকৃতিতেই মধ্যমগ্রামত্ব সম্ভব হয়। মতঙ্গের মতানুসারে মধ্যমগ্রামে ঋষভের লোপও নাকি স্বীকৃত হয় না। এই কারণেও এই রাগকে ষড়্‌জগ্রাম-সম্বন্ধীয় বলা যেতে পারে। মধ্যমগ্রামের সঙ্গে এই গ্রামরাগের সম্বন্ধ কোথায় বোঝাতে গিয়ে কল্লিনাথ বলছেন যে এর মূর্ছনাটি হবে মধ্যমগ্রামের

। । ।

সৌবীরী মূর্ছনা অর্থাৎ মা পা ধা নি সা রে গা, ষড়্‌জগ্রামের মৎসরী-কৃতা নয়। কেন সৌবীরী মূর্ছনার প্রয়োগ হবে এইটি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে যে এই মূর্ছনাটি না হলে এই গ্রামরাগের গ্রহ-এবং অংশ-স্বর তার-ষড়্‌জ উক্ত মূর্ছনার আয়ত্তাধীন হয় না। সাধারণ নিয়ম অনুসারে গ্রহ এবং অংশস্বর মূর্ছনার অন্তর্গত হওয়া উচিত। অতএব মধ্যমগ্রামের রীতি-অনুযায়ী এই গ্রামরাগটির তাবসপ্তকে ব্যাপকত্ব ঘটা সম্ভব হয়েছে। মধ্যম-গ্রামের একটি রীতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেও আকৃতি-অনুযায়ী রাগটিকে ষড়্‌জ-গ্রামসম্বন্ধীয় বলেই স্বীকার করতে হবে। কল্লিনাথ এই রাগের মধ্যমগ্রামত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলেও কৈশিকী নামক জাতির সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র

কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেন নি। তিনি কেবল বলেছেন এই মূর্ছনার ব্যবহারেই এর সঙ্গে কৈশিকীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। কৈশিকীর সঙ্গে কিন্তু শুদ্ধকৈশিকমধ্যম গ্রামরাগের লক্ষণে বিশেষ মিল নেই বরঞ্চ ষড়্জমধ্যমা জাতিতে ব্যবহৃত মধ্যমাস্ত মূর্ছনাকে মধ্যমগ্রামে রূপান্তরিত করবার নির্দেশ কল্লিনাথ দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব এই মূর্ছনাটিকে বিশেষভাবে মধ্যমাস্ত মূর্ছনা বলেন নি তিনি কেবল বলেছেন "আন্তমূর্ছনয়া যুতঃ"। কল্লিনাথ এটিকে মধ্যমাস্ত মূর্ছনা বলে ব্যাখ্যা করছেন।

শুদ্ধকৈশিকমধ্যম গ্রামরাগের ন্যাসস্বর মধ্যম। এতে কাকলী নিষাদের প্রয়োগ হয় এবং গান্ধারের ব্যবহার অল্প। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত। কাল—পূর্বযাম। বিনিয়োগ—নির্বহণ।

ধন্নাসিকা রাগাঙ্গটি শুদ্ধকৌশিকমধ্যম গ্রামরাগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরও গ্রহ, অংশস্বর-ষড়্জ এবং ন্যাসস্বর—মধ্যম। ঋষভ বর্জিতস্বর। গান্ধার এবং পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প। রস—বীর।

বেবগুপ্ত।

এটি একটি উপরাগ এবং রাগাঙ্গ দেশীর জনক। এর উৎপত্তি মধ্যমা এবং আর্ষভী—এই দুই জাতি থেকে। শার্ঙ্গদেব এটিকে ষড়্জ গ্রামসম্বন্ধীয় বলেছেন কিন্তু মধ্যমা নামক মধ্যমগ্রামসম্বন্ধীয় জাতির সঙ্গে যোগ থাকাতে এটির দ্বিগ্রামত্ব অস্বীকার করা যায় না। কল্লিনাথ বলছেন যে চতুঃশ্রুতিক পঞ্চমের ব্যবহারে এটি ষড়্জগ্রামসম্বন্ধীয় হবে এবং মধ্যমগ্রামসম্বন্ধীয় হবার জন্য এই রাগটির তার-ব্যাপকত্ব থাকবে অর্থাৎ চড়ার দিকে ব্যাপ্তি থাকবে। কল্লিনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে বোঝা যায় যে মধ্যমগ্রাম সম্বন্ধীয় রাগগুলির তার-ব্যপ্তি এবং ষড়্জগ্রামসম্বন্ধীয় রাগগুলির মন্দ্রব্যাপ্তি হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এই উপরাগের গ্রহ, অংশস্বর হচ্ছে ঋষভ এবং ন্যাসস্বর মধ্যম। রস—বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত। উদ্ভট আচরণকারী পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ হয়।

রাগাঙ্গ দেশীর গ্রহ, অংশ এব ন্যাস-স্বর হচ্ছে ঋষভ। পঞ্চম বর্জিতস্বর। মধ্যম এবং নিষাদের প্রচুর ব্যবহার হয়। গান্ধার মন্দ্রস্থানীয়। করুণ রসে প্রযোজ্য।

গ্রামরাগ গান্ধারপঞ্চম।

এটি সাধারণী গীতির অন্তর্ভুক্ত এবং মধ্যমগ্রামস্থ গান্ধারী ও রক্তগান্ধারী জাতিদ্বয়ের সহযোগে উৎপন্ন হয়েছে। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস-স্বর—গান্ধার।

মূর্ছনা—হরিণাশ্বা। অলঙ্কার-সঞ্চারীবর্ণের প্রসন্নমধ্য। কাকলীনিষাদ প্রযুক্ত হয়। রস—অদ্ভুত, হাস্য, বিস্ময়, করুণ।

রাগাঙ্গ দেশাখ্য গান্ধারপঞ্চম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ঋষভ বর্জিতস্বর। গান্ধার স্ফুরিত। নিষাদ মন্দ্রস্থানীয়। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর-গান্ধার। অন্যান্য স্বরও প্রবল।

এর পর শার্ঙ্গদেব অধুনাপ্রসিদ্ধ ভাষাঙ্গ রাগগুলির বর্ণনায় আসছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমে ভাষাঙ্গ ডোম্বকৃতির জনক ভাষারাগ ত্রবণার পরিচয় দিয়েছেন। ত্রবণা হচ্ছে গ্রামরাগ ভিন্নষড়্জের ভাষা। এর গ্রহ, অংশ, ন্যাস-স্বর—ধৈবত। এই ধৈবতটি মন্দ্রধৈবতও হতে পারে। ধা, নি, সা—এই তিনটি স্বর গমকযুক্ত এবং এদের বহুল প্রয়োগ হয়। গান্ধার এবং মধ্যমের দ্বিগুণত্ব ঘটে। এই দ্বিগুণত্ব সম্বন্ধে কল্লিনাথ যা বলেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রহস্বর ধৈবত থেকে আরম্ভ করে যে মধ্যমটি পাওয়া যাবে সেই মধ্যমটির তারসপ্তক পর্যন্ত ব্যাপ্তি হবে। এই তারমধ্যমটি গান্ধারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ধৈবতটি হবে মন্দ্রসপ্তকের এবং মধ্য ও তার এই দুই সপ্তকের মধ্যম ব্যবহৃত হওয়াতে মধ্যমের দ্বিগুণত্ব ঘটল। অনুরূপভাবে গান্ধারেরও দ্বিগুণত্ব ঘটছে কেননা এটি মধ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কল্লিনাথ বলছেন—"গমেতিসমভিব্যহারেণ মধ্যমস্য বহুত্বমপীত্যবগন্তব্যম্।" এই গান্ধারমধ্যমের প্রয়োগও খুব অল্প নয়, তবে ধা, নি, সা-র মত এত বহুল প্রয়োগ হবে না। ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিতস্বর।

গ্রামরাগ ককুভ।

এটি সাধারণী গীতির পর্যায়ভুক্ত এবং মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী এই তিনটি জাতির সহযোগে উৎপন্ন। এটি উভয়গ্রামসম্বন্ধীয় রাগ। গ্রহ এবং অংশস্বর—ধৈবত। ন্যাসস্বর—পঞ্চম। ধৈবতাদিক মূর্ছনার ব্যবহার হয়। অলঙ্কার—আরোহীবর্ণের প্রসন্নমধ্য। রস—করুণ। কাল—শরৎ। কল্লিনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে এটিকে ষড়্জগ্রামসম্বন্ধীয় করতে হলে চতুঃশ্রুতিক পঞ্চমের ব্যবহার করতে হবে।

রগন্তিকা হচ্ছে ককুভের ভাষারাগ। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত এবং এই স্বরটি স্ফুরিতভাবে ব্যবহৃত হয়। অপন্যাস স্বর—পঞ্চম। মধ্যম স্বরটির তার-গতি নিষিদ্ধ।

রাগন্তিকার ভাষাঙ্গ হচ্ছে সাবরী। গ্রহ, অংশ-স্বর—মধ্যম। ন্যাসস্বর

ধৈবত। তার-গান্ধার এবং মন্দ্রমধ্যমের প্রয়োগ হয়। ষড়্‌জের ব্যবহার স্বল্প। পঞ্চম বর্জিতস্বর। রস করুণ।

ভোগবর্ধনী নামক রাগটি ককুভের বিভাষা। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর ধৈবত। অপন্যাসস্বর গান্ধার। তার এবং মন্দ্র উভয় গান্ধারের ব্যবহার আছে। ঋষভ বর্জিতস্বর। ধৈবত, নিষাদ, গান্ধার, মধ্যম এবং পঞ্চম—এই স্বরগুলির বহুল প্রয়োগ হয়।

বেলাবলী নামক ভাষাঙ্গরাগটি ভোগবর্ধনী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এতে তারধৈবত এবং মন্দ্রগান্ধার ব্যবহৃত হয়। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। অপরাপর স্বরেরও প্রাধান্য আছে। বিনিয়োগ—বিপ্রলম্ভ।

ভাষাঙ্গ প্রথমমঞ্জরীও ভোগবর্ধনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—পঞ্চম। তারসপ্তকের ঋষভ এবং ধৈবত প্রযুক্ত হয়। গান্ধার এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ ঘটে। মন্দ্রগান্ধারের ব্যবহারও আছে। বিনিয়োগ —উৎসব।

এর পর ভাষাঙ্গরাগ আদিকামোদিকার জনক ভিন্নষড়্‌জের ভাষা বঙ্গাল এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। অপন্যাসস্বর—গান্ধার। শার্ঙ্গদেব বলছেন ঋষভ এবং মধ্যম দীর্ঘ হবে। বিলম্বিত প্রয়োগকে দীর্ঘ বলা হয়। এই রাগে মন্দ্রধৈবতের প্রয়োগ হয়। এটি উদ্দীপনার্থে প্রযুক্ত হয়।

আদিকামোদিকার গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। এতে মন্দ্রমধ্যম এবং তারগান্ধারের প্রয়োগ হয়। অপরাপর স্বরও সমবলসম্পন্ন। গুরু আজ্ঞা দিচ্ছেন এরকম পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ হয়।

এর পরে ভাষাঙ্গ নাগধ্বনির জনক টক্কভাষা বেগরঞ্জীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই রাগটি ধৈবত এবং পঞ্চম বর্জিত। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্‌জ। মন্দ্রনিষাদের প্রয়োগ হয়। নিষাদ, ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ভাষাঙ্গ নাগধ্বনির গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর হচ্ছে ষড়্‌জ। ধৈবত এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর। রস--বীর।

গ্রমরাগ সৌবীর।

এটি বেসরা বা রাগগীতির অন্তর্ভুক্ত এবং ষড়্‌জমধ্যমা জাতি থেকে উৎপন্ন। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্‌জ। মূর্ছনা—ষড়্‌জাদিক। অলঙ্কার

—আরোহীবর্ণের প্রসন্নাদি। সংযত তপস্বীগণের প্রবেশে বা গৃহীদের প্রবেশে এই রাগ প্রযোজ্য। রস—শান্ত, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত।

এই গ্রামরাগের ভাষা হচ্ছে সৌবীরী। গ্রহ, এবং ন্যাসস্বর—ষড়্‌জ। ষড়্‌জ-ধৈবত সম্বাদ হয় অথবা ঋষভ-ধৈবতের সম্বাদও হতে পারে। মধ্যমের বহুল প্রয়োগ হয়।

সৌবীরী ভাষা থেকে বরাটিকা বা বটুকীর উৎপত্তি হয়েছে। এতে ধৈবত, নিষাদ এবং পঞ্চমের অধিক ব্যবহার হয়। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস-স্বর—ষড়্‌জ। তারষড়্‌জের প্রয়োগ হয়। রস—শান্ত।

অতঃপর ভাষাঙ্গ নট্টার জনক হিন্দোলভাষা পিঞ্জরীর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এই ভাষারাগটির অংশস্বর গান্ধার। ন্যাস-স্বর—ষড়্‌জ। নিষাদ বর্জিত স্বর।

নট্টা নামক ভাষাঙ্গ রাগটি একই রকম। তারগান্ধার এবং তারপঞ্চমের প্রয়োগ হয়।

ভাষাঙ্গ কর্ণাটবঙ্গাল টক্কভাষা বেগরঞ্জীর অঙ্গ। এতে পঞ্চমের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অংশস্বর—গান্ধার। ন্যাসস্বর—ষড়্‌জ। রস—শৃঙ্গার।

এর পর অধুনাপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াঙ্গরাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ক্রিয়াঙ্গ রামকৃতিতে ষড়্‌জ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম পর্য্যন্ত পাঁচটি স্বর তার এবং মন্দ্র উভয় সপ্তকের হতে পারে কিন্তু মধ্যসপ্তকের হবে না। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস-স্বর—ষড়্‌জ। ঋষভ এবং ষড়্‌জের বহুল প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ভাষাঙ্গ গৌড়কৃতির গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস স্বর—ষড়্‌জ। মধ্যম এবং পঞ্চমের বহুল প্রয়োগ হয়। ঋষভ এবং ধৈবত বর্জিত স্বর। মন্দ্রপঞ্চম এবং তারমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়াঙ্গ দেবকৃতির গ্রহস্বর ধৈবত। অংশ এবং ন্যাস স্বর—ষড়্‌জ। ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর। অপরাপর স্বরগুলিও প্রবল। মন্দ্রনিষাদের প্রয়োগ হয়। মধ্যমের বাহুল্য আছে

এর পর উপাঙ্গ রাগগুলির পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

বরাটী থেকে ছটি উপাঙ্গ রাগের উৎপত্তি হয়েছে—কৌন্তলী, দ্রাবিড়ী সৈন্ধবী, উপস্থান, হতস্বরা এবং প্রতাপ।

কৌন্তলীবরাটীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ষড়্‌জ। মন্দ্রষড়্‌জের

প্রয়োগ হয়। ধৈবত কম্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়। নিষাদের বাহুল্য আছে। বিনিয়োগ – রতি বা শৃঙ্গার।

দ্রাবিড়ীবরাটীর গ্রহ, অংশ ন্যাস স্বর – ষড়্জ। ঋষভ স্ফুরিত। মন্দ্র-নিষাদের বহুল প্রয়োগ হয়।

সৈন্ধবীবরাটীর গ্রহ, অংশ ন্যাসস্বর -- ষড়্জ। ষড়্জ এবং ধৈবত কম্পনযুক্ত। গান্ধারের বাহুল্য ঘটে। শার্ঙ্গদেবের মতে মন্দ্রমধ্যমের প্রয়োগ হয়। রস—শৃঙ্গার।

উপস্থানবরাটীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস স্বর—ষড়্জ। মন্দ্রমধ্যম, মন্দ্র-নিষাদ এবং মন্দ্রধৈবতের প্রয়োগ হয়।

হতস্বরাবরাটীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর – ষড়্জ। পঞ্চম এবং ষড়্জ কম্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়। মন্দ্রধৈবত প্রযুক্ত হয়।

প্রতাপবরাটীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস স্বর—ষড়্জ। মন্দ্রধৈবত ব্যবহৃত হয়। পঞ্চমের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

রাগাঙ্গ তোডিকার উপাঙ্গরাগ হচ্ছে ছায়াতোডি এবং তৌরুষ্কতোড়ি। তোডিকার ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত হলে সেটি ছায়াতোডিতে পরিণত হয়। তৌরুষ্কতোডিতে নিষাদ এবং ধৈবতের বহুল প্রয়োগ হয়। গান্ধারের প্রয়োগ অল্প।

শার্ঙ্গদেব রাগাঙ্গ গুর্জরীর চারটি উপাঙ্গের উল্লেখ করেছেন— মহারাষ্ট্রী, সৌরাষ্ট্রী, দক্ষিণা এবং দ্রাবিডী। এর মধ্যে তিনটির পরিচয় তিনি দিয়েছেন দ্রাবিডীর পরিচয় দেন নি।

গুর্জরী থেকে পঞ্চম বর্জিত করে মন্দ্রনিষাদের প্রয়োগ করলে সেটি হবে উপাঙ্গ মহারাষ্ট্রগুর্জরী। এর অংশ এবং ন্যাসস্বর ঋষভ।

রাগাঙ্গ গুর্জরীর মধ্যমটি কম্পিতভাবে প্রযুক্ত হলে এবং অপর স্বরগুলি তাড়িতভাবে ব্যবহৃত হলে সেটি হবে দক্ষিণাগুর্জরী।

ভাষাঙ্গ বেলাবলীর চারটি উপাঙ্গ—তুচ্ছী (তুচ্ছীল), খন্তাইতি, ছায়া-বেলাবলী এবং প্রতাপবেলাবলী।

উপাঙ্গ তুচ্ছীর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর -ধৈবত। ষড়্জ এবং পঞ্চম আন্দোলিতভাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যম বর্জিত স্বর। বিনিয়োগ—বিপ্রলম্ভ।

উপাঙ্গ খন্তাইতির অংশ এবং ন্যাসস্বর—নিষাদ। মধ্যম এবং নিষাদ আন্দোলিতভাবে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম বর্জিত স্বর। রস—শৃঙ্গার।

উপাঙ্গ ছায়াবেলাবলী এবং প্রতাপবেলাবলীর লক্ষণ ভাষাঙ্গ বেলাবেলীর ন্যায়। এদের গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস-স্বর—ধৈবত। ছায়াবেলাবলীতে মন্দ্রমধ্যমটি কম্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতাপবেলাবলী ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত। এর স্বরগুলিও আহত বা কম্পিত ভাবে ব্যবহৃত হয়।

উপাঙ্গ ভৈরবের উদ্ভব হয়েছে রাগাঙ্গ ভৈরব থেকে। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস-স্বর—ধৈবত। তার এবং মন্দ্র উভয় গান্ধারের ব্যবহার হয়। ধৈবত এবং গান্ধার ছাড়া অপর স্বরগুলিরও প্রায় সমান প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উপাঙ্গ কামোদসিংহলী ভাষাঙ্গ কামোদ (আদিকামোদিকা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর লক্ষণও উক্ত ভাষাঙ্গের ন্যায়, কেবল এই উপাঙ্গে মন্দ্র-মধ্যমের প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং ধৈবত কম্পনযুক্ত হয়।

উপাঙ্গ ছায়ানট্টার উদ্ভব হয়েছে ভাষাঙ্গ নট্টা থেকে। নট্টার সঙ্গে এর প্রভেদ হচ্ছে এই যে এতে মন্দ্রপঞ্চমের প্রয়োগ হয় এবং নিষাদ, গান্ধার কম্পনযুক্ত হয়। অপর লক্ষণ নট্টার অনুরূপ।

এর পর উপাঙ্গ রামকৃতির জনক টক্কভাষা কোলাহলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই ভাষারাগটির গ্রহ এবং অংশস্বর - ষড়্জ। পঞ্চম বর্জিত স্বর। মন্দ্রষড়্জ এবং মন্দ্রধৈবতের প্রয়োগ হয়। মাধ্যমের বহুল প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রাগটি গমকসহযোগে গাওয়া হয়। বিনিয়োগ—কলহ।

উপাঙ্গ রামকৃতির অংশস্বর মধ্যম এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। পঞ্চম বর্জিত-স্বর। এটি টক্কভাষা থেকে উৎপন্ন হলেও একে ভাষাঙ্গ রাগ বলে স্বীকার করা হয় নি; একে বলা হয়েছে উপাঙ্গ রাগ। জনকরাগের সঙ্গে আঙ্গিকের দিক দিয়ে অতিসামীপ্যহেতু এটি মূলত ভাষাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও উপাঙ্গ বলে আখ্যাত হয়েছে। এই 'অতিসামীপ্য' শব্দটির ব্যাখ্যা করে কল্লিনাথ বলছেন—সামীপ্যমত্র সাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্। তেন যত্র কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যং তত্র উপাঙ্গত্বম্। যত্রাঙ্গত্বসাদৃশ্যংতত্রোপাঙ্গত্বম্ ইতি ন্যায়েন অত্র উপাঙ্গত্বং চ নির্ণীতমিতি। অর্থাৎ সামীপ্য অর্থে এখানে সাদৃশ্য বোঝাচ্ছে। যেখানে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য বর্তমান সেখানেই উপাঙ্গত্ব প্রযোজ্য। শার্ঙ্গদেব এই রাগের উপাঙ্গত্ব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন।

এর পর উপাঙ্গ ভল্লাতিকা বা বল্লাতার জনক হিন্দোলভাষা ছেবাটীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভাষারাগ ছেবাটীর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—

ষড়্জ। অপন্যাসস্বর—গান্ধার। ধৈবতের বহুল প্রয়োগ হয়। মন্দ্রষড়্জ, মন্দ্রগান্ধার এবং মন্দ্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঋষভ বর্জিত স্বর।

উপাঙ্গ ভল্লাতিকা বা বল্লাতার গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। এতে মন্দ্রধৈবত, তারষড়্জ এবং তারগান্ধারের প্রয়োগ হয়। গমকের ব্যবহার আছে। ঋষভ বর্জিত স্বর। রস—হাস্য, শৃঙ্গার। বিনিয়োগ—উৎসব।

গ্রামরাগ পঞ্চম।

এটি শুদ্ধাগীতিতে আশ্রিত এবং মধ্যগ্রামস্থ গ্রামরাগ। এই রাগটি মধ্যমা এবং পঞ্চমী—এই দুই জাতির সহযোগে উৎপন্ন। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—পঞ্চম এবং এই পঞ্চমটি হচ্ছে মধ্যসপ্তকের পঞ্চম। কাকলীনিষাদ এবং অন্তর-গান্ধারের প্রয়োগ হয়। মূর্ছনা—মধ্যমগ্রামের হৃষ্যকা। এই মূর্ছনাটি কিন্তু সৌবীরী হওয়া উচিত ছিল কেননা গ্রামরাগ পঞ্চমে ব্যবহৃত পঞ্চমস্বরটি মধ্যসপ্তকের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রধান স্বরটি মূর্ছনার অন্তর্গত হওয়া উচিত। হৃষ্যকা মূর্ছনার ক্ষেত্রে পঞ্চম স্বরটি মন্দ্রসপ্তকের অন্তর্গত এবং এটি উক্ত মধ্যসপ্তকের পঞ্চমকে অধিকার করছে না। অতএব এ ক্ষেত্রে যে কেন হৃষ্যকামূর্ছনার প্রয়োগ হবে তার কোন কারণ নির্দেশ করা হয়নি। এইরাগে সঞ্চারীবর্ণের যে অলঙ্কার প্রযুক্ত হবে সেটি যে মনোহর বা চারু হওয়া বিধেয় এটি শার্ঙ্গদেব বিশেষভাবে বলেছেন। কাল—গ্রীষ্ম-দিবসের প্রথম প্রহর। রস—শৃঙ্গার, হাস্য। বিনিয়োগ—অবমর্শ সন্ধি।

গ্রামরাগ পঞ্চমের ভাষা দাক্ষিণাত্যা। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। অপন্যাস—ঋষভ। তারনিষাদ, তারপঞ্চম এবং তারধৈবতের প্রয়োগ হয়। প্রিয়স্মৃতিতে এই রাগের ব্যবহার বিধেয়।

পঞ্চমের বিভাষা হচ্ছে অন্ধালিকা। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর পঞ্চম। অপন্যাস—ধৈবত। গান্ধার বর্জিত স্বর। নিষাদের প্রয়োগ অল্প। তারধৈবত মন্দ্রষড়্জ ব্যবহৃত হয়। বিযুক্ত বন্ধনে এই রাগ ব্যবহার্য।

অন্ধালিকার উপাঙ্গ দুটি—মল্লারী এবং মল্লার। মল্লারীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর হচ্ছে পঞ্চম। গান্ধার বর্জিত স্বর। মন্দ্রসপ্তকের মধ্যম ব্যবহৃত হয়। রস—শৃঙ্গার। উপাঙ্গ মল্লারে ষড়্জ এবং পঞ্চম বর্জিত-স্বর। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। মন্দ্রগান্ধার এবং তারনিষাদের প্রয়োগ হয়। এ ক্ষেত্রে ষড়্জবর্জিত রাগ কিভাবে গাওয়া হত সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয় নি।

এর পর শার্ঙ্গদেব কর্ণাটগৌড়, দেশবালগৌড়, তুরুষ্কগৌড় এবং দ্রাবিড়-গৌড় – এই চারটি গৌড়ীয় উপাঙ্গরাগের পরিচয় দিয়ে উপাঙ্গরাগের প্রসঙ্গ শেষ করেছেন।

কর্ণাট গৌড়-এর গ্রহ এবং অংশ স্বর ষড়্জ। এই ষড়্জস্বরটিই আন্দোলিতভাবে ব্যবহৃত হলে এটি দেশবালগৌড়ে রূপান্তরিত হয়। দেশবালগৌড় রাগে ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর কিন্তু কর্ণাটগৌড় সম্পূর্ণ জাতীয়। সিংহভূপাল টীকায় বলেছেন—কর্ণাটগৌড় এব ঋষভপঞ্চ-মোজ্ঝিতঃ। এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। পার্শ্বদেব তাঁর সঙ্গীতসময়সার-গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন কর্ণাটগৌড ‘পূর্ণঃ’ অর্থাৎ সম্পূর্ণজাতীয় রাগ এবং তার পরেই দেশবালগৌড়ের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে এটি পঞ্চম, ঋষভ বর্জিত রাগ। শার্ঙ্গদেবও কর্ণাটগৌড় যে ঔড়ব রাগ এমন কথা বলেন নি। এখানে সিংহ-ভূপালের বিচারে ভুল হয়েছে বলে মনে হয়।

তুরুষ্কগৌড় রাগের গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস-স্বর হচ্ছে নিষাদ। ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর। গান্ধার বহুলপ্রযুক্ত।

দ্রাবিড়গৌড় রাগের গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস-স্বর—নিষাদ। গান্ধার, ষড়্জ এবং পঞ্চম গমকযুক্ত।

উপাঙ্গরাগের মধ্যে শার্ঙ্গদেব তুচ্ছী এবং স্তম্বতীর্থিকা নামক দুটি রাগের উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই রাগদুটির কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি।

এর পরে দেশী রাগসমূহের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দেশীরাগের আলোচনা উপলক্ষ্যে কল্লিনাথ বলছেন রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, উপাঙ্গ, রাগ প্রভৃতি ক্রমেই দেশীর পর্যায়ে এসে পড়ায় শাস্ত্রীয় রীতিনীতি থেকে কিছু কিছু বিচ্যুত হয়েছে। অনেক স্থলেই নির্ধারিত তার, মন্দ্র, গ্রহ, অংশ, শ্রুতি, স্বর প্রভৃতি কার্যক্ষেত্রে মেনে চলা হয় নি। কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়েছে। দেশী পদ্ধতিতে এইরকম কামাচার অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আঞ্জনেয় থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন:

যেষাং শ্রুতিস্বরগ্রামজাত্যাদিনিয়মো ন হি।
নানাদেশগতিচ্ছায়া দেশিরাগস্তু তে স্মৃতাঃ॥

যে রাগসঙ্গীতে শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, জাতি প্রভৃতির নিয়ম (যথাযথভাবে) মেনে চলা হয় না এবং যাতে বিভিন্ন দেশীয় পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটে তা দেশীরাগ বলে পরিচিত। কল্লিনাথ আরও বলছেন যে দেশীয়হেতু এই সব

অনিয়ম দোষাবহ নয়—দেশীত্বং চ তৎতৎদেশমনুজমনোরঞ্জনৈকফলত্বেন কামাচার প্রবর্তিতত্বম্।

রাগাধ্যায়ে বর্ণিত এইসব সঙ্গীতের দেশীত্বস্বীকৃত হলেও এগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ দেশী গান নয়। এদের শার্ঙ্গদেব গান্ধর্বসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তবে লক্ষণ অনুসারে দেশীত্বকে অস্বীকার করেন নি।

দেশী রাগগুলির প্রথমেই শ্রীরাগের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীরাগ ষড়্জগ্রামস্থ ষাড়্জী জাতি থেকে উদ্ভূত। গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস স্বর—ষড়্জ। পঞ্চমের ব্যবহার স্বল্প। মন্দ্রগান্ধার এবং তারমধ্যমের প্রয়োগ হয়। অপর স্বরগুলিও প্রায় সমানভাবেই প্রযুক্ত হয়।

রাগ বঙ্গালের দুটি রূপ দেওয়া হয়েছে। একটি রূপ ষড়্জমধ্যমা নামক জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটিতে মন্দ্রস্বরের প্রয়োগ নেই। এর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস-স্বর – ষড়্জ। অপর স্বরগুলিও তুল্যবলসম্পন্ন। বঙ্গালের অপর রূপটি মধ্যমগ্রামস্থ কৈশিকী জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরও গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর ষড়্জ। এতে তার এবং মধ্যপঞ্চমের ব্যবহার আছে কিন্তু মন্দ্রপঞ্চমের ব্যবহার নেই। অপর স্বরগুলিও প্রায় সমানভাবেই প্রবল।

রাগ মধ্যমষাড়বের অংশস্বর ঋষভ, ন্যাসস্বর—পঞ্চম এবং অপন্যাসস্বর —ধৈবত। পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প। রস - বীর রৌদ্র, এবং অদ্ভুত।

রাগ শুদ্ধভৈরবের গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস স্বর ধৈবত। ধৈবত অংশস্বর হওয়া সত্ত্বেও অপর স্বরগুলির সমত্ব রক্ষিত হবে অর্থাৎ অল্পত্ব এবং বহুত্ব দ্বারা কোন বৈষম্য ঘটবে না। এই রাগের বিস্তৃতিসম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলছেন—তারমন্দ্রঃ অয়ম্ আষড়্জগান্ধারং। এই কথাটির অর্থ সিংহভূপাল করেছেন—ষড়্জপর্যন্তং গান্ধারপর্যন্তং বা বিকল্পেন তারমন্দ্রত্বং ধৈবতাৎ অংশস্বরাৎ আরভ্য, অর্থাৎ, অংশস্বর ধৈবত থেকে আরম্ভ করে ষড়্জ পর্যন্ত অথবা বিকল্পে গান্ধার পর্যন্ত তার এবং মন্দ্রস্বরের প্রয়োগ হবে। 'তারমন্দ্র' বলতে সিংহভূপাল 'মধ্যমস্বরহীনঃ' বুঝেছেন, অর্থাৎ হয় তারসপ্তক নয় মন্দ্রসপ্তক – মধ্যসপ্তকের ব্যবহার হবে না।

রাগ মেঘ ষড়্জগ্রামের ধৈবতী নামক জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। তার ষড়্জের প্রয়োগ হয়। অপর স্বরগুলির সমত্ব রক্ষিত হবে। মন্দ্রস্বরের প্রয়োগ নেই।

রাগ সোম ষড়্জগ্রামস্থ ষাড়্জী নামক জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এর গ্রহ, অংশ, ন্যাস-স্বর ষড়্জ। নিষাদ ও গান্ধারের বহুল প্রয়োগ হয়। মধ্যসপ্তকের মধ্যম এবং তারসপ্তকের মধ্যম ব্যবহৃত হয়। মন্দ্রমধ্যমের প্রয়োগ নেই। বীররসে পরিবেশিত হয়।

রাগ কামোদ ষড়্জগ্রামস্থ ষড়্জমধ্যমা জাতি থেকে উৎপন্ন। গ্রহস্বর—তারষড়্জ। তার এবং মন্দ্র উভয় গান্ধারেরই প্রয়োগ হয়।

ষড়্জগ্রামের ষাড়্জী জাতি থেকে অপর একপ্রকার কামোদ উৎপন্ন হয়েছে। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। মন্দ্রগান্ধারের প্রয়োগ হয় এবং অপর স্বরগুলির মধ্যে বহুত্ব বা অল্পত্ব হিসাবে বৈষম্য নেই অর্থাৎ সমভাবে প্রযুক্ত হয়।

আন্ত্রপঞ্চম নামক রাগটির গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস-স্বর—গান্ধার। তার-নিষাদ এবং তারগান্ধারের প্রয়োগ হয়। মন্দ্রস্বরের ব্যবহার নেই। এইরকম লক্ষণ জ্ঞাপন করে শার্ঙ্গদেব বলছেন রাগটি 'মন্দ্রমধ্যসমুদ্ভব'। যেহেতু মন্দ্রস্বরের প্রয়োগ এই রাগে ঘটে না সেহেতু এটিকে মন্দ্রমধ্যসমুদ্ভব বললে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। সিংহভূপাল বলছেন এর দুটি রূপ হতে পারে। মন্দ্রমধ্য অর্থাৎ মন্দ্রসপ্তকের মধ্য স্বর থেকে উদ্ভূত হলে গান্ধার এবং নিষাদ তারত্ব প্রাপ্ত হবে না।

এই রাগগুলির সঙ্গে উৎপত্তি বা গায়নশিল্পের দিক থেকে পূর্ববর্ণিত রাগাঙ্গের কি প্রভেদ এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। রাগাঙ্গগুলি সাধারণত গ্রামরাগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু রাগগুলি সাধারণত সাক্ষাৎ জাতি থেকে উৎপন্ন। রাগাঙ্গ এবং রাগ উভয় ক্ষেত্রেই স্বরবিশেষের তারত্ব এবং মন্দ্রত্ব দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হত বলে মনে হয়।

এর পর শর্ঙ্গদেব বিভিন্ন গ্রামরাগের এক আখ্যাযুক্ত কয়েকটি ভাষার পরিচয় প্রদান করেছেন।

কৈশিকী হচ্ছে গ্রামরাগ পঞ্চমের ভাষা। এর ,গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—পঞ্চম। অপন্যাস - মধ্যম। মধ্যম এবং পঞ্চমের বহুল প্রয়োগ হয়। তার-ষড়্জ, তারগান্ধার এবং তারমধ্যমের ব্যবহার হয়। বিনিয়োগ—ঈর্ষা।

কৈশিকীকে ভাষাঙ্গের অন্তর্ভুক্তও করা হয়। এক্ষেত্রে মন্দ্রষড়্জ, মন্দ্রমধ্যম এবং তারঋষভের প্রয়োগ হবে। বিনিয়োগ—উৎসব।

পঞ্চমের আর-একটি ভাষা হচ্ছে সৌরাষ্ট্রী। এর গ্রহ, এবং অংশ স্বর—পঞ্চম। ঋষভ বর্জিত স্বর। মন্দ্রমধ্যম, তারষড়্জ, তারগান্ধার এবং

তারধৈবতের বহুল প্রয়োগ হয়। বিনিয়োগ—নির্বেদ। এই রাগটি গমকযুক্ত।

সৌরাষ্ট্রীর আর একটি রূপ আছে। এটি হচ্ছে গ্রামরাগ টক্ক-এর ভাষা। গ্রহ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। নিষাদের অতি বহুল প্রয়োগ হয়। এতদ্ভিন্ন অপর স্বরগুলিরও বহুল প্রয়োগ হয়। মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী-সম্পাদিত অ্যাডায়ার সংস্করণে এই শ্লোকটি এইভাবে ছাপা হয়েছে:

সাংশগ্রহান্তা সৌরাষ্ট্রী টক্করাগে ইতি ভূরি নিঃ ॥১৭৩

ভূরিতারা ম মন্দ্রা চ পহীনা করুণে ভবেৎ।

এই মুদ্রণে 'ভূরিতারা' শব্দটি ভুল। এটি হওয়া উচিত—'ভূরীতরা' অর্থাৎ ষড়্জ এবং নিষাদ ছাড়া ইতর বা অপরস্বরগুলিরও ভূরীপ্রয়োগ হবে। সিংহভূপাল টীকায় বলেছেন—নিষাদষড়্জাভ্যাম্ ইতরে স্বরাঃ বহুলাঃ। এই রাগে পঞ্চম বর্জিত স্বর। করুণরসে প্রযুজ্য।

গ্রামরাগ টক্কের অপর একটি ভাষা ললিতা। এর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। মন্দ্রষড়্জের প্রয়োগ হয়। ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর। তারগান্ধার এবং তারধৈবতের প্রয়োগ হয়। স্বরগুলি ললিতভাবে প্রযোজ্য। বিনিয়োগ—বীরোৎসব।

গ্রামরাগ ভিন্নষড়্জের ললিতা নামক একটি ভাষা আছে। এর গ্রহ-, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। মন্দ্রধৈবতেরও প্রয়োগ হয়। ঋষভ, গান্ধার এবং মধ্যম কখনো তারসপ্তকে কখনো মন্দ্রসপ্তকে লালিত্যসহযোগে প্রযুক্ত হয়। বিনিয়োগ—ললিতস্নেহ।

সৈন্ধবী নামক ভাষারাগ চারটি গ্রামরাগের সঙ্গে যুক্ত। টক্কভাষা সৈন্ধবীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। তার এবং মন্দ্র উভয় ষড়্জেরই ব্যবহার হয়। তারগান্ধারেরও ব্যবহার আছে। এই রাগটি গমকের সাহায্যে ব্যাপ্ত হয় এবং এই গমকে স্বরলঙ্ঘিত হয়। লঙ্ঘিত বলতে কি বোঝায় সেটি আমরা ইতিপূর্বে স্থায়প্রসঙ্গে বলেছি। সিংহভূপাল টীকায় 'লঙ্ঘিতস্বরৈঃ' শব্দের অর্থ করেছেন 'দ্রুতস্বরৈঃ', অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণের ফলে কোন কোন স্বরের লোপ বা ঈষৎ স্পর্শ ঘটে। এই অর্থেও লঙ্ঘন-শব্দের ব্যবহার হয়। এই রাগ সব রসেই গাওয়া যেতে পারে।

গ্রামরাগ পঞ্চমের একটি ভাষা সৈন্ধবী। এর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—পঞ্চম। অপন্যাস ঋষভ এবং পঞ্চম। সিংহভূপাল বলছেন' যে নিষাদ,

ধৈবত এবং পঞ্চম গমকযুক্ত হয়ে রাগকে রম্যভাবে রূপায়িত করে। তারপঞ্চমেরও ব্যবহার হয়ে থাকে। ঋষভের বহুল প্রয়োগ হয়। এটিও সব রসেই প্রযোজ্য।

গ্রামরাগ মালবকৈশিকের একটি ভাষার নাম সৈন্ধবী। গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। মন্দ্রষড়্জ ব্যবহৃত হয়। পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প। নিষাদ এবং গান্ধার বর্জিত স্বর। সর্বভাবেই গাওয়া যেতে পারে।

গ্রামরাগ ভিন্নষড়্জের ভাষা সৈন্ধবীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর- ধৈবত। মন্দ্রধৈবতের প্রয়োগ হয়। ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর। উদ্দীপনে নিযুক্ত হয়।

এর পর দুই প্রকার ভাষারাগ গৌড়ীর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। গ্রামরাগ হিন্দোলের ভাষা গৌড়ীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। মন্দ্রষড়্জ ব্যবহৃত হয়। ঋষভ এবং ধৈবত বর্জিত স্বর। পঞ্চমস্বরে উৎপন্ন গমকের বহুল প্রয়োগ হয়। প্রিয়সম্ভাষণে প্রযোজ্য।

গ্রামরাগ মালবকৈশিকের ভাষা গৌড়ীর গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। তার এবং মন্দ্র—দুই ষড়্জেরই ব্যবহার হয়। নিষাদের বহুল প্রয়োগ হয়। বিরহে, মতান্তরে, বীররসে প্রযোজ্য।

অতঃপর দুই প্রকার ত্রাবণীর লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

যাষ্টিকের মতে ত্রাবণী পঞ্চমের ভাষা। এর গ্রহ এবং অংশ স্বর- ষড়্জ। ন্যাসস্বর—পঞ্চম। ঋষভ, পঞ্চম এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ হয়। নিষাদ এবং গান্ধারের সঙ্গতি হয়।

মতান্তরে ত্রাবণী, একটি ভাষাঙ্গরাগ গ্রহ এবং অংশস্বর ধৈবত নিষাদ এবং পঞ্চম বর্জিত স্বর। এতে তারস্বরের প্রয়োগ নেই। মন্দ্রধৈবত এবং মন্দ্রগান্ধারের ব্যবহার হয়। মধ্যমের বহুল প্রয়োগ ঘটে।

হর্ষপুরী হচ্ছে মালবকৈশিকের ভাষা। গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাসস্বর – ষড়্জ। মন্দ্রষড়্জের প্রয়োগ হয়। ধৈবত বর্জিত স্বর। তারমধ্যম এবং তারপঞ্চমের ব্যবহার আছে। হর্ষে প্রযোজ্য।

ভম্মাণী হচ্ছে গ্রামরাগ পঞ্চমের বিভাষা। গ্রহ এবং অংশস্বর—পঞ্চম। মন্দ্র এবং তার—উভয় ষড়্জই ব্যবহৃত হয়। তারমধ্যম, তারনিষাদ এবং তারপঞ্চমের প্রয়োগ হয়। ঋষভ বর্জিত স্বর। বিনিয়োগ—উৎসব।

গ্রামরাগ টক্ককৈশিক।

এটি ধৈবতী এবং মধ্যমা এই দুই জাতি থেকে উৎপন্ন এবং বেসরা বা রাগগীতিতে প্রযুক্ত হয়। রাগটি উভয়গ্রামসম্বন্ধীয়। গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ধৈবত। কাকলী-নি এবং অন্তরগান্ধার ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কার—আরোহীবর্ণের প্রসন্নাদি। মূর্ছনা—উত্তরায়তা। বিনিয়োগ উদ্ভট, নটন, কঞ্চুকীপ্রবেশ। রস—বীভৎস, ভয়ানক। কাল—দিবসের চতুর্থ প্রহর।

এর দ্বিগ্রামত্ব কিভাবে স্বীকার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কল্লিনাথ আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন যে এই রাগের মূর্ছনার ক্ষেত্রে মধ্যমগ্রাম অনুযায়ী ত্রিশ্রুতিক পঞ্চমের ব্যবহার হবে না। ষড়্‌জগ্রামের ধৈবতাদিক মূর্ছনার ব্যবহারে এটির ষড়্‌জ গ্রামত্ব বজায় আছে, অর্থাৎ এই মূর্ছনায় পঞ্চম চতুঃশ্রুতিক। মধ্যমগ্রামত্ব বিষয়ে তিনি কাশ্যপ এবং মতঙ্গের মত উদ্ধৃত করেছেন। কাশ্যপের মতে এই রাগে নিষাদ ও গান্ধারের লোপ হয়। মতঙ্গের মতানুযায়ী ঋষভ, ধৈবত বা নিষাদ, গান্ধার বর্জিত হলে রাগটি মধ্যমগ্রামসম্বন্ধীয় হয়। মতঙ্গের মতটি কল্লিনাথ উদ্ধৃত করেছেন—"রিধাভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাং চ মধ্যগ্রামগাস্ত তে।" অতএব কাশ্যপের মতানুযায়ী নিষাদ, গান্ধার বর্জিত এই ঔডব রাগটিকে মতঙ্গের অভিমত অনুসারে মধ্যমগ্রামসম্বন্ধীয় বলা যেতে পারে। কল্লিনাথ বলছেন--"ইতি ঔড়ুব শুদ্ধতানলক্ষণ মধ্যমগ্রামে অপি সাক্ষাৎ অবগম্যত ইতি আচাযদ্বয় মতানুসাবিণা নিঃশঙ্কসুরিণাদ্বিগ্রামষ্টক্ক-কৈশিকঃ ইতি সুষ্ঠু উদ্দিষ্টম্।" এই অংশটুকুরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মূর্ছনাপ্রকরণে বলা হয়েছে যে শুদ্ধ মূর্ছনার আরোহণক্রম থেকে একটি বা দুটি স্ববেব লোপ বা অপকর্ষ কবে শুদ্ধ তান নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তরায়তা মূর্ছনা থেকে নিষাদ এবং গান্ধার বর্জন করলেই ঔডব শুদ্ধতান

হল, অর্থাৎ এটি হবে ধা সা রে মা পা—এই তান এবং এর পঞ্চমটি হবে চতুঃশ্রুতিক। মতঙ্গের মতানুযায়ী এই ঔডব তানটি মধ্যগ্রামের লক্ষণযুক্ত। শার্ঙ্গদেব কিন্তু গ্রন্থে আচাযদ্বয়ের মতের উল্লেখ করেন নি এবং তিনি এ কথাও বলেন নি যে কাশ্যপের মতানুযায়ী তিনি এটিকে ঔড়ব রাগ বলে স্বীকার করছেন। বরঞ্চ কাকলীনিষাদ এবং অন্তরগান্ধারের প্রয়োগ হবে এইটাই তিনি বিশেষভাবে বলেছেন।

টক্ককৈশিকের ভাষা হচ্ছে মালবা। এর গ্রহ, এবং অংশস্বর—গান্ধার।

ন্যাসস্বর—ধৈবত। এই রাগে ষড়্জধৈবত এবং ঋষভপঞ্চম—এই দুটি সঙ্গতি হয়।

টক্কৈশিকের বিভাষা হচ্ছে দ্রাবিড়ী। এর গ্রহ এবং অংশস্বর—গান্ধার। ন্যাসস্বর—ধৈবত। এই রাগে ষড়্জধৈবত এবং নিষাদগান্ধার—এই দুটি সঙ্গতি হয়।

শার্ঙ্গদেব এইখানেই রাগাধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।

শার্ঙ্গদেব রাগাধ্যায়ে যতগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের রাগের উল্লেখ করেছেন তার অনেকগুলির লক্ষণ বর্ণনা করেন নি। টীকাকার কল্লিনাথ সেগুলি আঞ্জনেয় প্রভৃতির মতানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। রাগাধ্যায়ের পূর্ণতাসম্পাদনের জন্য এগুলি নিম্নলিখিত তালিকায় দেখানো হল :—

সৌবীর ভাষা

ভাষা—বেগমধ্যমা। গ্রহ, অংশ, এবং ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ষড়্জ—পঞ্চম সঙ্গতি। মধ্যম-উজ্জ্বল।

ভাষা—সাধারিতা। গ্রহ, এবং অংশ—ষড়্জ। ন্যাস-মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—গমকযুক্ত। সম্পূর্ণজাতীয়। ষড়্জমধ্যম সঙ্গতি।

ভাষা—গান্ধারী। গ্রহ এবং অংশ—নিষাদ। ন্যাস-ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—করুণরসে প্রযোজ্য।

ককুভ ভাষা

ভাষা—ভিন্নপঞ্চমী। অংশ—ধৈবত। অপন্যাস—মধ্যম। ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবতের বহুল প্রয়োগ।

বৈশিষ্ট্য—কল্লিনাথের যে বর্ণনা রয়েছে তাতে বলা হয়েছে—"রিমপধবহুলা-দোজ্ঝিতাংশধা"। এ থেকে মনে হয় এই রাগে গান্ধার উজ্ঝিত বা বর্জিত স্বর।

ভাষা—কাম্ভোজী। অংশ এবং ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ষড়্জধৈবত এবং ষড়্জপঞ্চম সঙ্গতি।

ভাষা—মধ্যমগ্রামী। গ্রহ এবং অংশ—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ-ধৈবত সঙ্গতি। উদ্ধৃত শ্লোকটি এই রকম :

ককুভে মধ্যমগ্রামী ভাষা ধাংশগ্রহাংশকা।
মাধ্যমগ্রমিকী পূর্ণা সঙ্কীর্ণা রিধসংগতা॥

এখানে 'ধাংশগ্রহাংশকা' শব্দের পাঠোদ্ধারে কিছু গোলামাল হয়েছে বলে মনে হয়। কেন না দুবার অংশ শব্দের প্রয়োগ অর্থহীন। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন এই রাগের অংশস্বর মধ্যম, ন্যাসস্বর ধৈবত। এইটিই ঠিক। অতএব উদ্ধৃত শ্লোকে এই অংশটি হওয়া উচিত ছিল—'মাংশগ্রহান্তধা'—এই রকম। 'পূর্ণা' শব্দে এটি যে সম্পূর্ণ মধ্যমগ্রামসম্বন্ধীয় সেটিই বোঝাচ্ছে।

'সঙ্কীর্ণা' শব্দে যাষ্টিক মতোক্ত সঙ্কীর্ণা ভাষা বোঝাচ্ছে। মতঙ্গ একেই স্বরাখ্য ভাষা বলেছেন। সঙ্কীর্ণা ভাষা অর্থে কি বোঝায় সেটি রাগাধ্যায়ের গোড়াতে বলা হয়েছে।

অ্যাডায়ার সংস্করণের ১১২ পৃষ্ঠায় কল্লিনাথের যে টীকা আছে তার দ্বিতীয় পংক্তিতে 'সম্পূর্ণা' এবং 'মূর্ছা'—এই দুটি শব্দ ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়েছে। এই দুটি হবে 'সঙ্কীর্ণা' এবং 'মূলা' কেন না যাষ্টিক এই দুটি সংজ্ঞাই দিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে কল্লিনাথ উমাপতির মত উদ্ধৃত করেছেন। এই মতানুসারে রাগসমূহ ত্রিবিধ—শুদ্ধা, ছায়ালগ এবং সঙ্কীর্ণা। মতটি হচ্ছে এই-- শুদ্ধরাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্তনিয়মানতিক্রমেণ স্বতো রক্তিহেতুত্বম্। ছায়ালগরাগত্বং নামান্য-চ্ছায়ালগত্বেন রক্তিহেতুত্বম্। সঙ্কীর্ণরাগত্বং নাম শুদ্ধছায়ালগমিশ্রত্বেন রক্তি-হেতুত্বম্।

ভাষা—মধুরী। অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য - গান্ধার - পঞ্চম এবং নিষাদ—ধৈবত সঙ্গতি। যাষ্টিকের মতানুসারে সঙ্কীর্ণা বা দেশাখ্যভাষা।

ভাষা—শকমিশ্রা। গ্রহ, অংশ—নিষাদ। ন্যাস—ঋষভ।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদপঞ্চম এবং ঋষভধৈবত সঙ্গতি।

বিভাষা—আভীরিকা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—তারপঞ্চম, মন্দ্রধৈবত-এর প্রয়োগ। নিষাদ, ঋষভ এবং ষড়্জের দ্রুত প্রয়োগ। সম্পূর্ণজাতীয়। প্রচুরমধ্যমা। বিনিয়োগ—নির্বেদ।

বিভাষা—মধুকরী। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্জ। অপন্যাস—গান্ধার।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ, ষড়্জ, ঋষভ, ধৈবত এবং পঞ্চমের বহুল প্রয়োগ।

ককুভ—অন্তরভাষা।

অন্তরভাষা - শালবাহনী। গ্রহ, অংশ—ঋষভ। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ঋষভ—গান্ধার সঙ্গতি।

টক্কভাষা

ভাষা—ত্রবণা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য - ঋষভ, পঞ্চমবর্জিত স্বর। মন্দ্রষড়্‌জ, তারগান্ধার, তারমধ্যম এর প্রয়োগ। ষড়্‌জ, নিষাদ, ধৈবতের বহুল প্রয়োগ। দিনান্তে গেয় রস—বীর।

ভাষা—ত্রবণোদ্ভবা। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্‌জ। অপন্যাস—গান্ধার

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ, ধৈবতের বহুল প্রয়োগ। পঞ্চম বর্জিত স্বর। সর্বদা গেয় স্পর্ধায় প্রযোজ্য।

ভাষা—বেরঞ্জিকা। গ্রহ, অংশ—গান্ধার। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—পঞ্চমের অল্প প্রয়োগ। ষড়্‌জ-মধ্যম এবং ঋষভ—গান্ধার সঙ্গতি মতান্তরে এটি ষাড়ব রাগ। কল্লিনাথোক্ত এই রাগের বর্ণনা এইরকম:—

টক্ক বেরঞ্জিকা সান্তা পগ্রহাংশাল্পপঞ্চমা।
সমযো রিগযোশ্চাপি সঙ্গতা ষাডবা মতা॥

এই বর্ণনায় যে অসঙ্গতি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে পঞ্চম যদি গ্রহ এবং অংশস্বর হয় তাহলে উক্ত স্বরের প্রয়োগ অল্প হতে পারে না। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলছেন—"গান্ধারাংশাল্পপঞ্চমা"—অর্থাৎ, অংশস্বর গান্ধার এবং পঞ্চমের প্রয়োগ অল্প (বৃহদ্দেশী-ত্রিবান্দ্রাম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৮)। এই পাঠটিই সঙ্গত। অতএব হয় কল্লিনাথোক্ত শ্লোকটির পাঠোদ্ধারে ভুল হয়েছে নতুবা এটি লিপিকারের প্রমাদ।

ভাষা—মধ্যমগ্রামদেহা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—অসম্পূর্ণ। সঙ্কীর্ণা বা স্বরাখ্যাভাষা। ষড়্‌জ—মধ্যম সঙ্গতি।

ভাষা—মালববেসরী। গ্রহ, অংশ—নিষাদ। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—পঞ্চমের অল্প প্রয়োগ। ষড়্‌জ—গান্ধার এবং ষড়্‌জ—মধ্যম সঙ্গতি। ষাড়বজাতীয়। মূলাখ্যা বা মুখ্যা ভাষা।

ভাষা—ছেবাটী। গ্রহ অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্‌জ—মধ্যম এবং নিষাদ—গান্ধার সঙ্গতি। মধ্যম উজ্জ্বল। সম্পূর্ণজাতীয়। মূলাখ্যা বা মুখ্যা ভাষা।

ভাষা—পঞ্চমলক্ষিতা। গ্রহ—ষড়্‌জ। অংশ—পঞ্চম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—তারষড়্‌জ, তারগান্ধার এবং তারপঞ্চমের প্রয়োগ। ঋষভ বর্জিত স্বর।

ভাষা—পঞ্চমী। গ্রহ, অংশ—পঞ্চম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ—পঞ্চম সঙ্গতি। সম্পূর্ণজাতীয়।

ভাষা—গান্ধারপঞ্চমী। গ্রহ—ধৈবত। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্‌জ—মধ্যম সঙ্গতি। গান্ধার ভূষিত অর্থাৎ গমক বা অলঙ্কার-যুক্ত। সম্পূর্ণজাতীয়। সঙ্কীর্ণা বা স্বরাখ্য ভাষা।

ভাষা—মালবী।

বৈশিষ্ট্য—কল্লিনাথের উদ্ধৃত শ্লোক: -

পধমিশ্রা তদন্তাংশা মালবী টক্কসম্ভবা।

রিহীনা তারগান্ধার ষড়্‌জমধ্যম কম্পিতা॥

পঞ্চম এবং ধৈবত যুক্তভাবে থাকে এবং এই যুক্ত স্বরটিই অংশ এবং ন্যাস রূপে ব্যবহৃত হয়। তারগান্ধার, তারষড়্‌জ এবং তারমধ্যম কম্পিতভাবে প্রযুক্ত হয়।

ভাষা—তানবলিতা। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্‌জ এবং পঞ্চমের লালিত্যপূর্ণ মৃদু প্রয়োগ।

ভাষা—রবিচন্দ্রিকা। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ এবং পঞ্চমের স্বল্প প্রয়োগ। ঋষভ গান্ধারের সঙ্গে এবং ষড়্‌জ মধ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গমকযুক্ত।

ভাষা—তানা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ। অপন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ পঞ্চমবর্জিত। গমকযুক্ত মন্দ্রনিষাদ এবং মন্দ্রষড়্‌জের প্রয়োগ। রস—করুণ।

ভাষা—অম্বাহেরী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—গান্ধার এবং ধৈবতের অধিক প্রয়োগ। সমস্বর। পঞ্চমবর্জিত। দেশাখ্য ভাষা। রস—বীর।

ভাষা—দোহ্যা। গ্রহ—গান্ধার। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ, পঞ্চমবর্জিত। দেশাখ্য ভাষা।

ভাষা—বেসরী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—পঞ্চমবর্জিত। নিষাদ—ধৈবত এবং ষড়্‌জ—ধৈবত যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। কাকলীনিষাদ। রস—বীর।

টক্ক বিভাষা

বিভাষা—দেবারবর্ধনী। গ্রহ, অংশ—পঞ্চম। ন্যাস-ষড়্‌জ। সম্পূর্ণজাতীয়।

বিভাষা—আন্ধ্রী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—অন্ধ্রদেশজ। প্রহরে বিনিযুক্ত।

বিভাষা—গুর্জরী। গ্রহ, অংশ—নিষাদ। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্‌জ—মধ্যম, ঋষভ—নিষাদ সঙ্গতি। সম্পূর্ণজাতীয়।

ভাষা—ভাবনী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম।

শুদ্ধপঞ্চম ভাষা

ভাষা—তানোদ্ভবা। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—অল্প ঋষভযুক্ত। ধৈবত—মধ্যম সঙ্গতি। পঞ্চম প্রবল।

ভাষা—আভীরী। অংশ, ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ অধিক। কাকলীনিষাদের প্রয়োগ। ষড়্‌জ মধ্যমের সহিত যুক্ত। বিনিয়োগ—রণ।

ভাষা—গুর্জরী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম। অপন্যাস—গান্ধার, ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। তারষড়্‌জ এবং তারমধ্যম যুক্ত।

ভাষা—আন্ধ্রী। গ্রহ—ঋষভ। ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—কাকলীনিষাদযুক্ত। ষড়্‌জ দুর্বল। কিন্নরদের প্রিয়। ভাষা—মাঙ্গলী। গ্রহ, ন্যাস—ধৈবত। ষড়্‌জ—ধৈবত এবং ঋষভ—পঞ্চম সঙ্গতি।

সঙ্কীর্ণা বা স্বরাখ্যা ভাষা।

ভাষা—ভাবনী। গ্রহ, ন্যাস—পঞ্চম। অপন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ বর্জ্জিত। মন্দ্রষড়্‌জযুক্ত। ষড়্‌জ, মধ্যম এবং নিষাদের বহুলপ্রয়োগ।

ভিন্নপঞ্চম ভাষা

ভাষা—ধৈবতভূষিতা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্‌জ—ধৈবত, ঋষভ—ধৈবতযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণজাতীয়।

ভাষা—শুদ্ধভিন্না। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ—ধৈবত, ষড়্‌জ—মধ্যম যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ-জাতীয়। কিন্নরগণের প্রিয়।

ভাষা—বরাটী। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবত এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ হয়। ঋষভ দুর্বল।

ষড়্‌জ ধৈবতের সঙ্গে এবং ঋষভ গান্ধারের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়।

ভাষা—বিশালা। অংশ—পঞ্চম। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবত গমকযুক্ত। ষড়্জ—ধৈবত সঙ্গতি। সম্পূর্ণজাতীয়। কিন্নরদের প্রিয়।

ভিন্নপঞ্চমবিভাষা

বিভাষা—কৌশলী। গ্রহ, অংশ—নিষাদ। ন্যাস—ধৈবত। ঋষভবর্জিত।

টক্ককৈশিক ভাষা

ভাষা—মালবা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ষড়্জ—ধৈবত এবং ঋষভ—ধৈবত সঙ্গতি।

ভাষা—ভিন্নবলিতা। গ্রহ, অংশ—ষড়্জ। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ এবং ধৈবতের বহুল প্রয়োগ। মধ্যম—নিষাদ সঙ্গতি।

টক্ককৈশিক বিভাষা

বিভাষা—দ্রাবিড়ী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ—গান্ধার এবং ষড়্জ—ধৈবতযুক্ত অবস্থায় থাকে।

হিন্দোল ভাষা

ভাষা—বেসরী। অংশ, ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবত এবং পঞ্চম দুর্বল। ষড়্জ—গান্ধার এবং ঋষভ—নিষাদ সঙ্গতি। প্রেক্ষণে বিনিয়োগ।

ভাষা—চুতমঞ্জরী। গ্রহ, অংশ—পঞ্চম। ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভবর্জিত। ষড়্জ—পঞ্চম সঙ্গতি। নিষাদ এবং গান্ধার যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়।

ভাষা—ষড়্জমধ্যমা। গ্রহ—ষড়্জ। অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ এবং ঋষভ বর্জিত। ষড়্জ—মধ্যম এবং গান্ধার—মধ্যম যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়।

ভাষা—মধুরী। গ্রহ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, ষড়্জ বহুলপ্রযুক্ত। ঋষভের অল্প প্রয়োগ। বিনিয়োগ—প্রেক্ষণ।

ভাষা—ভিন্নপৌরালী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। বিনিয়োগ—প্রেক্ষণ।

ভাষা—মালববেসরী। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্জ। অপন্যাস—গান্ধার।

বৈশিষ্ট্য—মধ্যম এবং পঞ্চম গমকযুক্ত। ঋষভ, ধৈবত বর্জিত।

বোট্টভাষা

ভাষা—মাঙ্গলী। গ্রহ, অংশ—পঞ্চম। ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। মধ্যম উজ্জ্বল। ঋষভ—ধৈবত সঙ্গতি। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য।

মালবকৈশিক ভাষা

ভাষা—বাঙ্গালী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। মধ্যম উজ্জ্বল। ঋষভ—নিষাদ সঙ্গতি।

ভাষা—মাঙ্গলী। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—মধ্যম স্ফুরিত এবং স্বল্পপ্রযুক্ত। ধৈবত দীর্ঘায়িত। তারঋষভ এবং তারমধ্যমযুক্ত।

ভাষা—মালববেসরী। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবতবর্জিত। তার—ঋষভ এবং মন্দ্রপঞ্চমযুক্ত। মধ্যম এবং পঞ্চম কম্পিত।

ভাষা-খঞ্জনী। অংশ-পঞ্চম। ন্যাস-ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবতবর্জিত। নিষাদ—ষড়্‌জ এবং ঋষভ—মধ্যম যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। সঙ্কীর্ণা বা স্বরাখ্যা ভাষা।

ভাষা—গুর্জরী। গ্রহ, অংশ—নিষাদ। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ঋষভ—নিষাদ এবং ঋষভ—মধ্যম সঙ্গতি।

ভাষা—পৌরালী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ। ষড়্‌জ এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ। সম্পূর্ণজাতীয়। সঙ্কীর্ণা বা স্বরাখ্যা ভাষা।

ভাষা—অর্ধবেসরী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। নিষাদ—দুর্বল। ষড়্‌জ এবং মধ্যমের বহুল প্রয়োগ।

ভাষা-শুদ্ধা। গ্রহ, অংশ-মধ্যম। ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। প্রহর্ষে প্রযোজ্য।

ভাষা—মালবরূপা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—গান্ধার প্রবল। নিষাদ এবং ধৈবত বর্জিত।

ভাষা—আভীরী। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্‌জ—ঋষভ সঙ্গতি। সম্পূর্ণজাতীয়। বীররসে প্রযোজ্য।

মালবকৈশিক বিভাষা

বিভাষা—কাম্বোজী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদবহুল। গমকযুক্ত। ঋষভ, পঞ্চম বর্জিত। মন্দ্রষড়্জযুক্ত।

বিভাষা—দেবারবর্ধনী। ন্যাস—ষড়্জ অথবা পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—গান্ধার এবং নিষাদ বর্জিত। কল্লিনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোক :—

দেবারবর্ধনী সাস্তা জাতা মালবকৈশিকাৎ।
বিভাষা ত্যক্তগান্ধারনিষাদা পঞ্চমান্তিমা॥

এই শ্লোকে ষড়্জ এবং পঞ্চম দুটিকেই শেষ স্বর বলা হয়েছে। অতএব এই দুটি স্বরই বোধ হয় বিকল্পে ন্যাস হতে পারে।

গান্ধারপঞ্চম ভাষা

ভাষা—গান্ধারী। গ্রহ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ষড়্জ এবং গান্ধার অলঙ্কারযুক্ত। সর্বলোক বিশেষ করে স্ত্রীলোকের প্রিয়।

ভিন্নষড়্জ ভাষা

ভাষা—গান্ধারবল্লী। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ষড়্জ এবং ধৈবত যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। পিতৃকর্মে প্রযোজ্য।

ভাষা—কচ্ছেলী। গ্রহ, অংশ—ষড়্জ। ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—কূটতানযুক্ত। গান্ধার, ধৈবতবর্জিত।

মতান্তরে

ভাষা—কচ্ছেলী। অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—মন্দ্র এবং তার ঋষভযুক্ত। গান্ধার, নিষাদ বর্জিত।

ভাষা—স্বরবল্লিকা। গ্রহ—নিষাদ। অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভবর্জিত। রাগটি মৃদুলা অর্থাৎ কোমলভাবে গীত হয়।

ভাষা—নিষাদিনী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

ভাষা—মধ্যমা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

ভাষা—শুদ্ধা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত। অপন্যাস—ষড়্জ। বৈশিষ্ট্য—ধৈবত মৃদুল অর্থাৎ কোমলভাবে উচ্চারিত হবে। ঋষভ, পঞ্চম বর্জিত। মতান্তরে পঞ্চম বর্জিত। ষড়্জ গান্ধার সঙ্গতি। মন্দ্রষড়্জ, মন্দ্রগান্ধার এবং মন্দ্রধৈবত ব্যবহৃত হয়। কল্লিনাথোক্ত শ্লোকে আর একটি লক্ষণস্বরূপ

'দীর্ঘপঞ্চমা' বলা হয়েছে। এই রাগে পঞ্চম বর্জিত অতএব পঞ্চম বা পা দীর্ঘায়িত হওয়া সম্ভব নয়। অথবা ঔড়বের ক্ষেত্রে পঞ্চম স্বর নিষাদ এবং ষাড়বের ক্ষেত্রে পঞ্চম স্বর ধৈবত দীর্ঘায়িত হবে এমন অর্থও করা যেতে পারে।

ভাষা—দাক্ষিণাত্যা। গ্রহ, অংশ ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—পঞ্চম দুর্বল। ষড়্জ—ধৈবত এবং ষড়্জ -মধ্যম যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। ষাড়বজাতীয়।

ভাষা - পুলিন্দী। অংশস্বর—ধৈবত। ন্যাসস্বর—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—গান্ধার, পঞ্চম বর্জিত। ষড়্জ—ধৈবত এবং ষড়্জ—মধ্যম যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। পুলিন্দজনগণের প্রিয়।

ভাষা—তম্বুরা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভবর্জিত। ব্রহ্মচারিণী কর্তৃক গীত হয়।

ভাষা—কালিন্দী। অংশ - গান্ধার। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ দুর্বল। পঞ্চম ঋষভ বর্জিত। এটি চতুঃ স্বরযুক্ত অর্থাৎ প্রায় ক্ষেত্রেই নিষাদও বর্জিত হয়। অবরোহী এবং আরোহী দৃশ্য।

ভাষা—শ্রীকণ্ঠী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত। অপন্যাস - ঋষভ।

বৈশিষ্ট্য—পঞ্চমবর্জিত। ঋষভ --মধ্যম সঙ্গতি।

ভাষা—গান্ধারী। অংশ—গান্ধার। ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যম বর্জিত। একান্তে গেয়।

ভিন্নষড়্জ বিভাষা

বিভাষা পৌরালী। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ দুর্বল। মধ্যম, ঋষভ, পঞ্চম এই স্বরগুলির পরস্পরে সঙ্গতি। নাগপ্রিয়।

বিভাষা—মালবী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস - ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ষড়্জ, ঋষভ গান্ধার, মধ্যমের বহুল প্রয়োগ। মন্দ্রধৈবত ব্যবহৃত হয়।।

বিভাষা—কালিন্দী। গ্রহ—গান্ধার। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ অল্প ব্যবহৃত। পঞ্চম,ঋষভবর্জিত। সমস্বর। বিস্ময়েপ্রযুক্ত।

বিভাষা—দেবারবর্ধনী। অংশ—নিষাদ। ন্যাস--ধৈবত। ঋষভবর্জিত

বেসরষাড়ব ভাষা

ভাষা—মান্তা। গ্রহ ষড়্জ। ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—গান্ধারবহুল। পঞ্চমবর্জিত। সায়াহ্নে গেয়।

ভাষা—বাহ্যষাডবা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য--নিষাদ-গান্ধার এবং ঋষভ-গান্ধার যুক্তভাবে ব্যবহার্য। সম্পূর্ণ-জাতীয়।

বেসরষাডব বিভাষা

বিভাষা—পার্বতী, অংশ—ষড্‌জ, সম্পূর্ণজাতীয়।

বিভাষা—শ্রীকণ্ঠী, গ্রহ, ন্যাস মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য -নিষাদ- ধৈবত এবং ঋষভ—ধৈবত যুক্তভাবে ব্যবহৃত। পঞ্চম বর্জিত।

মালবপঞ্চম ভাষা (শার্ঙ্গদেবের মতানুসারে)

ভাষা—বেগবতী, গ্রহ, ন্যাস—ষড্‌জ, অংশ—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। আঞ্জনেয় একে বিভাষার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ভাষা—ভাবনী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম, অপন্যাস—ষড্‌জ, ঋষভ-বর্জিত, কল্লিনাথের উদ্ধৃত শ্লোকে একেও বিভাষা বলা হয়েছে।

ভাষা - বিভাবনী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। মধ্যম, গান্ধার এবং ধৈবতের অল্প প্রযোগ। মন্দ্রপঞ্চম ব্যবহৃত হয়।

এই রাগটিকেও বিভাষা বলা হয়েছে।

ভিন্নতান ভাষা

ভাষা—তানোদ্ভবা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভবর্জিত। কাকলী নিষাদ এবং অন্তরগান্ধারযুক্ত।

পঞ্চমষাডব ভাষা

ভাষা—পোতা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ঋষভ।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবতবর্জিত। নিষাদ এবং ষড্‌জের বহুল প্রয়োগ।

রেবগুপ্ত ভাষা

ভাষা—শকা। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। ঋষভ এবং ষড্‌জের বহুল প্রয়োগ। তার-গান্ধারযুক্ত।

রেবগুপ্ত বিভাষা

বিভাষা- শকা। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড্‌জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। গান্ধার, পঞ্চম, ঋষভ এবং ধৈবতের বহুল প্রয়োগ।

রেবগুপ্ত অন্তরভাষা

অন্তরভাষা—ভাসবলিতা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভের অল্পপ্রয়োগ। পঞ্চম বর্জিত।

অন্তরভাষা—কিরণাবলী। গ্রহ, অংশ—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—তারগান্ধার, তারনিষাদ এবং মন্দ্রনিষাদযুক্ত।

অন্তরভাষা—শকবলিতা। অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবত এব নিষাদ সঙ্গতি।

উপরাগ

শকতিলক। অংশ. ন্যাস—ষড্‌জ। ষাড্‌জী এবং ধৈবতী জাতিদ্বয় থেকে উৎপন্ন। পঞ্চম দুর্বল।

টক্কসৈন্ধব। অংশ, ন্যাস—ষড্‌জ। ষাড্‌জী এবং কৌশিকী জাতিদ্বয় থেকে উৎপন্ন। পঞ্চম দুর্বল।

কোকিলাপঞ্চম। গ্রহ, অংশ পঞ্চম। ন্যাস—মধ্যম। পঞ্চমী এবং মধ্যমা জাতিদ্বয় থেকে উৎপন্ন। সম্পূর্ণজাতীয়।

ভাবনাপঞ্চম, গ্রহ—গান্ধার। অংশ—পঞ্চম। গান্ধারী এবং পঞ্চমী জাতিদ্বয় সম্ভূত। সমস্বর।

নাগগান্ধার। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—গান্ধার। গান্ধারী এবং রক্তগান্ধারী-জাতিদ্বয় সমুৎপন্ন।

নাগপঞ্চম। গ্রহ, অংশ—ঋষভ। ন্যাস—ধৈবত। আর্ষভী এবং ধৈবতী জাতিদ্বয় থেকে উৎপন্ন। গান্ধার বর্জিত।

নিরুপপদ রাগ

নট্ট। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম। মধ্যমোদীচ্যবা জাতি সমুৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—তারষড্‌জযুক্ত। সম্পূর্ণজাতীয়। সমস্বর।

ভাস। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত। আন্ধ্রী জাতি সমুৎপন্ন।

রক্তহংস। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত। রক্তগান্ধারী জাতি সমুৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ বর্জিত। তারগান্ধারযুক্ত।

কোলহাস। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্‌জ। নৈষাদী, ধৈবতী জাতিদ্বয় সমুৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—ধৈবত দুর্বল।

প্রসব। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—ষড্‌জ। নন্দয়ন্তী জাতিসমুদ্ভূত।

বৈশিষ্ট্য—নিষাদ-ধৈবত যুক্তভাবে ব্যবহৃত। সম্পূর্ণজাতীয়। বীরে প্রযোজ্য।

ধ্বনি। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম। গান্ধারপঞ্চমী জাতি সমুৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। পঞ্চম এবং ধৈবতের অধিক প্রয়োগ হয়। নিষাদ এবং গান্ধারের প্রয়োগ অল্প। মন্দ্রমধ্যমযুক্ত।

কন্দর্প। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড্‌জ। ষড্‌জকৌশিকী জাতি সমুদ্ভূত।

বৈশিষ্ট্য—মন্দ্রষড়্‌জের প্রয়োগ। পঞ্চম বর্জিত।

দেশাখ্য। গ্রহ, অংশ, ন্যাস-ধৈবত। ধৈবতী এবং মধ্যমা জাতিদ্বয় সহযোগে উৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—স্বল্পগান্ধার। মন্দ্রমধ্যমযুক্ত। পঞ্চম বর্জিত।

কৈশিক ককুভ। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত। কৈশিকী জাতি সমুৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—তারগান্ধার এবং মন্দ্রপঞ্চমযুক্ত।

নট্টনারায়ণ। গ্রহ, অংশ, ন্যাস ষড্‌জ। মধ্যমা এবং পঞ্চমী জাতিদ্বয়-সমুৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—কাকলীনিষাদ এবং অন্তরগান্ধারযুক্ত। তারগান্ধারের প্রয়োগ হয়। কাল—শরৎ। রস—করুণ।

পূর্বপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ

শঙ্করাভরণ। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

কল্লিনাথের উদ্ধৃত শ্লোক:—

যদায়ং মধ্যমাদিশ্চেৎস্যান্মন্দ্রস্বরমুদ্রিতঃ।
ছায়ান্তরেণ যুক্তঃ সশঙ্করাভরণস্তদা॥

মধ্যমাদি যদি মন্দ্রস্বরযুক্ত হয় এবং এতে অপর রাগের ছায়াপাত ঘটে তবে এটি শঙ্করাভরণ রাগে পরিবর্তিত হবে।

মধ্যমাদির পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এটি মধ্যমগ্রাম নামক গ্রামরাগের অঙ্গ। এর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর—মধ্যম।

ঘণ্টারব। গ্রহ, অংশ—ধৈবত। ন্যাস—মধ্যম। ভিন্নষড়্‌জের অঙ্গ।

বৈশিষ্ট্য—মন্দ্রগান্ধার এবং তারষড়্‌জযুক্ত।

হংসক। গ্রহ, অংশ—ধৈবত। ভিন্নষড়্‌জের অঙ্গ। ষড়্‌জ বর্জিত।

দীপক। গ্রহ—ষড়্জ। ন্যাস—মধ্যম। ভিন্নকৈশিকমধ্যম থেকে উৎপন্ন।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। এই রাগাঙ্গটির সঙ্গে ধন্যাসিকার সাদৃশ্য আছে। তবে এটি উচ্চতর স্বরে গীত হয়ে থাকে। কল্লিনাথোক্ত শ্লোকে একে সঙ্কীর্ণ বলাতে এটি ভাষারাগরূপে সূচিত হয়েছে।

রীতি। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্জ। ভিন্নষড়্জ থেকে উৎপন্ন। সম্পূর্ণজাতীয়।

পূর্ণাটিকা। গ্রহ, ন্যাস—ষড়্জ। অংশ—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—তারষড়্জ এবং মন্দ্রমধ্যমযুক্ত। সমস্বর। শ্লোকে এই রাগকে সঙ্কীর্ণা বলা হয়েছে। এতে মনে হয় এটি ভাষা হিসাবেও পরিচিত ছিল।

লাটী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। লাট দেশজ।

পল্লবী। গ্রহ, অংশ—ষড়্জ। ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। সমস্বর। তারষড়্জের প্রয়োগ হয়।

পূর্বপ্রসিদ্ধ ভাষাঙ্গ

গাম্ভীরী—গ্রহ, অংশ—ষড়্জ। ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—সমস্বর। সম্পূর্ণজাতীয়। তারষড়্জের প্রয়োগ হয়।

বেহারী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য নিষাদ বর্জিত। সমস্বর। তার ষড়্জ এবং মন্দ্রমধ্যম যুক্ত।

শ্বসিতা। গ্রহ, ন্যাস—গান্ধার। অংশ ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—তারস্বরের প্রয়োগ হয় না। সমস্বর। মন্দ্রষড়্জযুক্ত। ঋষভ, পঞ্চম বর্জিত।

উৎপলী—গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। তারধৈবত, মন্দ্রনিষাদ, তারষড়্জ এবং তারপঞ্চম যুক্ত। সমস্বর।

গোলী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—গান্ধার, নিষাদ বর্জিত। তারঋষভযুক্ত। ধৈবত, ঋষভ এবং ষড়্জ বহুল।

নাদান্তরী। গ্রহ, অংশ—মধ্যম। ন্যাস—পঞ্চম।

বৈশিষ্ট্য—তারঋষভ এবং মন্দ্রঋষভ যুক্ত। নিষাদ, ধৈবত এবং ষড়্জের বাহুল্য। সম্পূর্ণজাতীয়। গান্ধার অল্প।

নীলোৎপলী। গ্রহ, অংশ—ধৈবত। ন্যাস—তারষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—মন্দ্রপঞ্চমযুক্ত। সমস্বর। নিষাদ, গান্ধার বর্জিত।

ছায়া। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—মধ্যম।

বৈশিষ্ট্য—মন্দ্রঋষভ, তারগান্ধারযুক্ত। নিষাদের স্বল্প এবং পঞ্চমের বহুল প্রয়োগ। ষড়্জ বর্জিত।

তরঙ্গিণী। গ্রহ, ন্যাস—ঋষভ। অংশ—ধৈবত।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। মন্দ্রষড়্জ এবং মন্দ্রমধ্যম যুক্ত। সমস্বর। তারঋষভ,, তারধৈবতযুক্ত। সঙ্কীর্ণা অর্থাৎ স্বরাখ্যা ভাষা হিসাবেও এটি পরিগণিত হয়।

বেরঞ্জী। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—ষড়্জ।

বৈশিষ্ট্য—সম্পূর্ণজাতীয়। মন্দ্রষড়্জ এবং তারপঞ্চম যুক্ত। পঞ্চম স্বল্প এবং নিষাদ, ধৈবতের বহুল প্রযোগ।

পূর্বপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াঙ্গ

পূর্বে বারটি ক্রিয়াঙ্গের উল্লেখ করা হযেছে। এদের গ্রহ, অংশ এবং ন্যাসস্বর—ষড়্জ। অপর স্বরগুলিও সমানভাবে প্রযুক্ত হয়। স্বরগুলি গমকযুক্ত।

পূর্বপ্রসিদ্ধ উপাঙ্গ

পূর্ণাট। গ্রহ—ধৈবত। ন্যাস—মধ্যম। ভিন্নষড়জ থেকে উদ্ভূত।

বৈশিষ্ট্য - সম্পূর্ণজাতীয়। পঞ্চমবহুল।

মতান্তরে—এটি সালগ বা ছায়ালগরাগ।

দেবাল। গ্রহ, অংশ, ন্যাস - মধ্যম। বঙ্গালের উপাঙ্গ।

বৈশিষ্ট্য—ঋষভ এবং ধৈবত মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। মধ্যম কম্পিত। নিষাদ, ধৈবত এবং ঋষভ অল্প। প্রাচীনগণ এই রাগে কামোদের লক্ষণ আরোপ করতেন।

কুরুঞ্জী বা গুরুঞ্জিকা। গ্রহ, অংশ, ন্যাস—পঞ্চম। ললিতার উপাঙ্গ।

বৈশিষ্ট্য -মন্দ্রগান্ধারযুক্ত। ঋষভ, নিষাদ বর্জিত। ষড়্জ এবং পঞ্চমের বহুল প্রয়োগ।

প্রবন্ধ-অধ্যায়

প্রবন্ধ অধ্যায়ে নানাপ্রকার গীতসম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। রঞ্জকত্ব-গুণসম্পন্ন স্বরসন্দর্ভকে গীত বলে। সন্দর্ভ শব্দটি সম্বন্ধেও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সন্দর্ভ বললেই পরম্পরাযুক্ত রচনা বোঝায় অর্থাৎ সুসম্বদ্ধ বস্তু। এখানে একটা তর্ক তোলা যেতে পারে। স্বর শব্দটির মধ্যেই রঞ্জকত্ব গুণটি নিহিত আছে কেন না শ্রোতৃচিত্তকে যা স্বতই রঞ্জন করে তাই হচ্ছে স্বর। তাহলে আবার বিশেষভাবে রঞ্জক শব্দটি ব্যবহার করবার হেতু কি? শুধু 'স্বরসন্দর্ভ'কে 'গীত' বলা হয় বললেই তার রঞ্জকত্ব সিদ্ধ হয়। কল্লিনাথ বিচার করে বলেছেন যে ওইটুকুই যথেষ্ট নয়, রঞ্জকত্ব শব্দটি বিশেষ-ভাবে বলা আবশ্যক কেন না স্বরগুলি স্বতই রঞ্জনকারী হওয়া সত্ত্বেও তার সন্দর্ভের মধ্যে যে সব সময় রঞ্জকত্বগুণ থাকবে এমন কথা বলা যায় না। 'রাগ' শব্দটির মধ্যেও রঞ্জকত্বগুণ বর্তমান। আমরা জানি রঞ্জন করে বলেই তার আখ্যা রাগ। কিন্তু, এই রাগ গাইবার সময় কোথাও বিবাদী-স্বরের প্রয়োগ হলে তাতে রাগপ্রকৃতির হানি হয়ে একটি অরঞ্জক স্বরের সমষ্টি হয়ে দাঁড়াবে। বিবাদী স্বরকে বাদ দিয়ে তবে রঞ্জকত্ব বজায় রাখা সম্ভব। "রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো গীতমিত্যভিধীয়তে"—এই উক্তিতে 'রঞ্জক' শব্দটি স্বর-এর বিশেষণ নয় 'সন্দর্ভ'-এর বিশেষণ। অতএব অরঞ্জক স্বরসন্দর্ভ ঘটাবার সম্ভাবনাকে বাদ দিয়েই এইরূপ সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে।

গীত দুই প্রকার —গান্ধর্ব এবং গান। শার্ঙ্গদেব গান্ধর্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা স্পষ্ট নয়।

অনাদিসম্প্রদায়ং যৎ গান্ধর্বৈঃ সম্প্রজুয্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ॥

গান্ধর্বগণ-কর্তৃক যে অনাদি সম্প্রদায়-সংরক্ষিত বস্তু সম্প্রযুক্ত হয় তাকেই বলা হয় গান্ধর্ব গীত। এই 'অনাদি সম্প্রদায়' বলতে কি বোঝায় শার্ঙ্গদেব তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেন নি। টীকাকার সিংহভূপাল বলছেন যে গান্ধর্বগণ যে গীত গেয়ে গেছেন তাকে তাঁরা নিজের বুদ্ধিতে সৃষ্টি করেন নি। অনাদিমান্য যে সম্প্রদায় সেখান থেকে গ্রহ, অংশ, মূর্ছনা প্রভৃতি নিয়মদ্বারা

সংগঠিত যে গীত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেটি গুরুশিষ্য পরম্পরা পরিজ্ঞাত হয়ে এসেছে। কল্লিনাথ বলছেন—অনাদিসম্প্রদায় শব্দে গান্ধর্ব গীতের বেদবৎ অপৌরষেয়ত্ব সূচিত হয়েছে। জাতি, গ্রামরাগ, ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা যা রাগবিবেকে বর্ণিত হয়েছে তাই হচ্ছে গান্ধর্বের অন্তর্গত। কল্লিনাথ গান্ধর্বকে মার্গ বলে অভিহিত করেছেন। মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলছেন—

যো মার্গিতবিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
দেবসঃ পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তোহভ্যুদয়প্রদঃ ॥

বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের প্রদর্শিত পন্থায় ভরতাদি ঋষি-কর্তৃক মহাদেব এবং অপরাপব দেবগণের সম্মুখে যে সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছিল তাই মার্গসঙ্গীত নামে খ্যাত। এ থেকে মার্গসঙ্গীত যে সেকালেব·নাট্য-সঙ্গীত সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। ভরত মুনি নাট্য-রচনা করে তাতে কৈশিকী বৃত্তি (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্কুল নৃত্যগীত এবং চারুবিলাস-যুক্ত বৃত্তি) আরোপের জন্য ব্রহ্মার সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়—নাট্যগৃহও ব্রহ্মার পরামর্শ অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। এইসব কারণেই বিরিঞ্চি কর্তৃক মার্গিত বলা হয়েছে। প্রাচীন গান সবই নাট্যে বিনিযুক্ত হয়েছে এটাও আমরা পূর্ববর্ণনায় দেখেছি।

এইটুকু বললেই আমার মনে হয় মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ দেওয়া হয় না। নাট্যসঙ্গীতে কী মার্গিত হযেছে সে সম্বন্ধেও আমাদের আলোচনা করা দরকাব। ইতিপূর্বে জাতিগানের তালপ্রসঙ্গে আমরা চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণ—এই তিনটি মার্গের কথা বলেছি। সুপ্রাচীন সঙ্গীতে এই ত্রিমার্গের ব্যবহার কি রকম ছিল সে সম্বন্ধে স্পষ্ট না জানা গেলেও ভরতপ্রযুক্ত সঙ্গীতে এই ত্রিমাগের প্রয়োগ যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল সেটি নাট্যশাস্ত্র থেকে প্রমাণিত হয। বিশেষ করে সে যুগের উচ্চস্তরের সঙ্গীতে দক্ষিণ মার্গের ব্যবহার বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী যুগে যখন রাগসঙ্গীতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে তখনও এই তিনটি মার্গকে আশ্রয় করে গান করাই প্রচলিত রীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শার্ঙ্গদেব রাগসঙ্গীতের যে সমস্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি সবই দক্ষিণ মার্গ অবলম্বনে রচিত। আমার বিশ্বাস সঙ্গীতে এই ত্রিমার্গের প্রাধান্যের জন্যই কালক্রমে জাতি, গ্রামরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভা প্রভৃতি মার্গসঙ্গীত

বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। পরবর্তী যুগে দেশী সঙ্গীতের প্রসারের জন্য এই তিনটি মার্গ অবলম্বন করে তালরক্ষা বা মাত্রাবিন্যাস দেখিয়ে দেবার রীতি চলে গেলেও মুখে মুখে 'মার্গসঙ্গীত' এই আখ্যাটি রয়ে গেল। প্রয়োগ নেই অথচ কোন আখ্যার ব্যবহার যদি থাকে তাহলে তার নানা কাল্পনিক ব্যাখ্যার পরিকল্পনা হতে থাকে। মার্গসঙ্গীত-সম্বন্ধেও এইভাবে নানা অপব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে।

বাগ গেয়কারগণ দেশী রাগাদির প্রয়োগে যে জনরঞ্জনকারী গীত রচনা করেন তাকে বলা হয়েছে 'গান'। প্রবন্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত তাবৎ গীতপদ্ধতিই গান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

গান দুই প্রকার—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ গান ধাতু এবং অঙ্গদ্বারা আবদ্ধ। এই বদ্ধত্বহেতুই এর নাম প্রবন্ধসঙ্গীত। অনিবদ্ধ গান আলপ্তির মত বন্ধহীন। নিবদ্ধ সঙ্গীত তিন রকমের—প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপক।

প্রবন্ধের অবয়বগুলিকে ধাতু বলা হয়। এই রকম চারটি ধাতু আছে—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। প্রবন্ধের প্রথম ভাগ হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ অর্থাৎ যা দিয়ে গানের প্রারম্ভ হয় তাই উদ্‌গ্রাহ। এর পরের অংশটি মেলাপক। উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব এই দুই অংশের মেলন ঘটায় বলে এর আখ্যা মেলাপক। প্রবন্ধের তৃতীয় অবয়বের নাম ধ্রুব। শার্ঙ্গদেব বলছেন—ধ্রুবাত্বাচ্চ ধ্রুবঃ। কল্লিনাথ বুঝিয়ে বলছেন যে নিত্যত্বহেতুই এই অংশটির নাম ধ্রুব। প্রবন্ধে ধ্রুব অংশটি কখনই পরিত্যক্ত হবে না। দ্বিধাতুক প্রবন্ধে মেলাপক, আভোগ অথবা ত্রিধাতু প্রবন্ধে কেবলমাত্র মেলাপক বর্জিত হতে পারে, কিন্তু ধ্রুব অংশটি কখনই বর্জিত হবে না। ধ্রুবের পর আভোগ হচ্ছে অন্তিম অবয়ব। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যভাগে আর একটি ধাতুরও অস্তিত্ব আছে সেটি হচ্ছে অন্তরা। এই অন্তরা অংশটি সালগসূড় প্রবন্ধে দেখা যায়।

প্রবন্ধের অঙ্গ ছয়টি। এগুলি হচ্ছে—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল। তেন শব্দটি মঙ্গলার্থপ্রকাশক। তেনক অঙ্গটিকে নেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পাট, বিরুদকে তুলনা করা হয়েছে হস্তদ্বয়ের সঙ্গে। পাট হচ্ছে ধিগি ধিগ্ প্রভৃতি বাদ্যাক্ষর অর্থাৎ বোল আর বিরুদ হচ্ছে গুণ-বাচক অংশ। সিংহভূপাল বলছেন—গুণো নাম ভুজবলভীমাদি বিরুদশব্দেন উচ্যত। পাট যেহেতু করব্যাপারের প্রতীক সেহেতু একে হাতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। স্বর হচ্ছে ষড়্‌জাদি স্বর যাকে সা, রে, গা, মা প্রভৃতি অক্ষরে

প্রকাশ করা হয়। পদ বলতে সমগ্র গানটিকেই বোঝায়। শার্ঙ্গদেব বলছেন বিরুদ অংশটি ছাড়া আর বাকি অংশটিই পদ। বিরুদ বা গুণবাচক অংশটি সাধারণত পদের শেষে থাকে। তাল এবং স্বর—এই দুটিই প্রবন্ধের গতিনির্দেশ করে। এই কারণে এই দুটিকে পদদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অ্যাডায়ার সংস্করণে (পৃঃ ১৯১—শ্লোক ১৫) ভুলক্রমে "প্রবন্ধগতিহেতুত্বাৎ-পাটৌ" মুদ্রিত হয়েছে। এটি হবে "প্রবন্ধগতিহেতুত্বাৎপাদৌ"। কল্লিনাথের ব্যাখ্যায় শ্লোকংশটি এইভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি তেন শব্দটি মঙ্গলার্থবাচক। মহাবাক্যের আদিতে যেমন—ওঁ তৎসৎ—এইরূপ তত্ত্ব নির্দেশে ব্রহ্মকে প্রকাশ করা হয় সেরকম তেনক অঙ্গে এই ধরণের বাক্য প্রয়োগদ্বারা মঙ্গল নির্দেশ কবা হযে থাকে।

প্রবন্ধের পাঁচটি জাতি-মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, ভাবনী এবং তারাবলী। পূর্বোক্ত ছটি অঙ্গে বদ্ধ জাতির নাম মেদিনী। পঞ্চাঙ্গযুক্ত হলে সেটি হবে নন্দিনী, চতুরঙ্গ দীপনী, ত্র্যঙ্গ ভাবনী এবং দ্ব্যঙ্গ তারাবলী। মতান্তরে এই পাঁচটি জাতিব অপর নাম হচ্ছে—শ্রুতি, নীতি, সেনা, কবিতা এবং চম্পূ। এই পাঁচটি নামের অপর অর্থও আছে এবং সিংহভূপাল সেগুলির উল্লেখ করেছেন। শ্রুতি-শব্দটি বেদের শিক্ষা, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, নিঘণ্টু (নিঘণ্টু ?) ছন্দ এবং ব্যাকরণ-এই ছটি অঙ্গ অধিকার করে আছে। এই কারণেই এই শব্দদ্বারা প্রবন্ধের ষডঙ্গত্ব বোঝান হয়েছে। নীতির পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে—কর্মারম্ভেব উপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকালবিভাগ, বিনিপাতপ্রতীকার এবং কাযসিদ্ধি। সেনার চারটি অঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি। কবিতার তিনটি অঙ্গ—শক্তি, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস। চম্পূর দুটি অঙ্গ, গদ্য এবং পদ্য। এই পাঁচটি সংজ্ঞার ব্যাপকত্ব সঙ্গীতের উপর আরোপ করা হয়েছে, অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ 'নীতি'-শব্দে পঞ্চাঙ্গযুক্ত গীত, চতুরঙ্গ 'সেনা' শব্দে চতুরঙ্গসম্পন্ন গীত, ত্র্যঙ্গ, 'কবিতা'-শব্দে ত্র্যঙ্গযুক্ত গীত এবং দ্ব্যঙ্গ চম্পূশব্দে দ্ব্যঙ্গ সমন্বিত গীত বোঝান হয়েছে।

সাধারণভাবে প্রবন্ধের দুটি প্রকারভেদ আছে—অনির্যুক্ত এবং নির্যুক্ত। ছন্দ (ত্রিষ্টুপ প্রভৃতি), তাল (চচ্চৎপুট প্রভৃতি), অঙ্গ, ধাতু, রস, ভাষা প্রভৃতি নিয়মদ্বারা যথাযথভাবে বদ্ধ না হলে সেটি হবে অনির্যুক্ত প্রবন্ধ। আর, এই সকল নিয়মদ্বারা উপনিবদ্ধ হলে সেটি হবে নির্যুক্ত।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে প্রবন্ধসঙ্গীত হচ্ছে নিবদ্ধপর্যায়ের অন্তর্গত

অর্থাৎ ধাতু এবং অঙ্গদ্বারা আবদ্ধ। এখন একে অনির্যুক্ত বলেও স্বীকার করা হচ্ছে। নিবদ্ধ গীত কিভাবে অনির্যুক্ত হবে এবিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে অনির্যুক্ত বলতে ঠিক অনিবদ্ধ বোঝায় না। অনির্যুক্ত প্রবন্ধ নিবদ্ধ গানের রীতিকে একেবারে নস্যাৎ কখনই করবে না, তবে সবগুলি নিয়ম মেনে চলবে না এ পর্যন্ত বলা যায়।

প্রবন্ধের তিনটি বিভাগ—সুড়, আলি, বিপ্রকীর্ণ।

শুদ্ধসুড হচ্ছে আটটি। সিংহভূপাল এদের মার্গসুড বলেছেন। এগুলি হচ্ছে,—এলা, করণ, ঢেঙ্কি, বর্তনী, ঝোম্বডা, লম্ভ, রাসক এবং একতালী।

আলিজাতীয় প্রবন্ধ চব্বিশটি—বর্ণ বর্ণস্বর, গদ্য, কৈবাড, অঙ্কচারিণী, কন্দ, তুরগলীল, গজলীল, দ্বিপদী, চক্রবাল, ক্রৌঞ্চপদ, স্বরার্থ, ধ্বনিকুট্টনী, আর্যা, গাথা, দ্বিপথক, কলহংস, তোটক, ঘট, বৃত্ত, মাতৃকা, রাগকদম্বক, পঞ্চ-তালেশ্বর, তালার্ণব। এইগুলি সুডক্রমের মধ্যে মিশ্রিতও থাকতে পারে। পূর্বে আটটি সুডের উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সুডালিক্রম মিলিয়ে প্রবন্ধ-সংখ্যা হল বত্রিশ।

সুডালিক্রম ভিন্ন অপর বিক্ষিপ্ত গানগুলির নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্রকীর্ণ। এর সংখ্যা বহু। শার্ঙ্গদেব তার থেকে ছত্রিশটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হচ্ছে—শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গী, পঞ্চানন, উমাতিলক, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী, বস্তু, বিজয়, ত্রিপথ, চতুর্মুখ, সিংহলীল, হংসলীল, দণ্ডক, ঝম্পট, কন্দুক, ত্রিভঙ্গী, হরবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্ক, শ্রীবর্ধনী হর্ষবর্ধন, বদন, চচ্চরী, চর্যা, পদ্ধডী, রাহডী, বীরশ্রী, মঙ্গলাচার, ধবল, মঙ্গল, ওবী, লোলী, ঢোল্লরী, দন্তী।

শুদ্ধসুডের বর্ণনা উপলক্ষ্যে শার্ঙ্গদেব প্রথমে, এলা নামক গীতিরূপের বর্ণনা দিয়েছেন। এই গীতরূপের উদ্গ্রাহ অংশটি তিন ভাগে বিভক্ত—খণ্ডদ্বয়, প্রয়োগ এবং পল্লব। প্রথম অংশটিকে শার্ঙ্গদেব অঙ্ঘ্রি বলেছেন। অঙ্ঘ্রি বলতে চরণ, বৃক্ষমূল বা চতুর্থাংশ বোঝায়। এই খণ্ডদুটির পদ অর্থাৎ বাক্যাংশ ভিন্ন কিন্তু গাইবার পদ্ধতি একই রকম। এইরকম একপদ্ধতিতে গাইবার নাম 'একধাতু'। গাইবার ধরণে ভেদ থাকলে তাকে বলা হয়—ভিন্নধাতু। এই খণ্ডদুটি অনুপ্রাসযুক্ত, অর্থাৎ পদান্তে মিল থাকবে। শার্ঙ্গদেব বলছেন—"অঙ্ঘ্রৌ খণ্ডদ্বয়ং সানুপ্রাসমেকেন ধাতুনা।" কল্লিনাথ টীকায় বলছেন—বর্ণসাম্যমনুপ্রাস ইতি হি তস্য লক্ষণম্।

খণ্ডদুটির পরবর্তী ভাগ হচ্ছে প্রয়োগ। প্রয়োগ-শব্দটির ব্যাখ্যা করে কল্লিনাথ বলছেন—প্রয়োগ হচ্ছে অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি। সিংহভূপাল বলছেন—প্রয়োগঃ গমকসন্দর্ভঃ, অর্থাৎ গমকযুক্ত আলাপের মত স্বরের একটা কাজ করা হত। প্রয়োগ এবং আলাপের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রয়োগ সব সময় গমকের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং গানের মধ্যে স্বল্প আলাপযুক্ত অংশ হচ্ছে প্রয়োগ। আলপ্তির মত এর ব্যাপকতা নেই।

প্রয়োগের পর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে পল্লব। পল্লবের তিনটি পদ আছে—প্রথম দুটি বিলম্বিত, তৃতীয়টি দ্রুত।

এই তিনটি ভাগ মিলিয়ে একটি পাদ হল এবং সম্পূর্ণ পাদটি উদ্‌গ্রাহের অন্তর্ভুক্ত। উদ্‌গ্রাহ তিন বার গাওয়া হয়। তৃতীয় বার গাইবার সময় প্রয়োগে সম্বোধনপদ যোজিত হবে এবং কেবলমাত্র প্রয়োগটুকু গাওয়া হবে পল্লবের অনুষ্ঠান হবে না। শাঙ্গ দেব বলছেন যে সোমেশ্বর প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ-গণ এই তৃতীয় পদের প্রয়োগটিকেই মেলাপক বলে স্থির করেছেন। এই প্রয়োগটি আগের দুবারে যে প্রয়োগ গাওয়া হয়েছে তার মত হবে না। এটি হবে অন্যরকম অর্থাৎ ভিন্নধাতুক।

এর পরে ধ্রুব অংশে মধ্যবিলম্বিত লয়ে স্তুত্য (যার স্তব করতে হয়) অর্থাৎ ইষ্টদেবতা, রাজাদি বা নায়কের নামাঙ্কিত পদত্রয় গাওয়া হয়ে থাকে। এই তিনটি পদের প্রথম দুটি একধাতুক এবং তৃতীয়টি ভিন্নধাতুক হবে, অর্থাৎ প্রথম দুটি সমান এবং পরেরটি বিসদৃশভাবে গাওয়া হবে।

এইরকম ধ্রুব আচরণের পর আভোগের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। বাগ-গেয়কার আভোগ অর্থাৎ গীতের শেষ অংশে নিজের নামটি যোজনা করেন।

আভোগ গাওয়া হয়ে গেলে ধ্রুবাংশটি আর একবার গেয়ে সেইখানেই গানের সমাপ্তি হবে।

এলাজাতীয় গানের গ্রহ অর্থাৎ আরম্ভ বিষমে হয়ে থাকে, অর্থাৎ, হয় অতীত নয় অনাগত হবে। কল্লিনাথ টীকায় বলছেন—বিষমঃ সমানাৎ অন্যঃ অতীত অনাগতয়োঃ একতর ইত্যর্থঃ। বাগ্‌গেয়কারেচ্ছয়া অতীতো বা অনাগতো বা গ্রহঃ কর্তব্য ইত্যুক্তং ভবতি।

একটি হল এলার সাধারণ বা সামান্য লক্ষণ।

এই গীতে ব্যবহৃত তাল হল মঠ, দ্বিতীয়, কঙ্কাল এবং প্রতিতাল। ত্যাগ সৌভাগ্য, শৌর্য, ধৈর্য, প্রভৃতি হচ্ছে এই গানের বর্ণনীয় বস্তু।

এলায় আকৃতিবর্ণনার পর শার্ঙ্গদেব উক্তনামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করেছেন। এলা-শব্দটি অ+ই+ল+আ (স্ত্রী) এইভাবে ভেঙে নেওয়া হয়েছে। আকারে বিষ্ণু, ই-কারে কামদেব এবং লকারে লক্ষ্মী সূচিত হয়েছে, অর্থাৎ, ধর্ম, অর্থ এবং কাম—তিনটিই এই সঙ্গীতে বর্তমান।

এর পর এলার উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগে যেসব পদের উল্লেখ করা হয়েছে শার্ঙ্গদেব সেগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। সম্পূর্ণ এলাটি গাইলে সবসুদ্ধ ষোলোটি পদ হয়। এই প্রত্যেকটি পদের এক-একটি নাম আছে। এইসব নামের সার্থকতা কি এসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং এগুলিকে কুসংস্কার বলে অভিহিত করাও আশ্চর্য নয়, কিন্তু আসলে এই নামগুলি দেবার উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি পদকে আলাদাভাবে নির্দেশ করা। উদ্‌গ্রাহ অংশে একই পদ তিনবার গাওয়া হয়। এর মধ্যে আবার দুটি একই রকম। অতএব এই দীর্ঘ গীতরূপের প্রত্যেকটি অংশ যাতে সুনির্দিষ্ট থাকে এই কারণেই প্রত্যেকটি পদের আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। এই নামগুলি কল্লিনাথের মতানুসারে নিচের ছকে সাজিয়ে দেওয়া হল।

এলা

উদ্‌গ্রাহ

	প্রথম আবৃত্তি	দ্বিতীয় আবৃত্তি	তৃতীয় আবৃত্তি
১। প্রথম খণ্ড / দ্বিতীয় খণ্ড	কাম	বিকারী	গীতক
২। প্রয়োগ	মন্মথ	মান্ধাতা	
৩। পল্লব			
প্রথম পদ	কান্ত	সুমতী	
দ্বিতীয় পদ	জিত	শোভী	
তৃতীয় পদ	মিত্র (মত্ত)	সুশোভী	

মেলাপক

প্রয়োগ	অঞ্চিত (উচিত)

ধ্রুব

প্রথম পদ	বিচিত্র
দ্বিতীয় পদ	বাসব
তৃতীয় পদ	মৃদু

আভোগ

সুচিত্র

সিংহভূপাল কল্লিনাথের মত পদগুলির সঙ্গে নামের সংযোগ দেখিয়ে দেন নি। তিনি অভিন্ন্র খণ্ডদ্বয়কে একত্র করে ধরেন নি, আলাদা পদ হিসাবে ধরেছেন এবং প্রয়োগকেও তিনি পদ হিসাবে ধরেন নি। সম্ভবত প্রয়োগের কোন বাক্যাংশ নেই বলেই তিনি এই অংশকে পদহিসাবে গণনা করেন নি।

এই ষোলোটি পদের ষোলটি অধিষ্ঠাতৃ দেবতার উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেছেন—পদ্মালয়া, পত্রিণী, রঞ্জনী, সুমুখী, শচী, বরেণ্যা, বায়ুবেগা, বেদিনী, মোহিনী, জয়া, গৌরী, ব্রাহ্মী, মাতঙ্গী, চণ্ডিকা, বিজয়া, চামুণ্ডা।

পূর্ববর্ণিত পদগুলির আবার দশটি প্রাণের উল্লেখ করা হয়েছে—সমান, মধুর, সান্দ্র, কান্ত, দীপ্ত, সমাহিত, অগ্রাম্য, সুকুমার, প্রসন্ন এবং ওজস্বী। এই প্রাণগুলি কোন্ কোন্ পদের সঙ্গে রয়েছে সেটি কল্লিনাথ ব্যাখ্যা করেছেন।

অল্পাক্ষর ধ্বনিযুক্ত পদের প্রাণ হচ্ছে সমান। এটি প্রয়োগের আত্মা। আমরা পূর্বে বলেছি প্রয়োগ হচ্ছে অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি। তাহলে অল্পাক্ষর-শব্দটি এখানে কিভাবে প্রযোজ্য হবে সেটি বুঝিয়ে কল্লিনাথ বলছেন প্রয়োগে সম্বোধন পদযুক্ত হয় এটা আমরা জানি, সুতরাং একটু-আধটু অক্ষর যে নেই তা নয়। অল্পধ্বনি কেন? না, প্রয়োগে যে গমকালপ্তি সেটা খুব বেশি এবং সম্পূর্ণ নয়। কল্লিনাথের মতে মন্মথ এবং মান্ধাতা নামক দুই প্রয়োগেব প্রাণ হচ্ছে সমান।

স্বল্পনাদ এবং অল্পমূর্ছনাযুক্ত প্রাণের নাম মধুর। অল্পমূছনা মানেই তান। মূর্ছনা থেকে স্বরের লোপ করেই তানের উৎপত্তি হয়। স্বল্পনাদ কেন হয় সেটি বুঝিয়ে কল্লিনাথ বলছেন তানীকরণে আদিম স্বরটিকে উচ্চারণ করে আরোহণ বা অবরোহণক্রমে মধ্যস্থিত স্বরাদির স্পর্শমাত্র করে অন্তিমস্বর উচ্চারণ করা যেতে পারে। এইরকম হলেই সেটি স্বল্পনাদ হল। এটি পল্লবের কান্তি এবং সুমতির সঙ্গে যুক্ত।

নিবিড়াক্ষর, অল্পধ্বনি এবং তারগতিযুক্ত প্রাণের নাম সান্দ্র। এটি পল্লবের দ্বিতীয় বিলম্বিত পদ জিত এবং শোভীব সঙ্গে যুক্ত। দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়বার আবৃত্তির সময় সান্দ্রপ্রাণকে আশ্রয় করবার জন্য এই পদটিকে কিছু চড়ায গাইতে হবে।

কান্তধ্বনিযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় রক্তিযুক্ত প্রাণের নাম কান্ত। পল্লবের অন্তিমে মিত্র (মত্ত) এবং সুশোভী নামক দুই দ্রুত পদের সঙ্গে এটি যুক্ত।

দীপ্তনাদযুক্ত অর্থাৎ চড়া এবং পূর্ণস্বরযুক্ত প্রাণের নাম দীপ্ত। এটি দ্বিখণ্ডযুক্ত প্রথম পাদ—কাম, বিকারী এবং গীতক-এর সঙ্গে যোজনীয়।

স্থায়ীতে স্থিত অর্থাৎ স্থায়ীবর্ণে অধিষ্ঠিত প্রাণের নাম—সমাহিত। এটি উচিত বা অঞ্চিত নামক তৃতীয় প্রয়োগের আত্মা।

অক্ষর এবং নাদের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অগ্রাম্য। বাক্যাংশের উত্তম প্রতীতির জন্য আমরা একটি পদের পুনরাবৃত্তি করি। কখনো ·কখনো চক্রবাল রীতিতে এটি করা হয়ে থাকে। এটিকেই অগ্রাম্য বলা হয়েছে। এটি ধ্রুবের প্রথম পদ বিচিত্রে যোজনীয়।

বর্ণ (অক্ষর), নাদ (স্বর) এবং মূর্ছনার কোমলত্বসূচক প্রাণের নাম সুকুমার। এটি বাসবাখ্য ধ্রুবে যোজনীয়।

পদ, স্থান (মন্দ্র, মধ্য, তার) এবং স্বরের প্রসাদত্ব অর্থাৎ অবিলম্বে অর্থপ্রকাশের যোগ্যতা—এর নাম প্রসন্ন। এটি মৃত্যুসংজ্ঞক ধ্রুবের সঙ্গে যোজনীয়।

ওজোগুণযুক্ত প্রাণ হচ্ছে ওজস্বী। ওজ-শব্দটি সমাসবাহুল্য নির্দেশ করে। এটি আভোগস্থ সুচিত্রে যোজনীয়।

এলা চতুর্বিধ— গণৈলা, মাত্রৈলা বর্ণৈলা এবং দেশৈলা।

প্রথমে গণৈলার বর্ণনা উপলক্ষ্যে গণ-শব্দের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। গণ বলতে সমূহ বোঝায়। গণ দুই প্রকার—বর্ণ গ এবং মাত্রাগণ। বর্ণ আবার দুরকম—গুরু এবং লঘু।

গুরুবর্ণের লক্ষণ কি ?—অনুস্বার, বিসর্গসংযুক্ত, ব্যঞ্জনান্ত (হলন্ত) দীর্ঘ—আকারাদি স্বরসংযুক্ত, যুক্তরবর্ণ (অর্থাৎ যে বর্ণের পরবর্ণ যুক্ত)—এইসব বর্ণগুলি গুরু। পদান্তে লঘুবর্ণও বিকল্পে গুরু হয়। গুরুবর্ণ দ্বিমাত্রিক, অর্থাৎ একটি গুরুবর্ণের দুটি মাত্রা। লিপিতে গুরুবর্ণকে বক্ররেখাদ্বারা বোঝানো হয়। অর্থাৎ এটি 'ऽ' এইরকম। লঘুবর্ণ ঋজুরেখাদ্বারা চিহ্নিত হয়। এটি '।' এই রকম। ছন্দশাস্ত্র অনুযায়ী প্র' এবং 'হ্র' বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ বিকল্পে লঘু হয়। শার্ঙ্গদেব বলছেন—"ভ্রে হ্রে প্রে চ রহোর্যোগে স বা লঘুঃ।" সিংহভূপাল বলছেন—"স চ লঘুর্ভ্রবর্ণৈর্জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়য়ো রেফহকারযোর্যোগে বা পরতঃ স্থিতে সতি বিকল্পেন লঘুর্ভবতি।

প্রাকৃত ভাষায় পদান্তে এ, ও, হিং হিং—এই চারটি বর্ণ বিকল্পে লঘু হয়। অপভ্রংশে পদমধ্যে হুং, হে, এ, ও, ঈ—এই পাঁচটি বর্ণ বিকল্পে লঘু হয়।

তিনটি বর্ণে একটি গণ হয়। এই রকম আটটি গণ আছে। এগুলি হচ্ছে—মগণ, যগণ, রগণ, সগণ, তগণ, জগণ, ভগণ এবং নগণ।

মগণ বলতে তিনটি গুরু অক্ষর বোঝায়। যথা—sss

যগণের পূর্বাক্ষর লঘু এবং পরের দুটি গুরু। যথা lss

রগণের আদি এবং অন্তে গুরুবর্ণ মধ্যে হ্রস্ব। যথা sls

সগণের আদি বর্ণদ্বয় লঘু এবং শেষেরটি গুরু। যথা lls

তগণের আদিবর্ণদ্বয় গুরু এবং শেষেরটি লঘু। যথা ssl

জগণের মধ্যবর্ণটি গুরু, প্রথম এবং অন্তবর্ণ লঘু। যথা lsl

ভগণের অন্তে দুটি লঘুবর্ণ এবং প্রথমে গুরু। যথা sll

তিনটি লঘুবর্ণের সমাবেশে নগণ হয়। যথা lll

মাত্রার অপর নাম কলা। লঘুর চিহ্নস্বরূপ "ল" ব্যবহৃত হয়। মাত্রা হিসাবে যে গণবিভাগ হয় সেটি এইরূপ :—

ছগণ—ছমাত্রা—sss

পগণ—পাঁচ মাত্রা—ssl

চগণ—চার মাত্রা—ss

তগণ—তিন মাত্রা—sl

দগণ—দুই মাত্রা—s

গুরু বা লঘু অক্ষরদ্বয়সম্পন্ন জাতিকে অত্যুক্তা বলা হয়। এর চারটি প্রস্তার ভেদ আছে। এগুলি রতিগণ-এর অন্তর্ভুক্ত। যথা—ss, ls, sl, ll। শার্ঙ্গদেব বলছেন এই জাতিতে লপূর্বগণের আগেই লঘুযোজিত হওয়া নিয়ম। প্রদত্ত উদাহরণটিতে দ্বিতীয় এবং চতুর্থগণ হচ্ছে লঘুপূর্বা। কেবলমাত্র এই দুটির পূর্বে আরো লঘু যোজনা করা যেতে পারে। এইরকম লঘুযোজনায় উক্ত গণটি নিম্নবর্ণিত কামগণ বা বাণগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

গুরু বা লঘু বর্ণত্রয় সম্পন্ন জাতিকে কামগণ বলা হয়। এর প্রস্তার।

sss, lss, sls, lls, ssl, lsl, sll, lll

এইরকম চারটি বর্ণের সমাবেশে বাণগণ রচিত হয়—

প্রস্তার :—

ssss	lsss	slss	llss	ssls	lsls	slls	llls
sssl	lssl	slsl	llsl	ssll	lsll	slll	llll

বর্ণ এবং গণের বর্ণনার পর গণৈলায় ভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। গণৈলা ত্রিবিধ—শুদ্ধা, সঙ্কীর্ণা এবং বিকৃতা।

শুদ্ধগণৈলা চতুর্বিধ—নাদাবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী, ভদ্রাবতী। এই সব গণৈলায় গণাদির নিয়ম অঙ্ঘ্রির খণ্ডদ্বয়ে পালন করা হয়। অপর পদে গণাদির নিয়ম নেই। সিংহভূপাল বলছেন—বক্ষ্যমানো খণ্ডদ্বয়সম্বন্ধী নিয়মো জ্ঞাতব্যঃ। খণ্ডদ্বয়ানন্তরং পদেষু গণ্যাদিনিয়মো নাস্তি। স্বেচ্ছয়া বিরচনমিত্যর্থঃ।

নাদাবতীর খণ্ডদ্বয়ে পাঁচটি ভগণ এবং অন্তে নগণ প্রযুক্ত হয়। টক্করাগ এবং মঠতাল ব্যবহৃত হয়। ঋগ্বেদ থেকে এর উৎপত্তি। বর্ণ—শুভ্র। জাতি—ব্রাহ্মণ। কৈশিকী বৃত্তিতে আশ্রিত এবং রীতি পাঞ্চালী। শৃঙ্গার-বর্ধনকারী। এই গান সরস্বতীর প্রীতিকারী।

উপরোক্ত কৈশিকী বৃত্তি হচ্ছে সুকুমার অর্থসন্দর্ভযুক্ত বৃত্তি। সাহিত্যদর্পণকার বলছেন :—

যা শ্লক্ষ্ণ নেপথ্যবিশেষচিত্রা
স্ত্রী সঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা
কামোপভোগপ্রভবোপচারা
সা কৈশিকী চারুবিলাসযুক্তা।

বাক্‌মনঃ কায়জা চেষ্টা পুরুষার্থোপযোগিনী—এইটি হচ্ছে বৃত্তিশব্দের অর্থ।

রীতি বলতে পদসঙ্ঘটনা অর্থাৎ যথাস্থানে পদগুলির সংযোজনা বোঝায়। চারটি রীতি আছে—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটিকা বা লাটী। পারুষ্যরহিত, কঠিনশব্দবর্জিত, নাতিদীর্ঘসমাসযুক্ত যে পদবন্ধ তাকে বলে বৈদর্ভী। ওজঃগুণসম্পন্ন, কান্তিগুণোপেত, সমাসবহুল, রীতিকে বলা হয় গৌড়ী। বৈদর্ভী এবং গৌড়ী এই দুটির মাঝামাঝি হচ্ছে পাঞ্চালী। লাটী হচ্ছে বৈদর্ভী এবং পাঞ্চালীর মাঝামাঝি রীতি। এক কথায় এই রীতিগুলির লক্ষণ বোঝাবার জন্য সাহিত্যদর্পণকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

গৌড়ী ডম্বরবন্ধা স্যাদ্বৈদর্ভী ললিতক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেন লাটী তু মৃদুভি পদৈঃ॥

অর্থাৎ গৌড়ীর বৈশিষ্ট্য আড়ম্বরযুক্ত পদ, বৈদর্ভী লালিত্যগুণবিশিষ্ট, পাঞ্চালীতে এর মিশ্র ভাব এবং মৃদুপদই হচ্ছে লাটীর বৈশিষ্ট্য।

হংসাবতীর খণ্ডদ্বয়ে পাঁচটি রগণ এবং শেষে সগণ থাকবে। এতে

দ্বিতীয় তাল এবং হিন্দোলরাগের প্রয়োগ হয়। জাতি—ক্ষত্রিয়। যজুর্বেদ থেকে উৎপত্তি। বর্ণ—লোহিত। বৃত্তি—আরভটী। অত্যুদ্ধত অর্থসন্দর্ভযুক্ত বৃত্তিকে আরভটী বৃত্তি বলে। রীতি—লাটী। রস—রৌদ্র। চণ্ডিকার প্রীতিতে এই গীতের বিনিয়োগ হয়।

নন্দাবতী খণ্ডদ্বয়ে পাঁচটি তগণ এবং শেষে জগণ থাকবে। তাল প্রতিতাল রাগ মালবকৈশিক। উৎপত্তি সামবেদ। বর্ণ-পীত। জাতি বৈশ্য। বৃত্তি সাত্বতী (ঈষৎ প্রৌঢ়ার্থসন্দর্ভ সাত্বতী বৃত্তিরিষ্যতে—কল্লিনাথের উদ্ধৃতি) রীতি গৌড়ী। রস-বীরা ইন্দ্রানীর প্রীতিতে বিনিয়োগ।

ভদ্রাবতীর খণ্ডদ্বয়ে পাঁচটি ম-গণ এবং শেষে যগণ থাকবে। তাল—কঙ্কাল। রাগ—ককুভ। উৎপত্তি—অথর্ববেদ। বর্ণ—কৃষ্ণ। জাতি—শূদ্র। বৃত্তি—ভারতী। ঈষৎ মৃদু অর্থসন্দর্ভ বৃত্তিকে ভারতী বৃত্তি বলে। রীতি বৈদর্ভী। রস—বীভৎস। বারাহী দেবতার প্রীতিতে বিনিয়োগ।

এইসব এলার সংকর বা মিশ্ররূপগুলিকে সঙ্কীর্ণা বলা হয়। এগুলি অপ্রসিদ্ধ হওয়াতে শার্ঙ্গদেব এদের বর্ণনা করেন নি।

শুদ্ধা গণৈলার প্রথম তিনটি রূপ অর্থাৎ নাদাবতী, হংসাবতী, এবং নন্দাবতী গণের বিকৃতি অনুসারে বিকৃত হয়। এই গণবিকারটি কী রকম সেটি কল্লিনাথ বুঝিয়ে বলেছেন। আমরা দেখেছি নাদাবতীতে পাঁচটি ভগণ আছে। এই ভগণের স্থলে জগণ বা সগণের প্রয়োগ হলেই গণবিকার হল। হংসাবতীতে রগণ বিকারপ্রাপ্ত হয়ে যগণ হতে পারে। নন্দাবতীতে তগণ বিকারের ফলে রগণ হতে পারে। পঞ্চমগণ পর্যন্ত বিকৃতি অনুমোদিত কিন্তু অন্তিমবর্ণের বিকৃতি নিষিদ্ধ কেন না তাহলে প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। বিকৃত গণটি অন্তিমগণের সঙ্গে এক না হওয়াই বিধেয়।

এই রকম পাঁচটি গণের মধ্যে একটি গণের বিকৃতি হলে তাকে বলা হয় বাসবী। গণদ্বয়ের বিকৃতি হলে তার নাম সংগতা। গণত্রয়ের নাম—ত্রেতা। গণচতুষ্টয়ের বিকৃতির নাম চতুরা। গণপঞ্চ বিকারের নাম বাণ।

বাসবীর পাঁচটি ভেদ। সাধারণভাবে একটি গণাবিকারকে বলা হয় বাসবী কিন্তু প্রতিটি বিকৃতির এক-একটি নাম। যেমন,—পাঁচটি ভগণের মধ্যে প্রথম ভগণের বিকৃতির নাম—রামা। প্রথমটি না হয়ে যদি দ্বিতীয়টি বিকৃত হয় তাহলে তার নাম মনোরমা। এইভাবে তৃতীয় বিকৃতির নাম উন্নতা, চতুর্থের নাম শান্তি এবং পঞ্চমের নাম নাগর।

সংগতার দশটি ভেদ—রমণীয়া, বিষমা, সমা, লক্ষ্মী, কৌমুদী, কামোৎসবা নন্দিনী, গৌরী, সৌম্যা এবং রতিদেহা।

এই ভেদটি কিভাবে হয় সেটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন,—পাঁচটি ভগণের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভগণের বিকারের নাম রমণীয়া। প্রথম এবং তৃতীয় বিকারের নাম বিষমা। প্রথম এবং চতুর্থের বিকার—সমা। প্রথম এবং পঞ্চমের বিকার—লক্ষ্মী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভগণের বিকৃতি—কৌমুদী। দ্বিতীয় এবং চতুর্থের বিকৃতি—কামোৎসবা। দ্বিতীয় এবং পঞ্চমের বিকৃতি—নন্দিনী। তৃতীয় এবং চতুর্থের বিকৃতি—গৌরী। তৃতীয় এবং পঞ্চমের বিকৃতি—সৌম্যা। চতুর্থ এবং পঞ্চমের বিকৃতি—রতিদেহা।

ত্রেতাও দশটি ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে—মঙ্গলা. রতিমঙ্গলা, কলিকা, তনুমধ্যা, বীরশ্রী, জয়মঙ্গলা, বিজয়া, রত্নমালা, গুরুমধ্যা এবং রতিপ্রভা।

ভগণের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিকৃতির নাম—মঙ্গলা। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থের বিকার—রতিমঙ্গলা। প্রথম, দ্বিতীয় এবং পঞ্চমের বিকার—কলিকা। প্রথম, তৃতীয় এবং চতু'র্থর বিকার—তনুমধ্যা। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চমের বিকৃতি—বীরশ্রী। প্রথম, চতুর্থ এবং পঞ্চমের বিকৃতি—জয়মঙ্গলা। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চমের বিকৃতি—রত্নমালা। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমের বিকৃতি—গুরুমধ্যা। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমের বিকৃতি—রতিপ্রভা।

এর পর চতুর্থ গণবিকার। এই বিকৃতি পাঁচটি—উৎসবপ্রিয়া, মহানন্দা, লহরী, জয়া এবং কুসুমাবতী।

ভগণ ছাড়া আর চারটি গণবিকৃতিব নাম—উৎসবপ্রিয়া। প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম গণবিকৃতি—মহানন্দা। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম গণবিকৃতি - লহরী। প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় এবং পঞ্চমের গণবিকৃতি—জয়া। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থের গণবিকৃতি—কুসুমাবতী।

পঞ্চগণবিকৃতির নাম বাণ। প্রথমগণ থেকে আরম্ভ করে পাঁচটি গণেরই বিকৃতি ঘটলে তাকে বলা হয় পার্বতীপ্রিয়া।

নাদাবতী, হংসাবতী এবং নন্দাবতী—এই তিনটির প্রত্যেকটির একত্রিশটি ভেদ হলে সবসুদ্ধ হয় তিরানব্বইটি প্রকারভেদ। এছাড়া এদের আরও পনেরোটি ভেদ আছে।

গণদ্বয়ের বিকার হলে তাকে সংগতা বলা হয়। সংগতা তিন প্রকার—সাবিত্রী, পাবনী এবং বাতসাবিত্রী।

নাদাবতীর ভগণদ্বয়ের স্থলে সবিতৃগণ অর্থাৎ জগণ নিক্ষিপ্ত হলে ভগণদ্বয়ের বিকৃতি ঘটল এবং সেই স্থানে জগণদ্বয় ন্যস্ত হল। এই রকম হলে সাবিত্রীনামক সংগতাভেদ হয়। পুনরায় নাদাবতীর ভগণদ্বয়ের স্থলে যদি পবনের গণ অর্থাৎ সগণ প্রক্ষিপ্ত হয় তাহলে সেই সংগতাভেদের নাম পাবনী। আবার, একটি ভগণের স্থলে সগণ এবং অপর ভগণস্থলে জগণ ন্যস্ত হলে সেটি হবে বাতসাবিত্রী। একগণ বিকারবতী বাসবী যদি ভগণের বিকৃতি ঘটিয়ে জ-গণবতী হয় তাহলে সেই বাসবীর সাবিত্রী নামক ভেদ ঘটে। এইভাবে উক্ত বাসবী সগণবতী হলে তার পাবনী নামক ভেদ ঘটে। এই রকম করে নাদাবতীর পাঁচটি ভেদ হয়।

হংসাবতীতেও সংগতার প্রয়োগ তিন রকম—ব্যোমজা, বারুণী এবং ব্যোমবারুণী।

হংসবতীর রগণদ্বয়ের স্থলে ব্যোমদৈবত তগণদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হলে ব্যোমজা নামক ভেদ হয়। যদি উক্ত রগণদ্বয়ের স্থলে বারুণদৈবত যগণ প্রযুক্ত হয় তাহলে সেটি হল বারুণী। তগণ এবং যগণ এই উভয় গণ নিক্ষিপ্ত হলে সেটি হবে ব্যোমবারুণী। একগণবিকারবতী বাসবী যদি রগণের বিকৃতি ঘটিয়ে তগণবতী হয় তাহলে সেটি হয় ব্যোমজা। এইভাবে উক্ত বাসবী যগণবতী হলে বারুণী নামক ভেদ ঘটে। এইরকম করে হংসাবতীর পাঁচটি ভেদ হয়।

নন্দাবতীতেও সংগতার তিনটি ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে ;— বহ্নিজা, বারুণী বহ্নিবারুণী।

নন্দাবতীর তগণদ্বয়ের স্থলে বহ্নিদৈবত রগণদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হলে বহ্নিজা নামক ভেদ হয়। যগণ নিক্ষিপ্ত হলে সেটি হবে বারুণী। রগণ এবং যগণ নিক্ষিপ্ত হলে হবে বহ্নিবারুণী। বাসবরীও অনুরূপভাবে দুটি ভেদ—বহ্নিজা এবং বারুণী। এইভাবে নন্দাবতীর পাঁচটি ভেদ হয়।

পূর্বে তিরোনব্বইটি ভেদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আরও পনেরোটি যুক্ত হয়ে সবসুদ্ধ হল—একশ আটটি।

ইতিপূর্বে আমরা ছগণ, পগণ, চগণ প্রভৃতি মাত্রাগণের উল্লেখ করেছি। এইসব গণ দিয়ে মাত্রেলা সংগঠিত হয়েছে। মাত্রেলা চার প্রকার —রতিলেখা কামলেখা, বাণলেখা এবং চন্দ্রলেখা।

শার্ঙ্গদেব রতিলেখার নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ণনা করেছেন :

আদ্য এবং দ্বিতীয় পাদে রুদ্রসংখ্যক কলা।

তৃতীয় পাদে দশ মাত্রা।

পাদগুলিতে রতিগণের প্রয়োগ।

রুদ্রসংখ্যকের অর্থ হচ্ছে একাদশ। রুদ্রদেবতার সংখ্যা একাদশ হওয়াতে রুদ্র বললে সাধারণত এগারো বোঝায়। কলাশব্দের একটি অর্থ মাত্রা। এর সরল অর্থ হল এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদে এগারো মাত্র থাকবে কিন্তু তৃতীয় পাদে মাত্রার সংখ্যা হবে দশ। এই তিনটি পাদেই রতিগণের প্রয়োগ হবে।

টীকাকারগণ এই গায়নপদ্ধতির স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। আমার মনে হয় রীতিটি হবে এইরকম :—

প্রথম এবং দ্বিতীয় বার যে অঙ্ঘ্রিদ্বয় গাওয়া হবে সে ছুটির মাত্রা সংখ্যা হবে একাদশ। তৃতীয় আবৃত্তির সময় অঙ্ঘ্রির মাত্রা সংখ্যা হবে দশ। একথা মনে রাখতে হবে যে গণাদির নিয়ম কেবলমাত্র অঙ্ঘ্রিতেই পালন করা হয় অপর অংশে নয়। এই একাদশ বা দশ মাত্রার মধ্যে রতিগণকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটি বুঝিয়ে বলা হয় নি। আমরা জানি রতিগণ অত্যুক্তা নামক ছন্দজাতিদ্বারা গঠিত। ছুটি গুরু বা লঘুবর্ণের সমাবেশকেই রতিগণ বলা হয়। উক্ত একাদশ বা দশ মাত্রায় এই রতিগণকে যথাসম্ভব যোজনা করতে হবে।

কামলেখা নামক গণৈলার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদের মাত্রা-সংখ্যা পূর্বের দ্বিগুণ। এতে কামগণের প্রয়োগ হয়।

অনুরূপভাবে বাণলেখায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদ রতিলেখার তিন গুণ। এতে বাণগণের প্রয়োগ হয়।

একই রীতিতে চন্দ্রলেখার প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদের সংখ্যা রতিলেখার চার গুণ। এতে রতিগণ, কামগণ এবং বাণগণ মিশ্রিতভাবে যোজিত হয়।

অতঃপর নন্দিমতানুযায়ী অন্য চারটি মাত্রৈলায় উল্লেখ করা হয়েছে—

ইন্দুমতী, জ্যোতিষ্মতী, নভস্বতী এবং বসুমতী।

পাঁচটি ছগণ এবং অন্তে তগণ—এইটি ইন্দুমতীর লক্ষণ।

পাঁচটি পগণ এবং অন্তে চগণ —এইটি জ্যোতিষ্মতীর লক্ষণ।

আদিতে একটি ছগণ, অতঃপর তিনটি চগণ, তারপরে আরও একটি ছগণ এবং অন্তে ছগণ--এইটি নভস্বতীর লক্ষণ।

আদিতে একটি দগণ, অতঃপর তিনটি পগণ, তারপরে একটি

ছগণ এবং অন্তে তগণ—এইটি বসুমতীর লক্ষণ।

পূর্বে আমরা যে নাদাবতী হংসাবতী, নন্দাবতী এবং ভদ্রাবতীর উল্লেখ করেছি সেগুলি গণৈলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এগুলি মাত্রৈলার মধ্যেও পরি-গণিত হতে পারে।

স্বগণ ভঙ্গদ্বার গণৈলা মাত্রৈলাতে পরিণত হতে পারে। 'ভঙ্গ' মানে গণগুলিকে ভেঙে ফেলা। অর্থাৎ লঘু-গুরু মিশিয়ে যে গণটি তৈরি হয়েছে তার গুরুটিকে ভেঙে দুটি পৃথক লঘুতে পরিণত করতে হবে। এটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যাক। নাদাবতীর পাঁচটি ভগণ এবং শেষে একটি নগণ আছে। ভগণ হচ্ছে sII অর্থাৎ একটি গুরু এবং দুটি লঘুর সমষ্টি। এই গুরুটিকে ভেঙে দুটি লঘু করলে এটি হল IIII অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক। পাঁচটি চতুর্মাত্রিক মিলিয়ে হল কুড়িটি মাত্রা। এর সঙ্গে নগণ অর্থাৎ তিনটি লঘু যুক্ত হয়ে নাদাবতীতে সবসুদ্ধ হল তেইশটি লঘু মাত্রা। এই মাত্রাসমষ্টিকে চগণ অর্থাৎ চতুর্মাত্রিকগণদ্বারা প্রকাশ করতে হবে। তাহলে উক্ত তেইশ মাত্রায় হল পাঁচটি চগণ এবং তিনটি লঘু। এইভাবে নাদাবতী মাত্রৈলাতে পরিণত হল।

হংসাবতীতে পাঁচটি রগণ এবং শেষে একটি মগণ আছে। রগণ হচ্ছে—sIs অর্থাৎ গুরু, লঘু এবং গুরুর সমষ্টি। এটিকে ভাঙলে হবে—।।।।।—পাঁচটি লঘু। পাঁচটি পঞ্চমাত্রিক মিলিযে হল পঁচিশটি লঘুমাত্রা। সগণ হচ্ছে IIs। এটিকে ভাঙলে হবে।।।।—অর্থাৎ চারটি লঘু। সব মিলিয়ে হল উনত্রিশ মাত্রা। এই উনত্রিশ মাত্রায় সাতটি চগণ এবং অন্তিমে একটি লঘু থাকে।

নন্দাবতীতে পাঁচটি তগণ এবং একটি জগণ·আছে। তগণ হচ্ছে ss।অর্থাৎ দুটি গুরু এবং একটি লঘুর সমষ্টি। এটিকে ভাঙলে হবে।।।।।—পাঁচটি লঘু। পাঁচটি গণ মিলিয়ে হল পঁচিশ লঘু। এর সঙ্গে একটি জগণ যোগ দিতে হবে। জগণ হচ্ছে।s।, অর্থাৎ,।।।।—চতুলঘু। এক্ষেত্রেও মোট লঘুর সংখ্যা হল উনত্রিশ অর্থাৎ সপ্ত চগণ এবং অন্তিমে একটি লঘু।

ভদ্রাবতীতে পাঁচটি মগণ এবং একটি যগণ আছে। মগণ হচ্ছে s s s। এটি ভাঙলে হল ॥ ॥ ॥ —ছটি লঘু। পাঁচটি মগণ মিলিযে হল তিরিশটি লঘু। এর সঙ্গে একটি যগণ যোগ করতে হবে। যগণ হচ্ছে। s s অর্থাৎ IIIII—পাঁচটি লঘু। মোট সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশটি লঘু অর্থাৎ আটটি চগণ এবং অন্তিমে তিনটি লঘু।

ধনঞ্জয়ের মতানুসারে নাদাবতী প্রভৃতিকে মাত্রৈলায় পরিণত করে তাদের অঙ্ঘ্রিতে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ মাত্রা পর্য্যন্ত যোজনা করতে পারা যায়। এর নাম বিচিত্র এলা।

আরও চার প্রকার মাত্রৈলার নাম করা হয়েছে—নন্দিনী, চিত্রিণী, চিত্রা এবং বিচিত্রা। এইসব প্রবন্ধে পূর্বোক্ত রতিলেখা প্রভৃতি যে গণ নির্দেশ করা হয়েছে সেটি পরিত্যাগ করে অনিয়তভাবে কেবল নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যা যুক্ত করা হয়। অনিয়তগণযুক্ত রতিলেখাই হচ্ছে নন্দিনী, কামলেখা-চিত্রিনী, বাণলেখা-চিত্রা এবং চন্দ্রলেখা-বিচিত্রা। এর মধ্যে নন্দিনী এবং চিত্রিণীর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এই দুটিতে অঙ্ঘ্রির প্রথম এবং তৃতীয় পাদের স্থান পাল্টে যাবে। অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্ঘ্রি প্রথমে গাইতে হবে এবং প্রথমটি যাবে তৃতীয় পাদে। শার্ঙ্গদেব বলছেন—এলয়োরাদ্যয়োরঙ্ঘ্রী ব্যত্যস্তাবযুজাবিহ। সিংহভূপাল এর অর্থ করছেন আদ্যয়োর্নন্দিনী চিত্রিণ্যোঃ এলয়োঃ অযুজৌ প্রথম তৃতীয় অঙ্ঘ্রী ব্যত্যস্তৌ বিপর্যাসনে গেয়ৌ। তৃতীয় অঙ্ঘ্রি পূর্বং গেয়ঃ। প্রথমশ্চ তৃতীয় স্থান ইতি। এলার তিনটি পাদ—কাম, বিকারী এবং গীতক। রতিলেখা নামক মাত্রৈলায় তৃতীয় পাদ অর্থাৎ গীতকের মাত্রাসংখ্যা দশ। এই রতিলেখা যখন নন্দিনীতে পরিণত হবে তখন গীতক পাদটি প্রথমে চলে আসবে এবং একাদশমাত্রিক 'কাম' নামক প্রথম পদটি তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ গীতকের স্থানে গাওয়া হবে।

মাত্রৈলার সংখ্যা সবশুদ্ধ হল কুড়িটি।

রতিলেখা, কামলেখা, বাণলেখা ও চন্দ্রলেখা	— ৪
ইন্দ্রমতী, জ্যোতিষ্মতী, নভস্বতী ও বসুমতী	— ৪
(মাত্রৈলা) নাদাবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী ও ভদ্রাবতী	— ৪
(বিচিত্র) নাদাবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী ও ভদ্রাবতী	— ৪
নন্দিনী, চিত্রিণী, চিত্রা, বিচিত্রা	— ৪
	২০

এইবার বর্ণৈলার পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে।

যেসব এলাসঙ্গীতে গণ এবং মাত্রার নিয়ম পালন করা হয় না কেবলমাত্র বর্ণসংখ্যা (গুরু এবং লঘু বর্ণ হিসাবে) অনুসারে উপনিবদ্ধ করা হয় তাদের বলে বর্ণৈলা।

ষড়ক্ষরযুক্ত অঙ্ঘ্রিখণ্ডদ্বয় থেকে আরম্ভ করে উনত্রিশটি অক্ষরযুক্ত

অঙ্ঘ্রিখণ্ডদ্বয় পর্যন্ত বর্ণৈলার চব্বিশটি প্রকারভেদ আছে। ক্রমান্বয়ে এই নামগুলি হচ্ছে—মধুক, মুখরা, করণী, সুরসা, প্রভঞ্জনী, মদনবতী, শশিনী, প্রভাবতী, মালতী, ললিতা, ভোগবতী, কুসুমবতী, কান্তিমতী, কুমুদিনী, কলিকা, কমলা, বিমলা, নলিনী, কালিন্দী, বিপুলা, বিদ্যুল্লতা, বিশালা, সরলা ও তরলা।

মতান্তরে অষ্টাদশ অক্ষরযুক্ত খণ্ডদ্বয় থেকে উনত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত খণ্ডদ্বয় পর্যন্ত বর্ণৈলা মাত্রৈলা হিসাবেও পরিগণিত হতে পারে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে বর্ণমাত্রৈলা।

এইসব বর্ণৈলায় সাধারণতঃ তালের নিয়ম নেই। তবে, তালের প্রয়োগ হলে মঠ, দ্বিতীয়, কঙ্কাল এবং প্রতিতালের ব্যবহার হতে পারে। এইগুলিতে রাগ প্রভৃতিরও কোনো নিয়ম নির্দিষ্ট নেই।

মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশী নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র যতিভেদ অনুসারে সাতটি বর্ণৈলার উল্লেখ করেছেন—রমণী চন্দ্রিকা, লক্ষ্মী, পদ্মিনী, রঞ্জনী, মালতী এবং মোহিনী। শার্ঙ্গদেব এগুলির উল্লেখ করেছেন। যতিভেদ বলতে এখানে পদবিচ্ছেদ বোঝাচ্ছে। এ বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য ত্রিবন্দ্রাম সিরিজের বৃহদ্দেশী গ্রন্থের ১৫১ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন।

এর পর দেশাখ্য এলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য দেশাখ্য অর্থে বিভিন্ন দেশীয় পদ্ধতি বোঝাচ্ছে। দেশাখ্য এলা পাঁচ প্রকার—কর্ণাট-এলা, লাট-এলা, গৌড় এলা, অন্ধ্র এলা এবং দ্রাবিড়-এলা।

কর্ণাটভাষায় যে এলার প্রচলন ছিল তার নাম কর্ণাটৈলা। কোনো কোনো আচার্যের মতে নাদাবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী এবং ভদ্রাবতী—এগুলি হচ্ছে কর্ণাটৈলা। কর্ণাটৈলার আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে অনুপ্রাস থাকে। শার্ঙ্গদেব দুটি কর্ণাটৈলার বিবরণ দিয়েছেন।

এই কর্ণাটৈলার বর্ণনা খুব স্পষ্ট নয়। কল্লিনাথ এদের ব্যাখ্যা করেন নি। সিংহভূপাল যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতেও বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয় না, অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। যাই হোক—নাদাবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী এবং ভদ্রাবতীর যে কর্ণাটী প্রকারভেদ দেখান হয়েছে সেগুলির মোটামুটি পরিচয় প্রদান করা যাক।

নাদাবতীর পরিবর্তিত কর্ণাটী রূপের নাম সুলেখা। এর প্রথম দুটি অঙ্ঘ্রির আদিতে অনুপ্রাস থাকবে এবং দুটি করে মগণ আর অন্তে রতিগণ

সংযুক্ত হবে। তৃতীয় অঙ্ঘ্রির আদিতে এবং মধ্যে অনুপ্রাস থাকবে। এতে চারটি কামগণ এবং শেষে রতিগণ থাকবে। উৎপত্তি—ব্রহ্মার পূর্বমুখ, গণাধিপতি শম্ভু।

হংসাবতীর পরিবর্তিতরূপ হচ্ছে—কামলেখা। এতে প্রথম দুটি অঙ্ঘ্রির আদিতে এবং মধ্যে অনুপ্রাস থাকবে। এই দুটি অঙ্ঘ্রিতেই চারটি চারটি করে কামগণ থাকবে। তৃতীয় অঙ্ঘ্রির আদি, মধ্য এবং অন্তে অনুপ্রাস থাকবে। এতে আটটি কামগণ সন্নিবেশিত হবে। উৎপত্তি - ব্রহ্মার দক্ষিণ-মুখ। দেবতা সাবিত্রী। গণাধিপতি হরি।

নন্দাবতীর পরিবর্তিতরূপের নাম স্বরলেখিকা। এর তিনটি অঙ্ঘ্রির আদি, মধ্য এবং অন্তে অনুপ্রাস থাকবে। প্রত্যেক অঙ্ঘ্রিতে চারটি করে কামগণ থাকবে। উৎপত্তি—ব্রহ্মার পশ্চিমমুখ। গণাধিপ ব্রহ্মা। দেবতা—গায়ত্রী।

ভদ্রাবতীর পরিবর্তিত রূপটি ভদ্রলেখা নামে পরিচিত। এর প্রথম দুটি অঙ্ঘ্রিতে দুটি করে কামগণ এবং অন্তে বাণগণ থাকবে। তৃতীয় অঙ্ঘ্রিতে আটটি কামগণ থাকবে। উৎপত্তি—ব্রহ্মার উত্তরমুখ। গণাধিপ গণেশ। দেবতা—গান্ধর্বী।

কর্ণাটেলার তিনটি অঙ্ঘ্রির প্রত্যেকটিতে পাঁচটি কামগণ, একটি রতিগণ এবং অন্তে আর-একটি কামগণ থাকলে সেটিকে ছন্দস্বতী বলা হয়। ছন্দস্বতীতে এইসব গণের ন্যূনাধিক্য ঘটলে সেটি হবে এলাভাস অর্থাৎ হীনজাতীয় এলা। অঙ্ঘ্রির অন্তে গণবিপর্যয়ের দরুণ ন্যূনাধিক্য ঘটলে তৃতীয় অঙ্ঘ্রিতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনুরূপ একটি পদ যোজনা করা যেতে পারে। এটিকে বলে শিখাপদ।

লাট এলা অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত এবং বহুরসসমন্বিত হয়।

গৌড়ীয়-এলায় গমক এবং অনুপ্রাস নেই—একটি রসেরই প্রাধান্য।

অন্ধ্রজাতীয়-এলায় রাগাংশ, রস এবং ভাবের বিবিধ প্রয়োগ ঘটে। এতে অনুপ্রাস নেই।

দ্রাবিড়ী এলায় ভাব, রসের বাহুল্য এবং উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত এলাগুলিতে সমস্ত লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও অঙ্ঘ্রিতে চতুর্থ চরণের সন্নিবেশ হলে তাকে বলে ছন্দস্বতী।

পরিশেষে বস্ত-এলার লক্ষণ বলা হয়েছে। এইজাতীয় এলায় দুটি অঙ্ঘ্রি অনুপ্রাসহীন হবে কিন্তু তৃতীয়টি অনুপ্রাসযুক্ত হবে। ধ্রুব এবং আভোগও

অনুপ্রাসযুক্ত হবে এবং সবগুলি পদে পৃথকভাবে চারটি যতি বা ছেদ থাকবে। বর্ণৈলার মত বস্তু এলাতেও রাগ, রস, রীতি, বৃত্তি এবং দেবতার নিয়ম মেনে চলা হয় না।

সব মিলিয়ে এলার সংখ্যা শার্ঙ্গদেব নির্দেশ করেছেন ৬৫৭। এর মধ্যে অবশ্য সঙ্কীর্ণ এলার সংখ্যা ধরা হয় নি এবং দেশাখ্য এলার সবগুলি সূক্ষ্মভেদের পরিচয়ও তিনি দেন নি।

আশ্চর্যের বিষয় এই এলা প্রবন্ধের খবর আজ আর আমাদের জানা নেই। ভারতবর্ষের কোনো স্থানে এই নামটি এখনো আছে কি না সন্দেহ। হয়ত, ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে এর সবকিছু পাল্টে এখন এটি অন্যরূপে স্থানে স্থানে বিরাজ করছে। এলার বর্ণনা দেখে মনে হয় এটি দক্ষিণভারতেই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বিবিধ ক্রিয়াকলাপেও এর প্রযোগ হত এবং বহু দেবদেবীর নাম এইজাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত।

এর পরে দ্বিতীয় প্রকার শুদ্ধসূড প্রবন্ধ 'করণ'-এর সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। করণ প্রবন্ধ আট প্রকার—স্বরকরণ, পাটকরণ, বন্ধকরণ, পদকরণ, তেনকরণ, বিরুদকরণ, চিত্রকরণ এবং মিশ্রকরণ।

স্বরকরণে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব এই দুটি ধাতু স্বরদ্বারা সান্দ্র অর্থাৎ নিবিড়-ভাবে বদ্ধ। আভোগ অংশটি পদ অর্থাৎ বাক্যাংশদ্বারা বিরচিত এবং এতে বাগগেয়কারের বা নায়কের নাম উল্লিখিত হয়। ইষ্ট বা অভিলষিত স্বরে গানটি আরম্ভ করা হয় এবং অংশস্বরে গান শেষ করা হয়। তাল—রাস। লয়—দ্রুত।

আকৃতির দিক থেকে অন্যান্য করণ স্বরকরণের অনুরূপ, তবে স্বরস্থানে প্রভেদ বর্তমান।

স্বরের সঙ্গে যদি হস্তপাট অর্থাৎ হস্তদ্বারা তালবাদ্যের অনুষ্ঠান হয় তাহলে সেটি হবে পাটকরণ। পাটকরণ ক্রম এবং ব্যত্যাস ভেদে দুই প্রকার। প্রথমে স্বরাচরণ এবং পরে তালের বোল অনুষ্ঠিত হলে সেটি হবে ক্রমপাটকরণ। পূর্বে তালবাদ্য এবং পরে স্বরাচরণ অনুষ্ঠিত হলে সেটি হবে ব্যত্যাস পাটকরণ ব্যত্যাসশব্দের অর্থ বৈপরীত্য বা বিপর্যয়।

মুরজবাদ্যের বোলের সঙ্গে যখন স্বরানুষ্ঠান হয় তখন তাকে বলে বন্ধকরণ। এক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহ অংশে স্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং ধ্রুব অংশে মুরজপাটের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পদ এবং স্বরদ্বারা বদ্ধ হলে সেটি হয় পদকরণ। এক্ষেত্রে উদ্গ্রাহে স্বর এবং ধ্রুব অংশে পদ যোজিত হয়।

স্বর এবং বিরুদদ্বারা বদ্ধ হলে সেটি হয় বিরুদকরণ। এখানে উদ্গ্রাহ স্বরদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং ধ্রুব অংশে বিরুদ যোজিত হয়।

স্বর এবং তেনক (মঙ্গলবাচক অংশ) দ্বারা বদ্ধ হলে সেটি হয় তেনকরণ। এখানে উদ্গ্রাহ স্বরদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং তেনক অংশটি ধ্রুব অঙ্গে যোজিত হয়।

স্বরপাট এবং তেনকের সঙ্গে বদ্ধ হলে সেটিকে বলা হয় মিশ্রকরণ। এখানে উদ্গ্রাহে স্বর, পাট এবং তেনক প্রযুক্ত হয়। ধ্রুব অঙ্গেও এগুলি আচরিত হয়।

স্বর, হস্তপাট এবং মুরজবোলের উচ্চারণদ্বারা বদ্ধ হলে তাকে বলা হয় চিত্রকরণ। এখানে উদ্গ্রাহে স্বর এবং হস্তপাটের অনুষ্ঠান হয়। মুরজাক্ষর ধ্রুব অংশে প্রযুক্ত হয়।

কল্লিনাথ বলছেন চিত্রকরণে স্বর, হস্তপাট এবং মুরজাক্ষরের যে মিশ্রণ হয় সেটি তিল এবং তণ্ডুলের মিশ্রণের অনুরূপ, অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানগুলির আলাদা রূপগুলি বেছে নেওয়া যায়। কিন্তু মিশ্রকরণে স্বর, পাট এবং তেনকের মিশ্রণ ক্ষীর এবং নীরের ন্যায় অর্থাৎ এ মিশ্রণটি অনেক বেশি নিবিড এবং সব মিলিয়ে একাত্ম হয়ে পড়ে।

এই করণগুলির প্রত্যেকটি গানের প্রকার ভেদে ত্রিবিধ হতে পারে—মঙ্গলারম্ভ, আনন্দবর্ধণ এবং কীর্তিলহরী।

মঙ্গলারম্ভ নামক করণে প্রথমে উদগ্রাহে অংশটি দু বার গাওয়া হয়। তারপরে ধ্রুব একবার গাওয়া হয়। অতঃপর ধ্রুবের পশ্চিমার্ধ গাওয়া হয়। তারপরে আভোগ, ধ্রুব এবং উদ্গ্রাহ একবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কীর্তিলহরী নামক করণে ধ্রুবের অর্ধ-স্থানে উদ্গ্রাহের দ্বিতীয়ার্ধ গাওয়া হয়ে থাকে। অপরাপর লক্ষণ আনন্দবর্ধনের ন্যায়।

করণে মেলাপক নেই—এটি ত্রিধাতুক। তালাদির নিয়ম থাকাতে এটি নির্যুক্ত প্রবন্ধের অন্তর্গত এবং ষডঙ্গযুক্ত হওয়াতে এটি মেদিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

উপরোক্ত ন'টি করণ ত্রিবিধ হয়ে সবসুদ্ধ সাতাশ প্রকার হয়ে থাকে।

করণ প্রবন্ধ মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। বাংলার কীর্তনের মত এই প্রবন্ধেও গীতারম্ভে মুরজবাদ্যের অনুষ্ঠান হত এবং মঙ্গল-

সূচক পদাদি যোজিত হত। কীর্তন গানে এইজাতীয় প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রভাব আছে বলে মনে হয়।৫

করণের পর ঢেঙ্কি নামক সূড প্রবন্ধের বর্ণনা করা হয়েছে।

ঢেঙ্কি প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহের পূর্বার্ধ দুবার গাওয়া হয় তারপর একবার উত্তরার্ধ গাওয়া হয়। অতঃপর মেলাপকের আচরণ বৈকল্পিক অর্থাৎ এটি করা যেতে পারে অথবা নাও করা যেতে পারে। এই মেলাপকটি প্রয়োগাত্মক অর্থাৎ অক্ষরবর্জিত গমকালাপ্তির মত। উদ্‌গ্রাহ এবং মেলাপক উভয় অঙ্গই বিনা তালে গাওয়া যেতে পারে। তালে গাইলে বিলম্বিত ঢেঙ্কি বা কঙ্কাল তাল অবলম্বন করা হয়। এর পর ধ্রুব এবং আভোগ অন্য লয়ে এবং অন্য তালে গাওয়া হয়। এই ধ্রুব অংশে তিনটি খণ্ড আছে। এর মধ্যে দুটি খণ্ড সমধাতুক অর্থাৎ সমগেয় তৃতীয় খণ্ডটি উচ্চমানে গাইতে হবে। ধ্রুব দু বার গাওয়া হয়। তারপর আভোগের আচরণ করে আর-একবার ধ্রুবের অনুষ্ঠান করে গীত সমাপ্ত হবে।

ঢেঙ্কি প্রবন্ধ চতুর্বিধ—মুক্তাবলী, বৃত্তবন্দিনী, যুগ্মিনী এবং বৃত্তমালা। যে গীতে ছন্দ নেই সেটি মুক্তাবলী। যেখানে একটি বৃত্ত বা ছন্দ তার নাম বৃত্তবন্দিনী। দুটি বৃত্ত থাকলে সেটি যুগ্মনী। বহু বৃত্তের ব্যবহার হলে তাকে বলা হয় বৃত্তমালা।

মুক্তাবলী ছাড়া অপর তিনটি প্রবন্ধ আবার তিন প্রকার—বর্ণিকা, গণিকা এবং মাত্রিকা।

বর্ণবৃত্তসম্পন্ন গান অর্থাৎ যেখানে অক্ষরবৃত্ত ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে বর্ণিকা। সমানী প্রভৃতি ছন্দ হচ্ছে অক্ষবৃত্তের উদাহরণ। যথা—

ওং নমো জনার্দনায় দুষ্ট দৈত্য মদনায়।
পাপবদ্ধ মোচনায় পুণ্ডরীক লোচনায়॥

সমানী।

গণচ্ছন্দ ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় গণিকা। আর্যছন্দের নয়টি প্রকারভেদ যথা—পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা, জঘনচপলা, গীতি, উপগীতি, উদ্গীতি এবং আর্যাগীতি। এইগুলি গণচ্ছন্দের মধ্যেই পড়ে। উদাহরণ—

পথ্যাশী ব্যায়ামী স্ত্রীষু জিতাত্মা নরো ন রোগী স্যাৎ।
যদি মনসা বচসা চ প্রক্রুহ্যতি ন ভূতেভ্যঃ॥

পথ্যা।

মাত্রাছন্দ ব্যবহৃত হলে সেটি হবে মাত্রিকা। বৈতালীয় প্রভৃতি হচ্ছে মাত্রাছন্দের উদাহরণ।

তব তন্বী কটাক্ষবীক্ষিতৈঃ প্রসরদ্ভিঃ শ্রবণান্তগোচরৈঃ।
বিশিখৈরিব তীক্ষ্মকোটিভিঃ প্রহৃতং প্রাণ ন দুষ্করং মনঃ॥
বৈতালীয়।

সব মিলিয়ে ঢেঙ্কির প্রকার ভেদ হল দশটি। এই দশটি আবার তিন প্রকার—সমালঙ্করণা, বিষমালঙ্করণা এবং চিত্রালঙ্করণা। শার্ঙ্গদেব এই ভেদগুলির স্বরূপ বুঝিয়ে বলেন নি। কল্লিনাথ বলছেন এখানে অলঙ্কার শব্দে—অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি বোঝাচ্ছে। কিভাবে এইগুলির সম এবং বিষম ভেদেপ্রয়োগ হবে সেটি ব্যাখ্যা করেন নি। সিংহভূপাল সমালঙ্কার সম্বন্ধে বলছেন—"সমালঙ্কারৈঃ উপমাদিভিঃ যুক্তা সমালঙ্কৃতি" এবং বিষমালঙ্কার সম্বন্ধে বলছেন—"ত্র্যাদি সংখ্যাযুক্তবিষমৈঃ অলঙ্কারযুক্তা বিষমালঙ্কৃতিঃ।" এ থেকেও স্পষ্টভাবে কিছু বোঝা যায় না। এক হতে পারে অলঙ্কারগুলি সঙ্গীতে সমানভাবে বিন্যস্ত থাকলে সেটি হবে সমালঙ্করণ এবং এগুলি যথাবিন্যস্ত না হলে সেটি হবে বিষমালঙ্করণ। আর-এক হতে পারে সঙ্গীতে সম এবং বিষম এই দুটি অলঙ্কারের প্রয়োগ। আনুরূপ্য বা পরস্পর সাদৃশ্যহেতু অনুরূপ পদার্থের সঙ্গে অপর একটি অনুরূপ পদার্থের সংযোগকে বলে সমালঙ্কার। কার্যগুণ যেখানে কারণগুণের বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় অথবা কার্যগত ক্রিয়া কারণগত ক্রিয়ার বিরুদ্ধগামী হয়; আবদ্ধকর্মের বৈফল্য এবং অনর্থের সম্ভাবনা ঘটে, আর বিপরীত ব্যাপারের একত্র সম্মেলন ঘটে—সেখানে হয় বিষমালঙ্কার। বিষমালঙ্কার উপলক্ষ্যে সিংহভূপাল "ত্র্যাদিসংখ্যাযুক্ত" এই কথাটিতে তিনটি সংখ্যার স্পষ্ট অর্থ বোঝাবার অবকাশ দেন নি। চিত্রালঙ্করণা হচ্ছে সম এবং বিষমের মিশ্রিত রূপ। এইভাবে ঢেঙ্কির সবসুদ্ধ ত্রিশটি ভেদ হতে পারে। ছন্দ এবং তাল থাকাতে এই গানটি নিযুক্ত। মেলাপকের অস্তিত্ব বৈকল্পে স্বীকৃত হওয়াতে এটি চতুর্ধাতুক বলে গণ্য হয়। পদ এবং তাল—এই দুটি অঙ্গ সমন্বিত হওয়াতে এটি তারাবলীজাতীয় প্রবন্ধ।

এর পরে বর্তনী নামক শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্তনীর লক্ষণ পূর্ববর্ণিত স্বরকরণের অনুরূপ। এতে স্বরকরণের মত রাস তালের ব্যবহার হয় না এবং এটি দ্রুত লয়েও গাওয়া হয় না। বিলম্বিত লয়ের অন্য কোন তাল এই গানে ব্যবহার করা হয়। উদ্গ্রাহ অংশটি দু বার গাওয়া

হয়; ধ্রুব এবং আভোগ একবার অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ধ্রুব অংশটি আর একবার গেয়ে গীত সমাপ্ত হয়।

বর্তনী যদি কঙ্কাল, প্রতিতাল, কুড্ক্ক, দ্রুতমণ্ঠক—এই চারটি তালের একটিতে গাওয়া হয় তাহলে সেটি বিবর্তনী নামে পরিচিত হয়।

তার পরে ঝোম্বড়া প্রবন্ধের বর্ণনা করা হয়েছে।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটি দু বার এবং উত্তরার্ধটি একবার গাওয়া হয়। তারপর বিকল্পে গমকসংযুক্ত প্রয়োগাত্মক মেলাপকের অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য এটি যে হবেই এমন কোন বাঁধাবাধি নেই। কল্লিনাথ বলছেন এটি যে একেবারে অক্ষরবর্জিত প্রয়োগ হবে এমন নয় কিছু বাচক-পদযুক্ত হতে পারে। এর পরে দু বার ধ্রুব অংশটি গাওয়া হয়। অতঃপর একবার আভোগ অনুষ্ঠানের পর গীতসমাপ্তি হয়।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে দশটি তালের ব্যবহার প্রশস্ত। কল্লিনাথ বলছেন যে এই দশটির মধ্যে যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে গাওযাই নিয়ম। তালগুলি হচ্ছে—নিঃসারুক, কুড্ক্ক, ত্রিপুট, প্রতিমণ্ঠ, দ্বিতীয, গারুগী, রাস, যতি, লগ্ন, অড্ড এবং একতালী। কেহ কেহ মণ্ঠ তালের প্রয়োগে ইচ্ছুক কিন্তু শার্ঙ্গদেব এর স্বপক্ষে মত দেন নি।

ঝোম্বড়া দুই প্রকার—তারজ এবং অতারজ।

তারজ অর্থাৎ চড়ায উৎপন্ন ধ্বনিকে তারজ বলা হয়। তারজ ঝোম্বড়া উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ এই চারটি অঙ্গে তার প্রযুক্ততাহেতু চার প্রকার হযে থাকে। তারহীনত্বহেতু অতারজ—এই একটি ভেদ স্বীকৃত হয়েছে এ পর্যন্ত ভেদ হল পাঁচটি। এ ছাড়া চারটি ধাতুর তারত্ব বা মেলাপক বাদে তিনটি ধাতুর তারত্ব ঘটলে আরও দুটি ভেদ হয এবং অনুরূপ-ভাবে চারটি ধাতুর অতারজত্ব বা ত্রিধাতুর অতারজত্বহেতুও দুটি ভেদ হয়। এইভাবে শাস্ত্রকার নটি প্রকারভেদের পরিকল্পনা করেছেন। এই নটি ঝোম্বড়া প্রভূত গমক এবং স্তোকগমক হেতু দ্বিবিধ। অর্থাৎ সবসুদ্ধ আঠারোটি প্রকারভেদ হল। গমকের বাহুল্য হলে সেটি প্রভূত গমক এবং অল্পগমকযুক্ত হলে সেটি হবে স্তোকগমক।

এই আঠারোটি ঝোম্বড়া গণভেদে পঞ্চবিধ। চতুর্গণনিষ্পাদিত হচ্ছে প্রায়োগিক, পঞ্চগণনির্মিতের নাম ক্রম, ষড়্গণনিষ্পাদিতের নাম ক্রমবিলাস, সপ্তগণনিষ্পাদিতের নাম চিত্র এবং অষ্টগণনিষ্পাদিতের নমে বিচিত্রলীল।

সবগুলি সংখ্যা একত্র করে ঝোম্বড়ার সংখ্যা হল নব্বই। আরও কয়েকটি ভেদ, যেমন—মাতৃকা, শ্রীপতি, সোম, রুচিত, সংগত প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় শার্ঙ্গদেব এদের পরিচয় দেন নি।

বিশেষ বিনিয়োগ অনুসারে এই নব্বইটি ঝোম্বড়ার প্রত্যেকটির তেরটি করে ভেদ হতে পারে; যথা—ব্রহ্মা, চক্রেশ্বর, বিষ্ণু, চণ্ডিকেশ্বর, নরসিংহ, ভৈরব, হংস, সিংহ, সারঙ্গ, শেখর, পুষ্পসার, প্রচণ্ডাংশু এবং নন্দীশ।

উপমা, রূপক এবং শ্লেষ—এই তিনটি অলঙ্কারে বদ্ধ ঝোম্বড়ার নাম ব্রহ্মা। এই সব অলঙ্কারের উল্লেখে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে এইসব গানে কাব্যরূপের গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব সংক্ষেপে উপমা, রূপক এবং শ্লেষ—এই তিনটি অলঙ্কারের পরিচয় দেওয়া গেল।

"সাধর্ম্যম্ উপমাভেদঃ"—এই হচ্ছে উপমার লক্ষণ, সমান ধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় দুটি পদার্থের সাদৃশ্য বর্ণনাকে উপমা বলে। যেমন-"চন্দ্রবৎ কান্তং মুখং"। চাঁদ এবং মুখ দুটি ভিন্নজাতীয় পদার্থ কিন্তু সৌন্দর্য বিষয়ে এই দুটি বস্তুর সাধর্ম্য এবং এদিক দিয়ে সাদৃশ্য প্রকটিত হয়েছে।

"তদ্রূপকম্ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োরিতি"—এইটি হচ্ছে রূপকের লক্ষণ। উপমান বা যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় তার অভেদ আরোপ হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়। "মুখমেব চন্দ্রঃ"—এইটি হচ্ছে রূপকের উদাহরণ। উপমেয় হচ্ছে মুখ এবং উপমান চন্দ্র। এখানে চন্দ্রকে মুখের সঙ্গে অভেদ করে দেখান হচ্ছে।

"শ্লেষঃ স বাক্য একস্মিন্ যত্র অনেকার্থতা ভবেৎ"—একটি শ্লেষের লক্ষণ। বাক্য বা শব্দ একবার প্রযুক্ত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোঝালে সেটি হবে শ্লেষ। "গোকুলচন্দ্র"—বললে শ্রীকৃষ্ণ বোঝায়। এখানে চন্দ্রের অর্থ শ্রেষ্ঠ। গোকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে।

উপমা, রূপক এবং শ্লেষ—এই তিনটি অলঙ্কারের বহু ভেদ আছে। এখানে সে সব পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন কেননা এসব অলঙ্কারশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। তবে, এটা বোঝা যাচ্ছে যে ঝোম্বড়া গানে অনেক রকম ভাবপ্রকাশের সুযোগ ছিল। বিশেষ করে শ্লেষের প্রয়োগ হওয়াতে এটি বিবিধ পরিবেশে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ অধুনা প্রচলিত ঝুমুরে আদিরূপ এই ঝোম্বড়া। এরই একটি শ্রেণী ক্রমে ঝুমুর নামে রূপান্তরিত হয়েছে।

বীররসে বিনিযুক্ত ঝোম্বড়ার আখ্যা চক্রেশ্বর; বিলাসে বিষ্ণু। বীভৎস-

রসে চণ্ডিকেশ্বর; অদ্ভুতরসে নরসিংহ; ভয়ানকে ভৈরব, হাস্যশৃঙ্গারে হংস, বীরভয়ানকে সিংহ; বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে সারঙ্গ, করুণে শেখর। কেবল-মাত্র শৃঙ্গারে পুষ্পসার এবং শান্তে নন্দীশ।

উপরোক্ত নব্বইটি ঝোম্বডার প্রত্যেকটির তেরটি করে ভেদ হলে সবসুদ্ধ হল ১১৭০। এই সংখ্যক ঝোম্বডার আবার গদ্যজ, পদ্যজ এবং গদ্যপদ্যজ এই তিনটি করে ভেদ হতে পারে। তাহলে মোট সংখ্যা হল ৩৫১০। এই সংখ্যা-টিকে শার্ঙ্গদেব বেশ কায়দা করে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন—ঝোম্বড়া "ইতি সংখ্যাতা বিয়চ্চন্দ্রশবাগ্নয়ঃ।" এখানে—বিয়ৎ, চন্দ্র শর এবং অগ্নি—এই চারটি শব্দে ৩৫১০—এই সংখ্যাটি নির্দেশিত হয়েছে। বিয়ৎ শব্দের মানে শূন্য। সুতরাং প্রথমে বিন্দু (০) লেখনীয়। চন্দ্রশব্দে এক সংখ্যা পাওয়া যায়। অতএব বিন্দুর বাম দিকে একটি ১ বসবে। শরশব্দে 'পাঁচ' সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে। এখনে শর মানে মদনের পঞ্চবাণ বোঝাচ্ছে। তাহলে উক্ত ১ এর বামদিকে ৫ সংখ্যাটি বসবে। অগ্নি শব্দে ৩ সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে কেননা যজ্ঞীয় অগ্নি ত্রিত্বের (ত্রি-আহুতি) জন্য বিখ্যাত। এই সংখ্যাটি উক্ত সংখ্যাত্রয়ের বামে বসালে ৩৫১০ সংখ্যাটি লাভ হয়।

এই ঝোম্বডা শ্রেণী গদ্য, পদ্য এবং গদ্যপদ্যে ব্যবহৃত হওযাতে এটি যে নানা অভিণয়াত্মক বিষযে প্রযুক্ত হত সেটি বোঝা যাচ্ছে।

এর পর লম্ভক নামক সূড প্রবন্ধ।

লম্ভক প্রবন্ধে সমগ্র উদ্‌গ্রাহটি একখণ্ডে একবার গাওযা যেতে পারে অথবা দুটি খণ্ডে ভাগ করে গাওয়া যেতে পারে। ধ্রুব এবং আভোগও এক বা দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হতে পারে। ধ্রুব দুটি ভাগে বিভক্ত হলে এটিকে ঝোম্বডাব উদগ্রাহেব মত প্রথমার্ধ এবং উত্তরার্ধে ভাগ করতে হবে। এটি হবে তুল্যধাতুক এবং কোন কোন সময়ে এই উত্তরার্ধের উদ্‌গ্রাহ ধ্রুবের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এইরূপে ধ্রুব গেযে আভোগের পর আবার ধ্রুবের অনুষ্ঠান করে লম্ভক প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে হবে। উদগ্রাহ অংশটি তালশূন্য হলে তাকে আলাপ-লম্ভক বলা হয়। উদ্‌গ্রাহ যদি দ্বিখণ্ডিত হয় তাহলে ধ্রুবের পূর্বে আচরিতব্য দ্বিতীয় খণ্ডটি অন্যধাতুক অর্থাৎ বিসদৃশভাবে গাওয়া হলে তাকে বলে প্রলম্ভ। লম্ভক প্রবন্ধের কলিগুলি বিভক্ত হলে তাকে বলে ভাগলম্ভ। যখন ভিন্ন উদ্‌গ্রাহসমন্বিত ধ্রুব তিন, চার বা পাঁচ বার অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে বলে লম্ভপদ। এক উদ্‌গ্রাহ প্রতিবার বিভিন্ন ধ্রুবের সঙ্গে গাওয়া হলে

তাকে বলে অনুলম্ভ। প্রতিবার ভিন্ন উদ্‌গ্রাহ এবং ভিন্ন ধ্রুবের অনুষ্ঠান হলে তাকে বলা হয় উপলম্ভ। লম্ভপদ, অনুলম্ভ এবং উপলম্ভ প্রবন্ধে আভোগ অঙ্গটি থাকে না। যেক্ষেত্রে ধ্রুব এবং আভোগ কোনটিই থাকে না কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহের বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় বিলম্ভ।

এই প্রসঙ্গে কল্লিনাথ একটু আলোচনা করেছেন। ধ্রুব প্রবন্ধ সঙ্গীতের নিত্য অংশ। দেখা যাচ্ছে লম্ভক প্রবন্ধে এই ধ্রুব অংশটিও বর্জিত হয়েছে। অতএব এর নিত্যত্বহানি ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু আরও ভেদান্তর থাকাতে ধ্রুবের অভাব হলেও নিত্যত্ব হানি ঘটবে না। কল্লিনাথ বলছেন– 'অত্র একস্মিন্ ভেদে ধ্রুবস্য অভাবে অপি ভেদান্তরেষু সম্ভাবাৎ তস্য ন নিত্যত্বহানিঃ।' কল্লিনাথ আরও বলছেন যে ধ্রুব এবং আভোগ যখন থাকে না তখন অনেকগুলি উদগ্রাহের আচরণ হয়। এক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহই ধ্রুবের প্রতিনিধিত্ব করে। এইরকম হলে এটির একধাতুত্ব ঘটবার সম্ভাবনা নেই, কেননা একধাতুত্ব প্রবন্ধসঙ্গীতে স্বীকৃত হয় না। এটী পদ-তালবদ্ধ তারবলীজাতীয় প্রবন্ধ।

এর পর রাসক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের লক্ষণ ঝোম্বডার মত তবে এটি গমকস্থানবর্জিত। ঝোম্বডার গমকযুক্ত অংশ হচ্ছে মেলাপক। অতএব গমকস্থানবর্জিত অর্থে রাসক প্রবন্ধ মেলাপকবর্জিত এইরূপ অনুমান হয়। কল্লিনাথও এইটি সমর্থন করেছেন। এটি রাসতালে গাওয়া হয়। কারো কারো মতে রাসক প্রবন্ধ গণ, বর্ণ এবং মাত্রা অনুসারে তিন প্রকারে নিবদ্ধ হতে পারে।

গণজ রাসক প্রবন্ধ চার প্রকার। কল্লিনাথের মতে ছ-গণদ্বারা বদ্ধ রসক-প্রবন্ধের নাম রাসবলয়, প-গণ নিবন্ধের নাম হংসতিলক, চ-গণ নিবন্ধের নাম রতিরঙ্গক এবং ত গণ নিবন্ধের নাম মদনাবতার।

ষডক্ষর চরণ থেকে আরম্ভ করে ত্রিদশাক্ষর চরণ পযন্ত পঁচিশ প্রকার বর্ণজ রাসক প্রবন্ধের প্রকারভেদ হতে পারে।

মাত্রানিষ্পাদিত বাসকের ভেদ অষ্টমাত্রিক চরণ থেকে আরম্ভ করে ষষ্টিমাত্রিক চরণ পর্যন্ত তিপ্পান্ন প্রকার হতে পারে।

এই ভেদগুলি ছাড়া আরও অনেক প্রকার অপ্রসিদ্ধ রূপ আছে। শার্ঙ্গদেব সেগুলির পরিচয় প্রদান করেন নি।

সিংহভূপাল বলছেন গণনিবদ্ধ রাসকের নাম রাসবলয়, বর্ণনিবন্ধের নাম হংসতিলক এবং মাত্রানিবন্ধের নাম রতিরঙ্গক। তাঁর মতে এ ছাড়া ছ-

গণদ্বারা আবদ্ধ আর-একটি রাসক প্রবন্ধের নাম মদনাবতার। শার্ঙ্গদেব রাসকপ্রবন্ধের বর্ণনা দিয়েছেন—

ভজতে রাসকঃ সোঽয়ং রাসতালেন গীয়তে।
গণৈর্বর্ণৈশ্চ মাত্রাভিঃ কোচিদেনং ত্রিধা জগুঃ॥
স্যাদ্রাসবলয়ো হংসতিলকো রতিরঙ্গকঃ।
চতুর্থস্তত্র মদনাবতারশ্ছগণাদিজঃ॥

এ থেকে অনুমান হয় হয় যে শার্ঙ্গদেবের মতে ছ-গণ থেকে আরম্ভ করে চারটি গণজ প্রকার হয়—রাসবলয, হংসতিলক, রতিরঙ্গক এবং মদনাবতার। এই ব্যাখাটি পূর্বে দেওয়া হয়েছে এবং কল্লিনাথও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। এটি পদতালবদ্ধ তারাবলীজাতীয প্রবন্ধ।

অতঃপর শুদ্ধসূড়ের শেষ প্রবন্ধ একতালিকার বর্ণনা।

একতালিকায উদগ্রাহ এবং ধ্রুব দু বার গাওয়া হয। আভোগ অংশটিও দু বার গেয়ে ধ্রুব অংশটি পুনর্বার অনুষ্ঠানের পর সেখানেই গীত শেষ করা হয়। কারো কারো মতে উদ্‌গ্রাহ অংশটি কেবলমাত্র আলাপ অর্থাৎ প্রযোগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয। যদি তা না হয় তাহলে উদগ্রাহে পদ বা বাক্যের অস্তিত্ব থাকবে।

সিংহভূপালের মতে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব দু বার গাওয়া হবে। তারপর অভোগ এবং ধ্রুব একবার করে গেযে উদগ্রাহে গীতের সমাপ্তি ঘটবে। পদ-তালবদ্ধ মেলাপকবর্জিত এই প্রবন্ধটি তারাবলীজাতীয।

শুদ্ধ সূড প্রবন্ধের পব এইবার আলিক্রম প্রবন্ধের পরিচয় শার্ঙ্গদেব প্রথমে বর্ণ প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন।

প্রধানতঃ কর্ণাটভাষায় রচিত বর্ণ প্রবন্ধে বর্ণতালের প্রযোগ হয়। এই গীতি বিরুদদ্বারা বদ্ধ। বর্ণতাল তিন প্রকাব—ত্র্যশ্র মিশ্র এবং চতুরশ্র। দুটি লঘু, দুটি দ্রুত এবং দুটি লঘু মাত্রায় এ্যশ্রবর্ণ গঠিত ।।০০।।)। অর্ধ-মাত্রাকে দ্রুত বলা হয়। বিন্দু অর্থাৎ '০'—এইচিহ্নদ্বারা দ্রুত মাত্রা বোঝানো হয়ে থাকে।

ৎ ৎ ৎ ´
মিশ্রবর্ণ হচ্ছে এই রকম—০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ঽ ঽ ০ ০ ঽ। ঽ।

বিন্দুর উপর 'ৎ'—চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে সেই মাত্রাটি বিরামান্ত অর্থাৎ তার পরেই বিরাম। এখানে দেখা যাচ্ছে চারটি করে বিরামান্ত দ্রুতমাত্রার পৃথক তিনটিব সমাপ্তি রয়েছে। তারপরে একটি প্লুত (ঽ), তারপর একটি

গুরু; তারপরে আবার দুটি দ্রুত, একটি গুরু, একটি লঘু এবং শেষে একটি গুরু। চতুরস্রের বিন্যাস হচ্ছে—s । ০ ০ s ।

এই প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহ প্রভৃতি কলির উল্লেখ না থাকলেও যেহেতু সকল প্রবন্ধেই এইগুলির অস্তিত্ব থাকে সেই কারণে পদগুলিকে কলি অনুসারে সাজিয়ে নেওয়া হয়। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধটি ত্রিধাতুক এবং বিরুদ-পদ-তালবদ্ধ হওয়াতে ভাবনীজাতীয়।

স্বর, পাট, পদ এবং তেন—এই চারিটিকে অবলম্বন করে অভিলষিতরূপে গীত রচিত হলে তাকে বলে বর্ণস্বর প্রবন্ধ। আদিতে স্বর, পাট, পদ বা তেনকের বিন্যাস অনুযায়ী এই গীতের চারটি ভেদ হতে পারে।

এর পরে গদ্য প্রবন্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। ছন্দহীন পদসমষ্টিকে বলা হয় গদ্য। গদ্যরূপও গেয় বস্তু হতে পারে। অবশ্য এই গদ্য এলোমেলো হলে চলবে না তার একটা সুসম্বদ্ধ রূপ থাকা চাই। ছন্দশাস্ত্রেও গদ্যের উল্লেখ আছে। গেয় গদ্য প্রবন্ধ ছয় প্রকার—উৎকলিকা চূর্ণ, ললিত, বৃত্তগন্ধি, খণ্ড এবং চিত্র। শার্ঙ্গদেব বলেছেন গদ্যগুলি সামবেদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

উৎকলিকা বীররসে গেয়। অধিদেবতা—রুদ্র। বর্ণ—রক্ত। রিতি-গৌড়ী। বৃত্তি—আরভটি। সিংহভূপাল বলছেন যে বর্ণ, দেবতা কথনের অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে এটি উপাসনায় প্রয়োগের পক্ষে প্রশস্ত। ছন্দোমঞ্জরী বলছেন—দীর্ঘসমাসযুক্ত ও দৃঢ়াক্ষারগ্রথিত গদ্যের নাম উৎকলিকা প্রায় (গুরুনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত ছন্দোমঞ্জরী। উক্ত গ্রন্থে এর উদাহরণ :—

প্রণিপাতপ্রবণসম্প্রধানাশেষসুরাসুরাদিবৃন্দসৌন্দর্য্যপ্রকটকিরীটকোটি-নিবিষ্ট-স্পষ্টমণিময়ূখচ্ছটাচ্ছুরিতচরণনখচক্র! বিক্রমোদ্দামবামপাদাঙ্গুষ্ঠনখর শিখর-খণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডবিবর নিঃসরচ্ছরচ্ছরদমৃতকরকরপ্রকরভাসুরসুরসুরবাহিনী প্রবাহ পবিত্রোকৃতপিষ্টপত্রিতয়! কৈটভারে! ক্রূরতরসংসারসাগরনানাপ্রকার বর্তবিবর্তমানবিগ্রহং মামনুগৃহণ।

চূর্ণ শান্তরসে গেয়। বর্ণ – পীত। দেবতা—ব্রহ্মা! রীতি—বৈদর্ভী। বৃত্তি—সাত্বতী। ছন্দোমঞ্জরী বলছেন অকঠোরাক্ষর, স্বল্পসমাসযুক্ত, বৈদর্ভীরীতিস্থ গদ্য হচ্ছে চূর্ণক। কাশীসংস্কৃত সিরিজ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে 'চূর্ণক' স্থানে "ধ্রুবক" বলা হয়েছে। এই দুটি একই বস্তু। এর উদাহরণ :—

স হি ত্রয়াণামেব জগতাং গতিঃ পরমপুরুষঃ পুরুষোত্তমো দৃপ্তাদানবভরেণ ভঙ্গুরাঙ্গীমবনিমবলোক্য করুণার্দ্রহৃদয়স্তস্যা ভারমবতারয়িতুং রামকৃষ্ণস্বরূপেণাং

শতো যদুবংশেঽবততার। যস্ব প্রসঙ্গেনাপি স্মৃতোঽভ্যচিতো বা গৃহীতনামা পুংসাং সংসারসাগরপারমবলোকয়তি।

বৃত্তগন্ধি নামক গদ্যে রস শান্ত। বর্ণ—পীত। দেবতা—মুনি। রীতি—পাঞ্চালী। বৃত্তি—ভারতী। এতে কিছু পদ্যও মিশ্রিত থাকে। এই জন্যই বোধহয় এর নাম বৃত্তগন্ধি অর্থাৎ পদ্যের গন্ধ এতে আছে। ছন্দোমঞ্জরী বলছেন—"বৃত্তৈকদেশসম্বন্ধাৎ বৃত্তগন্ধিঃ" অর্থাৎ গদ্যের একদেশে বৃত্তের সম্বন্ধ হলে তাকে বৃত্তগন্ধি বলা হয়। উক্ত গ্রন্থে এর উদাহরণ :—

জয় জয় জনার্দন! সুকৃতিমনস্তডাগবিকস্বরচরণপদ্ম! পদ্মপত্রনয়ন! পদ্মাপদ্মিনীবিনোদরাজহংস! ভাস্বরযশঃপটলপরিপূরিতভুবনকুহর। হরকমলাসনাদিবৃন্দারকবৃন্দবন্দনীয়পদারবিন্দদ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বনির্মুক্ত যোগীন্দ্রহৃদয়মন্দিরাবিষ্কৃতনিরঞ্জনজ্যোতিস্বরূপ! বিশ্বরূপ! অনাথনাথ! জগন্নাথ মামনবধিভবদুঃখব্যাকুলং রক্ষ রক্ষ।

এছাড়া আরও যে তিনটি গদ্যের রূপ শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন ছন্দোমঞ্জরীতে তাদের উল্লেখ নেই। বৃত্তরত্নাকরে গদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ললিত নামক গদ্যের রস শৃঙ্গার। বর্ণ—পীত। দেবতা - মদন। বৃত্তি কৈশিকী। রীতি পাঞ্চালী।

খণ্ডনামক গদ্যের রস হাস্য। বর্ণ—শ্বেত। দেবতা গণেশ। বৃত্তি-সাত্বতী। রীতি - বৈদর্ভী।

চিত্রনামক গদ্যের রস শৃঙ্গার। দেবতা—বিষ্ণু। বৃত্তি কৈশিকী। কিন্তু, এটি অপর বৃত্তির সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে। রীতি বৈদর্ভী।

মতান্তরে গদ্য প্রবন্ধের দুটি ভেদ স্বীকৃত হয় বেণী এবং মিশ্র। পূর্বোক্ত দুটি গদ্যপ্রবন্ধই বেণীর অন্তর্গত। চূর্ণ, বৃত্তগন্ধি প্রভৃতির মিশ্রণে বিরচিত গদ্যের নাম মিশ্র।

শার্ঙ্গদেব বলছেন পূর্বসূরীগণ গদ্য প্রবন্ধের ছয় প্রকার গতি নির্দেশ করেছেন —দ্রুতা, বিলম্বিতা, মধ্যা, দ্রুতমধ্যা দ্রুতবিলম্বা, মধ্যবিলম্বিতা।

লঘুর বহুল প্রয়োগ হচ্ছে দ্রুতার লক্ষণ। স্বল্পলঘুযুক্ত হলে সেটি হবে বিলম্বিতা। সমভাবে লঘুর প্রয়োগ হলে তাকে মধ্যা বলা হয়। লঘু এবং গুরু পৃথকভাবে অথবা মিশ্রভাবেও প্রযুক্ত হতে পারে। প্রথমার্ধে লঘু এবং দ্বিতীয়ার্ধে গুরু হলে সেটি হবে দ্রুতমধ্যা। প্রথমার্ধে সমত্ব এবং শেষার্ধে গুরুত্বের প্রয়োগ হলে সেটি হবে মধ্যবিলম্বিতা গতি। এখানে লঘু, গুরু এবং

সম—এই তিনটি শব্দ গতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্রা বা বর্ণ হিসাবে নয়। ছ'টি গদ্য প্রবন্ধ এই ছয় প্রকার গতিভেদে ছত্রিশ রকমের হয়ে থাকে।

এই গদ্য প্রবন্ধ কিভাবে গাওয়া হত তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধ গায়নের প্রাথমিক অনুষ্ঠানটি তালবর্জিত। আদিতে প্রণব বা ওঙ্কার বন্দনা। এই অংশটিতে বিভিন্ন গমকের প্রয়োগ বিধেয়। এর সঙ্গে বর্ণ এবং স্বর যুক্ত থাকে। কল্লিনাথ বর্ণ অর্থে স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ বুঝিয়েছেন। সিংহভূপাল বর্ণ শব্দের অর্থে পদ এবং অর্থের সংযোগ বোঝাচ্ছেন। এই বাক্যাংশের মাঝে মাঝে বা শেষে স্বর অর্থাৎ সরগমের অনুষ্ঠান হতে পারে। শার্ঙ্গদেব বলছেন—"বর্ণৈশ্চাতালশব্দানাং স্বরৈরন্তেঽন্তরান্তরা"। কল্লিনাথ বলছেন—"অত্র বর্ণশব্দেন স্থায়াদয়শ্চত্বারো বর্ণা উচ্যন্তে। তৈশ্চ যুক্তমিতি চকারার্থঃ। অতালশব্দানামন্তে অন্তরান্তরা স্বরৈযু তমিত্যন্বয়ঃ। অতালশব্দানাং তালরহিতানাং বাচকপদানামন্তে অবসানে সমাপ্তাবিত্যর্থঃ অন্তরান্তরা মধ্যে মধ্যে পদাবসানেষু ইত্যর্থ.। অত্র স্বরৈঃ সরিগাদিভিযু তং যথা তথা গাতব্যমিত্যর্থ.ঃ"। অতাল অনুষ্ঠানের পর সতাল অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দুটি পদ পৃথকভাবে তালসহযোগে গীত হয়ে থাকে। কল্লিনাথ বলছেন প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি পদই তালের বৈষম্য না ঘটিয়ে দু বার করে গাওয়া উচিত। এই পদদ্বয় প্রবন্ধাঙ্ক নামে পরিচিত। অতঃপর একবার বিলম্বিত লয়ে প্রযোগের (অর্থাৎ অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি) অনুষ্ঠানে হবে। প্রয়োগ অনুষ্ঠানের পর আবার যে সতাল অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে তাতে গাতা বা বাগ্‌গেয়কারের এবং বর্ণ্য বা নায়কের নাম থাকবে। এই সতাল অনুষ্ঠানে লয়ের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ একবার বিলম্বিত এবং পুনরায় অবলম্বিত গতিতে গেয়ে পরিশেষে বিলম্বিত তালে গদ্যানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

কল্লিনাথ বলছেন যে এই গদ্য প্রবন্ধের তালরহিত ভাগটিকে উদ্‌গ্রাহ হিসাবে গণ্য করতে হবে। পরবর্তী সতাল পদদ্বয় ধ্রুবরূপে গ্রাহ্য। তৎপরবর্তী প্রয়োগ এবং তালযুক্ত শেষ অনুষ্ঠানটি আভোগরূপে পরিকল্পনীয়। এটি ত্রিধাতুক, তালাদিনিয়মে নিযুক্ত প্রবন্ধ এবং পদ-স্বর তালবদ্ধহেতু ভাবনীজাতীয়।

আমাদের দেশে কথকতার যে ধারাটি চলে এসেছে সেটির মূলে রয়েছে এই গদ্য প্রবন্ধের গায়নপদ্ধতি এবং তার প্রভাব। গদ্য প্রবন্ধের গায়নপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করলে কথকতার সঙ্গে এর একটি সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

এরপর কৈবাড় নামক প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে পাটাক্ষার-দ্বারা উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের অনুষ্ঠান করা হয় এবং সমাপ্তিকালে উদ্‌গ্রাহ অংশটি পুনরায় আচরণ করা হয়। কৈবাড় প্রবন্ধ দ্বিবিধ—সার্থক এবং অনর্থক। এই অর্থযুক্ত পাট এবং অর্থহীন পাট বলতে কি বোঝায় সেটি ব্যাখ্যা করে দেখান হয় নি। কৈবাড়—এই শব্দটি সম্বন্ধে কল্লিনাথ টীকায় বলছেন—"কৈবাড় ইতি করপাট প্রধানত্বাত্তদ্ভবোঽপভ্রংশপদেনেয়ং সংজ্ঞা"। এর থেকে মনে হয় মূলতঃ শব্দটি ছিল—'করপাট'। এই শব্দটি প্রাকৃত ভাষায় বিকৃত হলে 'কৈবাট' নামে পরিচিত হয় এবং শার্ঙ্গদেবের যুগে একটি 'কৈবাট' নাম ধারণ করে। এই কারণেই কল্লিনাথ বলেছেন যে করপাট-প্রাধান্যহেতু এটি একটি তদ্ভব অপভ্রংশ শব্দ। যে শব্দ সংস্কৃতভাষা থেকে জাত কিন্তু প্রাকৃতভাষায় বিকৃতরূপ ধারণ করে তার ব্যাকরণগত আখ্যা—'তদ্ভব'। এক্ষেত্রে 'করপাট' শব্দটি প্রকৃত ভাষায় 'কৈবাড়'—এই বিকৃত উচ্চারণে প্রচারিত হয়েছে। মতঙ্গের বৃহদ্দেশী নামক গ্রন্থে এই গীতটির নাম 'কৈবাঢ'। উক্ত গ্রন্থে এর বর্ণনা :—

অক্ষরৈর্গীয়তে সম্যক্ পাটৈরেব হি কেবলৈঃ ॥
কৈবাট ইতি স জ্ঞেয়ো গন্ধর্বৈস্তালসংযুতঃ।

বিবিধ পাটাক্ষার-সহযোগে গান্ধর্ব (অর্থাৎ মার্গতাল) তালে যে গীতি অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে 'কৈবাঢ'।

শার্ঙ্গদেব বলছেন যে কৈবাড় প্রবন্ধ পুনরায় শুদ্ধ এবং মিশ্রভেদে দ্বিবিধ হয়ে থাকে। সিংহভূপালের ব্যাখ্যা অনুসারে কেবলমাত্র পাটদ্বারা বিরচিত হলে সেটি হবে শুদ্ধ এবং পদস্বরাদির মিশ্রণ হলে সেটি হবে মিশ্র। কল্লিনাথ কৈবাড় প্রবন্ধকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—"সার্থকশুদ্ধকৈবাড়, অর্থহীনশুদ্ধ-কৈবাড়, সার্থকমিশ্রকৈবাড় এবং অর্থহীনমিশ্রকৈবাড়। তাঁর মতে শুদ্ধকৈবাড়ে বাদ্যের বোল মুখে উচ্চারিত হবে না। মিশ্রকৈবাড়েই করপাটের সঙ্গে মুখোচ্চারিত বাদ্যাক্ষরের প্রয়োগ হবে। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—"স শুদ্ধৈর্মিশ্রৈঃ পাটৈরিত্যত্র পাটানাং শুদ্ধত্বং মুখবাদ্যাক্ষরামিশ্রিতত্বম্; মিশ্রিতত্বং তু মিশ্রত্বম্; তৎসহিতত্বমিত্যর্থঃ। এবং সার্থকঃ শুদ্ধকৈবাড় একঃ; অর্থহীনঃ শুদ্ধকৈবাড়ো দ্বিতীয়তঃ, সার্থকমিশ্রকৈবাড়স্তৃতীয়ঃ, অর্থহীনমিশ্রকেবাড়শ্চতুর্থ ইতি চতুর্ধা ভবতি" কল্লিনাথ আরও বলেছেন যে নেতা এবং গাতার নামাঙ্কিত পদদ্বারা এই প্রবন্ধের আভোগ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।—"অত্র নেতৃগাতৃপ্রবন্ধনামাঙ্কিতৈঃ

পদৈরাভোগো গাতব্যঃ"। অতঃপর কল্লিনাথ বলছেন যে এটি ত্রিধাতুক কিন্তু তালাদির নিয়ম অনির্দিষ্ট থাকাতে এটি অনির্যুক্ত প্রবন্ধের অন্তর্গত। পরের ছত্রেই আবার বলেছেন যে পাট-পদ-তালযুক্ত হওয়াতে এটি ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ। এতে মনে হয় এই প্রবন্ধ সবসময় দৃঢ়বদ্ধ শৃঙ্খলার সঙ্গে গাওয়া হত না।

বর্তমান সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে 'কৈবাড়' প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এইরকম অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে বর্তমান খেয়াল এবং তারানা —এই কৈবাড় নামক প্রবন্ধেরই পরিণতি। এ সম্বন্ধে ঘনশ্যামদাস (নরহরি চক্রবর্তী) কর্তৃক সংকলিত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' (১৮—১৯ শতাব্দী) নামক গ্রন্থে 'কায়বাল' নামক গীতের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। সম্ভবত এই লক্ষণটি 'গীতপ্রকাশ' নামক একটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। লক্ষণটি এই রকম :—

কায়বালঃ—

> এভ্যোহন্যো কায়বালাখ্যঃ স এবাদৌ নিরুচ্যতে।
> যতস্তালাঃ প্রকাশ্যন্তে পাটনাত্রেণ কেবলম্॥
> পদানাং কল্পনাভোগে কায়বালঃ স ঈর্য্যতে॥
> উদাহরণন্তু গীতপ্রকাশে মৃগ্যম্।

এই বর্ণনা অনুসারে বোঝা যাচ্ছে যে কায়বাল নামক গীতে পাট বা বাদ্যাক্ষর-দ্বারাই তাল প্রকাশ করা হত এবং আভোগ অংশে পদাদির কল্পনা করা হত। এই লক্ষণটি কৈবাড় প্রবন্ধের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এবং পরবর্তী কালের কায়বাল গীত যে কৈবাট বা কৈবাড় প্রবন্ধেরই পরিণতি এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। দুঃখের বিষয় গীতপ্রকাশ নামক গ্রন্থটির পরিচয় এখনো পাওয়া সম্ভব হয় নি কেননা এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, পেলে উক্ত গ্রন্থ থেকে এই গীতের উদাহরণ পাওয়া যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লিখিত চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা (১৬২০ খ্রীঃ) গ্রন্থের প্রবন্ধ-প্রকরণে গ্রন্থকার বেঙ্কটমখি বলছেন যে তাঁর সময় এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটেছিল যাঁরা আভোগটিকে পৃথকভাবে যোজনা করে একপ্রকার প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করতেন এবং কৈবাড় প্রভৃতি প্রবন্ধেই এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত। কিভাবে এই আভোগটির প্রয়োগ হত সেটি ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন যে, আভোগটিকে দুটি ভাগ করে তার প্রথম অর্ধটি তালবর্জিত আলাপের মত গাওয়া হত; দ্বিতীয় অর্ধটি তালযুক্ত

করে গাওয়া হত। প্রথম অর্ধে গাতার নাম থাকত আর দ্বিতীয় অর্ধে থাকত বর্ণ্য বা নায়কের নাম।

এই সমস্ত বর্ণনা থেকে এইটা মনে হয় যে এই কৈবাড়ই খেয়ালের আদিরূপ এবং পরিবর্তনটি এইভাবে হয়েছে—

করপাট→কৈবাট→কৈবাড→কায়বাল—খয়াল বা খেয়াল। জৌনপুরের সুলতান হোসেন শিকী খেযাল সৃষ্টি করেন বা আমীর খস্রুবিরচিত কাওয়াল থেকে খেয়ালের উৎপত্তি হয়েছে—এইসব অভিমত কতটা সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আজ পযন্ত খেয়ালে কৈবাড প্রবন্ধের বিশেষত্ব রক্ষিত আছে। ত্রিবট, চতুরঙ্গ, যুগলবন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর খেয়ালে বাদ্যের বোল, সগম পদ প্রভৃতি সবই বজায় আছে। তবে, কালের নিয়মানুসারে গায়নরীতি খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থহীন কৈবাডের সঙ্গে বর্তমান তেলেনার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। তেলেনায় ব্যবহৃত শব্দগুলির কোন অর্থ নেই বলেই এগুলিকে অর্থহীন বলা হয়েছে। কৈবাড প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের প্রাধান্য ছিল এবং বর্তমানেও খেয়ালে স্থায়ী এবং অন্তরা দুটি কলির অস্তিত্ব বর্তমান। অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা খেয়ালে সঞ্চারীর মত সুরের বিস্তার করে আবার আভোগের মত পদ সৃষ্টি করেন। চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় এই রীতির কথাই বলা হয়েছে। লেখকের ধারণা আমীর খস্রু এই কৈবাড বা কায়বাল প্রবন্ধ ভেঙ্গেই দিল্লীতে কাওয়াল এবং তারানার প্রচলন করেন। এ সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী বলেছেন—"The Songs of Delhi are called Kaul and Tarana. These last were introduced by Amir Khasrau of Delhi in concert with Samit and Tatafr and by combining the several styles of Persia and India form a delightful variety" (Ain-i-Akbari N Jarret ed. J. N. Sarkar). এখান থেকেও এইটাই অনুমান হয় যে ভারতীয় পদ্ধতিতে কিছুটা বহিঃপ্রভাব এনে মধ্যযুগে কাওয়াল এবং তারানার প্রচার করা হয়েছে। অতএব দিল্লীতে প্রচলিত কাওয়ালী গানের মূলেও যে ভারতীয় কৈবাড প্রবন্ধের প্রভাব বর্তমান সেটিও অস্বীকার করবার উপায় নেই। এইসব নানা প্রভাবের ফলেই বর্তমান খেয়াল খানিকটা রূপ পরিবর্তন করেছে।

এরপর অঙ্কচারিণী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি বীর এবং রৌদ্র রসাশ্রিত এবং কেবলমাত্র বিরুদদ্বারা বদ্ধ। এর আভোগে বর্ণ্যনাম অর্থাৎ নায়কের নাম

থাকে। কল্লিনাথ বলছেন এখানে বীর বলতে দানবীর, দয়াবীর এবং যুদ্ধবীর —এই ত্রিবিধ বীরকেই বুঝতে হবে। সিংহভূপাল বিরুদ শব্দ সম্বন্ধে বলেছেন —"গুণো নাম ভুজবলভীমাদি বিরুদশব্দে নোচ্যতে।" সাধারণতঃ বীররসের সঙ্গেই বিরুদ অঙ্গটির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধের ছটি ভেদ— বাসবী, কলিকা, বৃত্তা, বীরবতী, বেদোত্তরা এবং জাতিমতী। বাসবীতে একটি তালের সঙ্গে আটটি বিরুদের অনুষ্ঠান করা হয়। দুটি তালের সঙ্গে ষোড়শ বিরুদের অনুষ্ঠান হলে তাকে বলা হয় কলিকা। তিনটি তালে বত্রিশটি বিরুদের অনুষ্ঠান হলে সেটি বৃত্তা নামে কথিত হয়। চারটি তালে বাহান্নটি বিরুদের অনুষ্ঠান হলে তাকে বলে বীরবতী। পাঁচটি তালে একশ-চারটি বিরুদের অনুষ্ঠানে হলে সেটিকে বলা হয় বেদোত্তরা। জাতিমতীতে তাল এবং বিরুদ সম্পর্কীয় কোন নিয়ম নির্ধারিত নেই।

অতঃপর কন্দ। এই প্রবন্ধটি কর্ণাটদেশীয় ভাষায় প্রচলিত। এটি পাট এবং বিরুদদ্বারা বদ্ধ। শার্ঙ্গদেব বলছেন এটি তালবর্জিত। সিংহভূপালও সেটি সমর্থন করেছেন। কল্লিনাথ বলছেন—"তালরূপেণ শূণ্যো গেয় ইত্যর্থঃ ন তাল নিয়মশূন্য ইতি বিবক্ষিতঃ।" এই মতটি সমীচীন কেননা আর্যাগীতি নামক ছন্দটি কন্দ প্রবন্ধের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ছন্দ থাকলে তালেরও একটা নিয়ম থাকে। পূর্বে ঢেঙ্কি প্রবন্ধের প্রসঙ্গে আমরা আর্যার নটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেছি, এর মধ্যে 'গীতি' অন্যতম। আর্যার দ্বিতীয়ার্ধ প্রথমার্ধের অনুরূপ হলে সেটিকে গীতি বলা হয়। উদাহরণ—

মধুরং বীণারহিতং পঞ্চমসুভগশ্চ কোকিলালাপঃ।
গীতিঃ পৌরবধূনাং মধুরা কুসুমায়ুধং বিবোধয়তি॥

বৃত্তরত্নাকর বলছেন—

আর্যাপ্রথমদলোক্তং যদি কথমপি লক্ষণং ভবেদুভয়োঃ।
দলয়োঃ কৃতযতিশোভাং তাং গীতিং গীতবান্ ভুজঙ্গেশঃ॥

কল্লিনাথ বলছেন আর্যায় প্রথমার্ধে ত্রিংশৎ মাত্রা এবং দ্বিতীয়ার্ধে অষ্ট-বিংশতি মাত্রা। আর্যাগীতিতে দ্বিতীয়ার্ধেও ত্রিংশৎ মাত্রা হয়ে থাকে। অতঃপর কল্লিনাথ বলছেন যে এইরূপ আর্যাগীতির প্রথমার্ধ উদ্‌গ্রাহের ন্যায় পদবিন্যাস দ্বারা গাইতে হবে এবং দ্বিতীয়ার্ধকে ধ্রুবরূপে পাট এবং বিরুদযুক্ত করে গাইতে হবে। এই ধ্রুব অংশে পাটের অনুষ্ঠান হবার পর গান শেষ হবে।

আর্যাদি জাতিতে চারটি মাত্রা নিয়ে পাঁচটি গণ আছে। এগুলি হচ্ছে—সর্বগুরু, অন্তগুরু, মধ্যগুরু, আদিগুরু এবং চতুর্লঘু। এইরকম চতুর্মাত্রিক গণদ্বারা আর্যাদি ছন্দের লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়। ত্রিংশৎগুরু থেকে আরম্ভ করে ক[illegible] দ্বিগুরু পর্যন্ত কন্দের উনত্রিশটি ভেদ হতে পারে। যথাক্রমে এগুলির নাম হচ্ছে—পবন, রবি, ঘনদ, হব্যবাহন, সুরনাথ, সমুদ্র, বরুণ, শশী, শৈল, মধু, মাধব, মকরধ্বজ, জয়ন্ত, মধুপ, শুক, সারস, কেকী, হরি, হরিণ, হস্তী, কাদম্ব, কূর্মক, নয়, বিনয়, বিক্রম, উৎসাহ, ধর্ম, অর্থ ও কাম।

এরপর হয়লীলা প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি হয়লীল তালে রচিত। হয়লীল বা তুরঙ্গলীল তালের লক্ষণ হচ্ছে বিরামান্ত দুটি দ্রুতের পর আরও দুটি দ্রুত (০০০০)। অ্যাডায়ার সংস্করণের প্রবন্ধাধ্যায় ২৬০ পৃষ্ঠায় কল্লিনাথের টীকায় রয়েছে—"বিরামান্তদ্রুত-ত্রয়াৎ দ্রুতৌ তুরগলীলঃ স্যাৎ"—এটি ভুল উদ্ধৃতি। এটি হবে—"বিরামান্তদ্রুতদ্বয়াৎ দ্রুতৌ তুরঙ্গলীলঃ স্যাৎ"।

এই প্রবন্ধটি দ্বিবিধ—গদ্যজ এবং পদ্যজ। পদ্যজ প্রবন্ধটি চতুর্বিধ। আবার পূর্বার্ধ তালযুক্ত (হয়লীল তাল) হলে সেটি একপ্রকার হয়লীলা। উত্তরার্ধ তালযুক্ত হলে সেটি দ্বিতীয় প্রকার। পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ দুটিই তালযুক্ত হলে সেটি তৃতীয় প্রকার ভেদ। তালযুক্ত প্রথমার্ধ স্বর, পদ, বিরুদ দ্বারা গ্রথিত হলে সেটি চতুর্থ প্রকার হয়লীলা বলে বিবেচিত হয়। কল্লিনাথ বলছেন যে প্রথম তিনটি প্রকারে কেবল পদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

অপর মতানুসারে হয়লীলা প্রবন্ধ হয়লীল ছন্দ থেকে প্রস্তুত হয়েছে। এই ছন্দটি ত্রয়োবিংশতি অক্ষরযুক্ত বিকৃতি নামক ছন্দ জাতির অন্তর্ভুক্ত। ছন্দশাস্ত্রে একাক্ষরা বৃত্তি থেকে একটি করে অক্ষর বাড়িয়ে ছাব্বিশটি অক্ষর পর্যন্ত সমবৃত্ত ছন্দের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে যে জাতীয় ছন্দের চরণে তেইশটি অক্ষর থাকে তাকে বলা হয় বিকৃতছন্দ। হয়লীল ছন্দের পরিচিত নাম হ'চ্ছে 'অশ্বললিত'। এটিকে 'অদ্রিতনয়া' ছন্দও বলা হয়। এই ছন্দের প্রতি পাদে ক্রমশ ন-গণ, জ-গণ, ভ-গণ, জ-গণ, ভ গণ, জ গণ, ভ-গণ, ল কার এবং গ-কার থাকে। গণ হিসাবে সাজালে এটি হবে এইরকম—

III	ISI	SII	ISI	SII	ISI	SII	I	S
ন	জ	ভ	জ	ভ	জ	ভ	ল	গ

বৃত্তরত্নাকর গ্রন্থে হয়লীল বা অশ্বললিত ছন্দের গণবিন্যাসটি নিম্নোক্ত

উদাহরণ-সহযোগে দেখান হয়েছে। কল্লিনাথও এই উদাহরণটি তাঁর টীকায় উদ্ধৃত করছেন তবে গণবিন্যাসটি বিশেষভাবে দেখিয়ে দেন নি।

ন জ ভ জ ভ জ ভ ন গ

পবন—বিধৃত—বীচিচ—পলংবি—লোকয়—তিজীবি—তংতনু—ভৃ—তাঃ।

।।।, ।s।, s।।, ।s।, s।।, ।s।, s।।, ।, s

বহুরপি হীয়মানমনিশং জরাবনিতয়া বশীকৃতমিদম্॥

সপদিনিপীড়নব্যতিকরং যমাদিব নরাধিপান্নরপশোঃ।

পরবনিতামবেক্ষ্য কুরুতে তথাপি হতবুদ্ধিরশ্বললিতম্॥

(বৃত্তরত্নকর—কাশীসংস্কৃত সিরিজ)

পূর্বে যেমন আর্যার ক্ষেত্রে পূর্বার্ধ, উত্তরার্ধ ভেদে—চারিটি প্রকারভেদ হয়েছে এক্ষেত্রেও সেরকম হতে পারে। আর্যা, হয়লীল ছন্দ অথবা গদ্যের পূর্বভাগটি উদ্‌গ্রাহরূপে পরিকল্পনীয়। উত্তরার্ধটি ধ্রুব বা আভোগ রূপে কল্পনীয়। কল্লিনাথ বলছেন আভোগ নির্দিষ্ট না থাকলেও গাতৃ-নেতৃ নামাঙ্কিত পদে আভোগ রচনা করতে হবে। এটি ত্রিধাতুযুক্ত এবং ছন্দতাল নিয়মহেতু নির্যুক্ত প্রবন্ধ। কখনো কখনো স্বরপদবিরুদতালবদ্ধ হওয়াতে এটি চতুরঙ্গ দীপনী জাতীয় হয়। কোথাও পদ এবং তাল দ্বারা বদ্ধ হওয়াতে দ্ব্যঙ্গ তারাবলীজাতীয় বলেও গণ্য হয়ে থাকে।

গজলীলা নামক প্রবন্ধ গজলীল তালে গাওয়া হয়। গজলীল তালের লক্ষণ—গজলীলো বিরামান্তমুক্তং লঘু চতুষ্টয়ম্ (।।।।)। এই গীতরূপটিও হয়লীলার মত আর্যাবৃত্তকে আশ্রয় করে রূপায়িত হয়। তফাত এই যে আর্যায় হয়লীল তালযুক্ত হলে সেটি হয় হয়লীলা। এক্ষেত্রে হয়লীল তালের পরিবর্তে গজলীল তাল প্রযুক্ত হয়। গদ্যজ এবং পদ্যজ ভেদে অপরাপর লক্ষণগুলি এক্ষেত্রেও হয়লীলা প্রবন্ধের মত। কল্লিনাথ পদ্যজ গজলীল-গীতসম্পর্কে আর্যাবৃত্তিকে আশ্রয় করবার কথা বলেছেন কিন্তু হয়লীলার ক্ষেত্রে যেমন অশ্বললিত ছন্দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এক্ষেত্রে সেরূপ কোন ছন্দের উল্লেখ করেন নি। বস্তুত গজলীল বলে কোন ছন্দও পাওয়া যায় না তবে 'ঋষভগজবিলসিত' নামক একটি ষোড়শাক্ষরা বৃত্তির ছন্দ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এটি কেবলমাত্র গজবিলসিত নামে পরিচিত। গজলীল প্রবন্ধের সঙ্গে এই ছন্দের কোন যোগ ছিল কিনা

কল্লিনাথ সে কথা বলেন নি। কল্লিনাথ ছন্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি যখন এবিষয়ে কিছু বলেন নি তখন এযুগে আমরা প্রকৃত ছন্দনির্ণয়ে অপারগ। যাঁরা গজবিলাস ছন্দ সম্বন্ধে কৌতূহলী তাঁরা কাশী সংস্কৃত সিরিজের 'বৃত্ত-রত্নাকর' গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় ৯১ নং সূত্রে এবং তদায় পদটীকা অথবা 'ছন্দো-মঞ্জরী' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

এর পর 'দ্বি'দী' প্রবন্ধ। এটি চতুর্বিধ—শুদ্ধা, খণ্ডা, মাত্রা এবং সম্পূর্ণা। দ্বিপদী করুণ নামক তালে বিরচিত হয়। করুণতালের লক্ষণ—"গুরুণা করুণো মতঃ" অর্থাৎ, এই তালটি গুরুমাত্রাবিশিষ্ট (s)। এই প্রবন্ধের পাদে প্রথমে একটি ছ-গণ (sss) তারপরে পাঁচটি ভ-গণ (s||) এবং শেষে একটি গুরুবর্ণ থাকে। দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ গণ হিসাবে জ-গণ-এরও প্রয়োগ হয়ে থাকে। সিংহভূপাল এই গণগুলিকে এইভাবে সাজিয়েছেন—পূর্বে ছ-গণ, তারপরে জ-গণ, অতঃপর পাঁচটি ভ-গণ, পুনরায় জ-গণ, অন্তে গুরু। এই রকম চারটি পাদবিশিষ্ট দ্বিপদীকে শুদ্ধা দ্বিপদী প্রবন্ধ বলা হয়। কারো মতে এই পাদগুলির অর্ধান্তে অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অবসানে স্বরের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

শার্ঙ্গদেব বলছেন—"খণ্ডা স্যাৎ শুদ্ধয়া অর্ধয়া"; অর্থাৎ, দ্বিপদীর শুদ্ধ অর্ধভাগ দ্বারা খণ্ডা নামক দ্বিপদী রচিত হয়। কল্লিনাথ এর অর্থ করেছেন—দ্বিপদী প্রবন্ধের চারটি পাদের মধ্যে প্রথম পাদদ্বয় নিয়তলক্ষণযুক্ত এবং উত্তর-পাদদ্বয় অনিয়তলক্ষণ হলে সেটি হবে খণ্ডা নামক দ্বিপদী প্রবন্ধ। সিংহভূপাল বলছেন খণ্ডা-দ্বিপদী কেবলমাত্র দুটি পাদদ্বারা বিরচিত হবে।

প্রতিপাদের ষষ্ঠগণের অর্থাৎ জ-গণের স্থলে একটি গুরু মাত্রা প্রযুক্ত হলে সেটি হবে মাত্রা নামক দ্বিপদী।

শুদ্ধা দ্বিপদীর প্রতিপাদের অন্তে একটি করে অধিক গুরুবর্ণের প্রয়োগ হলে সেটি হবে সম্পূর্ণজাতীয় দ্বিপদী।

পুনরায় দ্বিপদীর চারটি ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে মানবী, চন্দ্রিকা, ধৃতি এবং তারা।

মানবী—ষণ্মাত্রিক অর্থাৎ ছ-গণ এবং দুটি ত-গণ দ্বারা অঙ্ঘ্রি অর্থাৎ প্রবন্ধের পূর্বভাগ প্রস্তুত হলে তাকে বলা হয় মানবী। কল্লিনাথ বলছেন এখানে ত-গণ বলতে মাত্রাগণ (s|) বোঝাচ্ছে না, বর্ণগণ (ss|) বোঝাচ্ছে।

চন্দ্রিকা—দুটি পঞ্চমাত্রিক প-গণ (ss|), একটি ত-গণ (এটি বর্ণগণ ss|), অন্তে একটি লঘু এবং একটি গুরু থাকলে সেটি হবে চন্দ্রিকা নামক দ্বিপদী।

ধৃতি—একটি ছ গণ (sss) এবং তিনটি চতুর্মাত্রিকগণ থাকলে সেটি হবে ধৃতি নামক দ্বিপদী। কল্লিনাথ বলছেন যে এই চতুর্মাত্রিকটি হবে বর্ণগণ, অর্থাৎ, ভ-গণ (s||) অথবা জ-গণ (|s|) হতে পারে।

তারা—একটি ছ-গণ (sss) চারটি য-গণ (বর্ণগণ—|ss) এবং অন্তিমে একটি গুরু থাকলে সেটি হবে তারা নামক দ্বিপদী।

কল্লিনাথ বলছেন—"এতাসাং পাদচতুষ্টয়যুক্তত্বে অপি একৈক অর্ধস্য পাদত্ববিবক্ষয়া দ্বিপদীব্যপদেশো দ্রষ্টব্যঃ।" এই উক্তি থেকে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে দ্বিপদী প্রবন্ধ পাদচতুষ্টয় সম্পন্ন হলেও আসলে এর প্রথম অর্ধাংশই হচ্ছে একটি পাদ এবং উত্তরাংশ আর একটি পাদ—এইভাবে দ্বিপদী নামের সার্থকতা বজায় আছে। এই প্রথমার্ধটি হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। পৃথক পদ রচনা করে গাতা এবং নেতার নামে আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। দ্বিপদী প্রবন্ধ ত্রিধাতুক। তাল এবং নিয়ম নির্দিষ্ট থাকাতে এটি দুই-অঙ্গযুক্ত তারাবলীজাতির অন্তর্ভুক্ত।

এর পর চক্রবাল প্রবন্ধ। একটি চরণের শেষের কয়েকটি বর্ণ যদি উত্তরোত্তর পরবর্তী চরণের গোড়ায় আসে এবং এইভাবে গানের পদগুলি রচিত হয় তাহলে তাকে বলে চক্রবাল। এটি গদ্য এবং পদ্যভেদে দুই প্রকার। এই পদ্ধতি আমাদের মাগধী, অর্ধ-মাগধী গীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কল্লিনাথ বলছেন এই গানের উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের আচরণ অবশ্য কর্তব্য। আভোগ সম্বন্ধে অবশ্য কোন বাঁধাবাধি নেই। এটি ত্রিধাতুক। তালাদি-নিয়ম-রক্ষিত হওয়াতে এটি নিযুক্ত প্রবন্ধ এবং পদ তাল-বদ্ধ হওয়াতে তারাবলী জাতীয়।

অতঃপর ক্রৌঞ্চপদ প্রবন্ধ। স্বর-পদ-গ্রথিত এই প্রবন্ধটি প্রতিতালে গীত হয়। প্রতিতালের লক্ষণ—"লৌদ্রুতৌ প্রতিতাল স্যাৎ" (||০০)। কল্লিনাথ বলছেন এই গানের উদ্‌গ্রাহ হবে স্বর এবং পদ হবে ধ্রুব। স্বর আচরণ-দ্বারা এই গানের সমাপ্তি হয়, অর্থাৎ প্রথমে স্বর, তারপরে ধ্রুব এবং শেষে আবার স্বর আবৃত্তি করা নিয়ম। এতদ্ব্যতীত ক্রৌঞ্চপদ, নামক ছন্দেও গানটি অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট ছন্দ অবলম্বন না করেও গানটি গাওয়ার বিধি আছে।

ক্রৌঞ্চপদা ছন্দের লক্ষণ হচ্ছে—"ক্রৌঞ্চপদা ভ্মৌসভৌ নৌ নৌ

গ ভূতেন্দ্রিয়বস্বৃষয়ঃ"। যার প্রতিপাদে ভ-গণ, ম-গণ, স গণ, ভ-গণ, চারটি ন গণ এবং একটি গুরু বর্ণ থাকে সেই ছন্দকে ক্রৌঞ্চপদা ছন্দ বলা হয়। এটি অতিকৃতিজাতীয় পঞ্চবিংশতি-অক্ষরা-বৃত্তি। এই ছন্দের পঞ্চম বর্ণে, পঞ্চম ও অষ্টম বর্ণে এবং তৎপর সপ্তম বর্ণে যতি থাকে। কল্লিনাথ এই ছন্দের যে সূত্রটি উদ্ধৃত করেছেন তার শেষাংশ ব্যাখ্যা করলে যতির এই নিয়মটি পাওয়া যায়। "ভূতেন্দ্রিয়বস্বৃষয়ঃ" এই কথাটি ভাঙলে দাঁড়ায়,—ভূত, ইন্দ্রিয়, বসু, ঋষি। ভূত অর্থে পঞ্চভূত বোঝায়—এক্ষেত্রে এটি পঞ্চম বর্ণ বোঝাচ্ছে। বসু অর্থে অষ্টবসু অর্থাৎ এক্ষেত্রে, অষ্টম বর্ণ বোঝাচ্ছে। ঋষি অর্থ সপ্তর্ষি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সপ্তম বর্ণ বোঝাচ্ছে এই ছন্দের উদাহরণ :—

ভ ম স ভ ন ন ন ন গ

যাকপি-লাক্ষীপি-ঙ্গলকে-শীকলি-রুচির-সুদিন-মসৃন-য়কঠি না

sll sss lls sll lll lll lll lll s

দীর্ঘতরাভিঃ স্থূলশিরাভিঃ পরিবৃতবপুরতিশয়কুটিল গতিঃ॥
আয়তজঙ্ঘা নিম্নকপোলা লঘুতরকুচযুগপরিচিতহৃদয়া।
সা পরিহার্যা ক্রৌঞ্চপদা স্ত্রী ধ্রুবমিহ নিরবধি সুখমভিলষতা॥

(এই শ্লোকটি বেনারস সংস্কৃত সিরিজের নাট্যশাস্ত্রে আছে)। ক্রৌঞ্চপদা ছন্দে গানটি গাইলে এর পূর্বভাগটি উদ্‌গ্রাহ করতে হবে। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক। তালনিয়ম রক্ষিত হওয়ায় এটি নির্যুক্ত প্রবন্ধ এবং স্বর-পদ তাল বদ্ধ হওয়াতে এটি ভাবনী জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর স্বরার্থ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র সা রে-গা-মা-পা-ধা-নি— এই স্বরাক্ষর-দ্বারা বাগ্‌গেয়কারের অভিষ্ট অর্থ ব্যক্ত হয়। এটি শুদ্ধ এবং মিশ্রভেদ দুই প্রকার কেবলমাত্র স্বরের (শুদ্ধঅথবা বিকৃত) প্রয়োগ হলে সেটি হবে শুদ্ধ। স্বর ভিন্ন অন্য অক্ষরের সঙ্গে মিশ্রিত হলে এটি হবে মিশ্রজাতীয় স্বরার্থ। গ্রহস্বরেই এই সঙ্গীতের সমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ গ্রহই হচ্ছে এর ন্যাস স্বর। একস্বর, দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুঃস্বর, পঞ্চস্বর, ষট্‌স্বর এবং সপ্তস্বর—এইভাবে স্বরের প্রয়োগ অনুসারে এটির আবার সাত রকম ভেদ হতে পারে। এ ছাড়া দ্বিস্বর থেকে সপ্তস্বর পর্যন্ত স্বরের বিপরীত সমাবেশ (অর্থাৎ উল্টোপাল্টা-ভাবে স্বর সাজিয়ে—যেমন, সারেগ, সাগারে, রেগাসা, ইত্যাদি। একে সঙ্গীতশাস্ত্রে 'ব্যত্যাস' বলে) অনুসারে সংখ্যাতীত ভেদ হতে পারে।

কল্লিনাথের মতে এই গীতে অন্ত পদে আভোগ রচিত হতে পারে। এটি ত্রিধাতুক, তালাদি নিয়মে নির্যুক্ত এবং পদ-তাল-বদ্ধ তারাবলীজাতীয় প্রবন্ধ।

এর পর ধ্বনিকুট্টনী। এই প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব অংশ ভিন্ন তালে গাওয়া হয়। মঠ এবং কঙ্কাল—এই দুটি তালের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই সঙ্গীতে প্রত্যেক পদবিরতি বা যতির মধ্যে মাত্রাসংখ্যা সমান থাকে, অর্থাৎ সমসংখ্যক মাত্রার পর এক একটি করে বিরতি হয়। শার্ঙ্গদেবের মতে এটি মেলাপকবর্জিত। কল্লিনাথের মতে মেলাপক এই প্রবন্ধের নিত্য অংশ নয়, —এর ব্যবহার বৈকল্পিক। এই প্রবন্ধ ঢেঙ্কী প্রবন্ধের ন্যায় তালদ্বয় অবলম্বনে গীত হয়, অর্থাৎ ঢেঙ্কী প্রবন্ধ যেমন ভিন্ন লয়ে এবং ভিন্ন তালে গাওয়া হয় তেমন ধ্বনিকুট্টনী প্রবন্ধও ভিন্ন লয় এবং ভিন্ন তাল অবলম্বনে গাওয়া হয়। যাতে এই প্রবন্ধ ঢেঙ্কীর সঙ্গে এক হয়ে না যায় এই কারণে এতে কঙ্কাল তালের প্রয়োগ নিষেধ করা হয়েছে, কেননা ঢেঙ্কীতে প্রধানতঃ কঙ্কাল তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিংহভূপাল বলছেন ধ্বনিকুট্টনী প্রবন্ধে মেলাপক অংশটি প্রয়োগাত্মক অর্থাৎ অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি-দ্বারা এই অংশটি সম্পাদিত হয়। ঢেঙ্কী প্রবন্ধেও মেলাপকের আচরণ বৈকল্পিক এবং এটি প্রয়োগাত্মক। উক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে ধ্বনিকুট্টনীর সাদৃশ্য থাকাতে মেলাপক সম্বন্ধে এই রকম অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে।

কল্লিনাথ বলছেন এটি ত্রিধাতুক, পদ-তাল-বদ্ধ তারাবলীজাতীয় নিযুক্ত প্রবন্ধ।

এর পর আর্যা প্রবন্ধ। এই গীতরূপটি আর্যাছন্দ অবলম্বনে রূপায়িত হয়। প্রথমার্ধের শেষে অথবা চরণান্তে সা রে-গা-মা প্রভৃতি স্বরাচরণ করা হয় এবং এই আদিম-অর্ধ দু বার গাওয়া হয়। দ্বিতীয় অর্ধ একবার গাওয়া হয়। এই প্রথমার্ধটি উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয়ার্ধটি ধ্রুব। গাতা এবং নেতার নামসহ একটি আভোগ রচনা করাও কর্তব্য। উদ্‌গ্রাহ অংশের পুনরাবৃত্তি করে গানটি শেষ করা হয়।

আর্যাপ্রবন্ধের অনেক প্রকারভেদ আছে ; কিন্তু তার আগে আর্যাছন্দ-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ছন্দ হিসাবে আর্যা জাতির অন্তর্গত। আর্যা প্রভৃতি জাতিতে যে গণ প্রযুক্ত হয় সেটি চতুর্মাত্রিক। উদাহরণ-সহযোগে

বোঝা যাক। কালী—এইটি সর্বগুরু। কমলা—এইটি অন্তগুরু। গণেশ—এটি মধ্যগুরু। শঙ্কর—এইটি আদিগুরু। গণপতি—এটি সর্বলঘু। (বিদ্যানিধি-সম্পাদিত "ছন্দোমঞ্জরী" দ্রষ্টব্য)।

বৃত্তরত্নাকরে আর্যার লক্ষণ :—

লক্ষ্মৈতৎসপ্ত গণা গোপেতা ভবতি নেহ বিষমে জঃ॥
ষষ্ঠেহয়ং নলঘু বা প্রথমেহর্ধে নিযতমার্যায়াঃ॥ (১)
ষষ্ঠে দ্বিতীয়লাৎপরকে ন্লে মুখলাচ্চ সযতিপদানিয়মঃ॥
চরমেহর্ধে পঞ্চমকে তস্মাদিহ ভবতি ষষ্ঠো লঃ॥ (২)

আর্যার প্রথমার্ধে সাতটি গণ থাকে এবং অন্তে একটি গুরুবর্ণ থাকে। এই প্রথমার্ধের বিষমগণগুলি অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম গণগুলিতে জ-গণের (মধ্যগুরুগণের) প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ষষ্ঠ গণটি জ গণযুক্ত হবে অথবা ন-লঘু অর্থাৎ চতুর্লঘুও হতে পারে। ষষ্ঠগণে যদি ন-ল অর্থাৎ চতুর্লঘু থাকে তাহলে প্রথম লঘুতেই যতি বা বিরতির নিয়ম নির্দিষ্ট হয়েছে। সপ্তমগণে চতুর্লঘু সন্নিবেশিত হলে প্রথম লঘুবর্ণের পূর্বে যতি পড়বে অর্থাৎ ষষ্ঠগণের পরেই যতি প্রযুক্ত হবে। আর্যাছন্দের শেষার্ধে যে ষষ্ঠগণ প্রযুক্ত হয় তাতে মাত্র একটি লঘুবর্ণ থাকে। অপরাপর লক্ষণ প্রথমার্ধের ন্যায়। এই শেষার্ধের পঞ্চমগণটি চতুর্লঘু হলে উক্ত গণের পূর্বে অর্থাৎ চতুর্থগণের শেষে যতিপাত হবে।

জ-গণ-ষষ্ঠ আর্যার উদাহরণ :—

প্রথমার্ধ—

কৃষ্ণঃ | শিশুঃ স্থ | তো মে | বল্লব | কুলটা | ভিরাহ্ব | তো ন গৃ | হে |
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
(জ-গণ)

শেষার্ধ—

ক্ষণমপি | বসত্য | সাবিতি | জগাদ | গোষ্ঠ্যাং | য | শোদা | যা॥
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
একলঘু

ন-লঘু ষষ্ঠগণসম্পন্ন আর্যার উদাহরণ :—

বৃন্দা | বনেস | লীলং | বল্গু | ক্রমকা | গু নিহিত | তন্নয | ষ্টিঃ |
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
(চতুর্লঘু)

স্মেরম্ | থাপিত | বেণুঃ | কৃষ্ণো | যদি মন | সি | কঃ স্ব | র্গঃ ॥
১ ২ ৭ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

(বিদ্যানিধি---ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের লক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় চরণে ষষ্ঠগণের একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে এবং এটিই আর্যার প্রধান লক্ষণ। আর্যার প্রকারভেদ এই গণটির কোন বিকার ঘটবে না।

আর্যাছন্দে প্রতি চরণে সাতটি গণ রয়েছে—আর আছে একটি গুরুবর্ণ। এর মধ্যে ষষ্ঠগণকে বিভিন্ন প্রকার ভেদেও অপরিবর্তিত রাখতে হবে। অতএব যদি প্রকারভেদ করতে হয় তাহলে ষষ্ঠগণটিকে বাদ দিয়ে অপরগণের পরিবর্তন করতে হয়। সাতটি গণের মধ্যে ষষ্ঠগণকে বাইবে রাখলে প্রতিচরণে বাকি ছ'টি গণ থাকে। দুটি চরণ মিলিয়ে প্রকারভেদ-পরিকল্পনায় বারোটি গণ পাওয়া যাচ্ছে। এক-একটি গণ যদি গুরুদ্বয় সংখ্যাদ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহলে বারোটি গণে চব্বিশটি গুরু পাওয়া যাবে। এই চব্বিশটির সঙ্গে অন্তস্থিত আরো দুটি গুরু (যে দুটি গুরবর্ণ সপ্তম গণেব পরে থাকে) যোগ করলে সবসুদ্ধ হল ছাব্বিশটি গুরু। ষষ্ঠগণকে অক্ষুন্ন রেখে এই যে ছাব্বিশটি গুরুসহযোগে প্রকারভেদ হল,—এই আযাপ্রবন্ধের নাম লক্ষ্মী। সর্বগুরু থেকে একটি একটি করে গুরুভঙ্গদ্বারা মাত্রাসংখ্যাব বৃদ্ধি হিসাবে আযার পঁচিশটি প্রকারভেদ পরিকল্পিত হয়েছে। "গুরুভঙ্গ"—এই শব্দটির মানে একটি গুরুকে দুটি লঘুতে ভেঙে ফেলা। এইভাবে ভাঙলেই সংখ্যার বৃদ্ধি হবে। কল্লিনাথ বিশেষভাবে বলেছেন যে এই গুরুভঙ্গ অনিয়তভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে করলে হবে না; এই ব্যাপারটি প্রথম গণ থেকে ক্রমে ক্রমে করা কর্তব্য। শার্ঙ্গদেবও বলছেন—"একাদি গুরুভঙ্গেণ ক্রমাল্লক্ষ্ম্যাণ্যমুনি তু", এতেও বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে ক্রমিক রীতিতে প্রথম গণ থেকে আরম্ভ করে গুরুভঙ্গের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। এইভাবে এক একটি গুরুভঙ্গের ফলে আর্যার যে ভেদগুলি হয় সেগুলির নাম হচ্ছে—বৃদ্ধি, বুদ্ধি, লীলা, লজ্জা, ক্ষমা, দীর্ঘা, গৌবী, বাজী, জ্যোৎস্না, ছায়া, কান্তিকা, মহী, মতি, কীর্তি, মনোরমা, রোহিণী, বিশালা, বসুধা, শিবা, হরিণী, চক্র, সারসী, কুররী, হংসী, বধূ।

এর পরে গাথাপ্রবন্ধ। আর্যাপ্রবন্ধ সংস্কৃতভাষা অবলম্বনে গাওয়া নিয়ম কিন্তু গাথা প্রাকৃতপদ অবলম্বনে গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধের অপরাপর

নিয়ম আর্যারই মত। এই প্রবন্ধেও চরণের ন্যূনাধিক্য ঘটে। শার্ঙ্গদেব বলছেন এটি পঞ্চচরণযুক্ত হয় অথবা মতান্তরে ত্রিপদী ষট্পদীও হতে পারে। বৃত্তরত্নাকর বলছেন—"গাথা স্ত্রিভিঃ ষড়ভিশ্চরণৈশ্চোপলক্ষিতাঃ (বৃঃ রঃ ১-১৮)। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে :—

বিষমাক্ষরপাদং বা পাদৈরসমং দশধর্মবৎ ॥

যচ্ছন্দো নোক্তমত্র গাথেতি তৎসূরিভিঃ প্রোক্তম্ ॥

(বৃঃ রঃ-৫-১২)

উক্ত গ্রন্থের টীকাকার নারায়ণ ভট্ট সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত গাথাছন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন (বৃঃ রঃ, কাশী সংস্করণ, ১২৩-.২৯)। নারাযণ ভট্ট গাথাছন্দেরও গুরুভঙ্গদ্বারা সাতাশটি প্রকার-ভেদের উল্লেখ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলছেন,—যদি সাতাশটি গুরু এবং তিনটি লঘু থাকে তাহলে সেই গাথার নাম লক্ষ্মী। ছাব্বিশটি গুরু এবং পাঁচটি লঘুসমন্বিত গাথার নাম—ঋদ্ধি। এইভাবে একটি গুরু এবং পঞ্চান্নটি লঘু পর্যন্ত একটি একটি গুরু হ্রাস করে এবং দুটি লঘু বৃদ্ধি কবে—ত্রিংশৎ-অক্ষর থেকে আরম্ভ করে ষট্পঞ্চাশৎ—অক্ষরভেদ পর্যন্ত সাতাশটি ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে। ক্রম অনুসারে এইগুলির নাম তিনি দিয়েছেন—লক্ষ্মী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, ক্ষমা, গৌরী দেহী, রাত্রি, পূর্ণা, ছায়া, কান্তি, মহামায়া, কীর্তি, সিদ্ধা, মানী, রামা, গাহিনী, বিশ্বা, বাসিতা, শোভা, হরিণী, চক্রী, সারসী, কুববী, সিংহী, হংসী।

সিংহভূপাল 'পঞ্চচবণ'-এর স্থলে "পঞ্চগগণ" পাঠ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয। এটির কিন্তু অন্যত্র কোথাও সমর্থন পাওয়া যায় না।

কল্লিনাথ বা সিংহভূপাল প্রবন্ধাদির ছন্দনিরূপণে বৃত্তরত্নাকর থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করলেও এইসব প্রবন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ কেন এড়িয়ে গেছেন বোঝা গেল না।

এব পর দ্বিপথপ্রবন্ধ। এটি দ্বিপথছন্দ অবলম্বনে গাওয়া হয। এই প্রবন্ধের সমাপ্তিকালে স্বরাচরণ বিধেয়। শার্ঙ্গদেব একে বলেছেন "স্বরমুক্তিকঃ"। দ্বিপথপ্রবন্ধ তালহীন অথবা সতাল দুরকমই হতে পারে। এই প্রবন্ধ চতুর্বিধ। একটি স্বরদ্বারা উপনিবদ্ধ, অপরটি প্রযোগ অর্থাৎ গমকালপ্তিদ্বারা রচিত; কেউ কেউ এই প্রবন্ধকে স্বর এবং প্রয়োগ উভয় দ্বারা নিবদ্ধ করেন, কেউ বা স্বর এবং প্রয়োগ কোনটিই ব্যবহার করেন না।

যখন প্রাকৃত ভাষায় গান করা হয় তখন এই দ্বিপথকে "দোহ" বলা হয়। সংস্কৃতে এটি দ্বিপথ বা দোধক নামে পরিচিত। দোধকছন্দের লক্ষণ— "দোধকৌ ভৌ ভগৌ গিতি" অর্থাৎ এই ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে তিনটি ভ গণ এবং দুটি গুরু থাকে। এর বিন্যাস :—

ভ ভ ভ গ গ

দোধক—মার্থবি—রোধক—মু—গ্রং।

s।। s।। s।। s s

স্ত্রীচপলং যুধি কাতর চিত্তম্॥

স্বার্থপরং মতিহীনমমাত্যং।

মুঞ্চতি যো নৃপতিঃ স সুখী স্যাৎ॥

কল্লিনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে সুবিধামত এই গানে আভোগের আচরণও করা যায়। দ্বিপথপ্রবন্ধ-সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে এটি স্বরমুক্তিক অথচ দুটি প্রকারভেদে অর্থাৎ প্রয়োগ রচিত এবং স্বর-প্রয়োগহীন দ্বিপথ-প্রবন্ধে স্বরের ব্যবহার অস্বীকার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কল্লিনাথের মতে গানটি উদ্‌গ্রাহে সমাপ্ত হবে।

দ্বিপথপ্রবন্ধের আরো ন'টি ভেদ আছে—সারসী, ভ্রমরী, হংস, কুবর, চন্দ্রলেখক, কুঞ্জর, তিলক, হংসক্রীড এবং ময়ূরক।

যখন অযুক্ত পদে অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় চরণে ত্রয়োদশ মাত্রা এবং সম অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে দ্বাদশ মাত্রা থাকে তখন সেটি হয় সারস পর্যায়ের দ্বিপথপ্রবন্ধ। কল্লিনাথ এইখানে বিশেষভাবে বলেছেন যে ছন্দোগতভাবে বিচার করলে 'মাত্রা' শব্দে একটি লঘু অক্ষব বোঝাবে ; তালগতভাবে বিচার করলে একটি মাত্রায় "ক-চ-ত-ট-প" এই পাঁচটি লঘু অক্ষরের উচ্চারণকাল বোঝাবে। এখানে শার্ঙ্গদের মাত্রাবিভাগ ছন্দ বা তাল কোন্ দিক থেকে প্রযুক্ত হবে এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি বলে কল্লিনাথ এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।

ওজে বা বিষমচরণদ্বয়ে চতুর্দশ মাত্রা (এটি শার্ঙ্গদেব 'মনবঃ'—এই শব্দে বুঝিয়েছেন। 'মনু' শব্দে চতুর্দশ মনু বোঝায়) এবং সমচরণদ্বয়ে দ্বাদশ মাত্রা (এটি শার্ঙ্গদেব "রবয়ঃ"—এই শব্দে বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ এটি দ্বাদশ রবি এই এই অর্থে দ্বাদশ সংখ্যা বোঝায়।) থাকলে সেটি হবে ভ্রমর নামক দ্বিপথ-প্রবন্ধ।

বিষমে পঞ্চদশ মাত্রা এবং সমে ত্রয়োদশ হলে সেটি হবে হংস।

বিষমে ত্রয়োদশ মাত্রা এবং সমে চতুর্দশ মাত্রা হলে সেটি হবে কুরর।

বিষমে পঞ্চদশ মাত্রা এবং সমে দ্বাদশ মাত্রা হলে সেটি হবে চন্দ্রলেখ।

বিষমে ত্রয়োদশ মাত্রা এবং সমে পঞ্চদশ (এটিকে শার্ঙ্গদেব 'তিথি'—এই শব্দে বুঝিয়েছেন। তিথি বলতে পঞ্চদশ দিবস বোঝায় এই অর্থে এটি পঞ্চদশ সংখ্যা নির্দেশ করছে।) মাত্রা হলে সেটি হবে কুঞ্জর।

বিষমে পঞ্চদশ মাত্রা এবং সমে চতুর্দশ মাত্রা হলে সেটি হবে তিলক।

বিষমে ত্রয়োদশ মাত্রা এবং সমে ষোড়শ মাত্রা হলে সেটি হবে হংসক্রীড় (এই ষোড়শ সংখ্যাটি শার্ঙ্গদেব 'কলা'—এই শব্দে বুঝিয়েছেন; অর্থাৎ 'কলা' বললে ষোলকলা এই অর্থে ষোড়শ সংখ্যা বোঝায়।)

ময়ূর নামক দ্বিপথপ্রবন্ধের যে পরিচয় শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন তার যথার্থ-রূপটি বোঝা শক্ত। তিনি বলেছেন যে পূর্বে যে সব দ্বিপথপ্রবন্ধাদি উল্লিখিত হয়েছে, যদি তাদের মধ্যভাগে বা অন্তে পঞ্চ, ষট্ বা সপ্ত লঘুদ্বারা শিখা রচনা করা হয় তাহলে সেই প্রবন্ধকে শিখাদ্বিপথ বা ময়ূরদ্বিপথ বলা হয়। রত্নাকরের উক্তি এইরকম:—

যন্মেষামধ্যয়োরন্তে পঞ্চাদিলঘুভিঃ শিখা॥ ২৩৯

তং শিখাদ্বিপথং প্রাহুর্ময়ূরমপি সূরয়ঃ।

(সঙ্গীতরত্নাকর—অ্যাডায়ার সংস্করণ)

উক্ত শ্লোকের "পঞ্চাদিলঘুভিঃ শিখা" অর্থে কল্লিনাথ বলছেন, "আদি শব্দো ষট্‌সপ্তাদয়ো গৃহ্যন্তে" এবং সিংহভূপাল বলছেন—"পঞ্চলঘুনির্মিতা ষডাদিলঘু-নির্মিতা বা শিখা ক্রিয়তে।" সুতরাং পঞ্চ, ষষ্ঠ এবং সপ্তলঘু পর্যন্ত ধরে নেওয়াই সঙ্গত। ইতিপূর্বে এলার আলোচনায় (পৃ ১৮০) বলা হয়েছে গণ-বিপর্যয়ের দরুণ ন্যূনাধিক্য ঘটলে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অধিক পদযোজনা করলে তাকে বলে শিখাপদ।

এই গানে 'শিখা' বলতে কি বোঝায় সেটি কেহই বুঝিয়ে বলেন নি 'শিখা' নামক একটি ছন্দের অস্তিত্ব আছে। এই ছন্দের অনুরূপ পদ উক্ত দ্বিপথ প্রবন্ধের মধ্যভাগে বা অন্তে প্রয়োগ করে শিখাদ্বিপথ-প্রবন্ধ রচনা করা হত এই অনুমান অসঙ্গত নয়। বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার নারায়ণভট্ট পঞ্চম অধ্যায়ের টীকায় এই শিখা ছন্দের পরিচয় উপলক্ষ্যে বলছেন,—যদি প্রথমার্ধে ছয়টি চতুর্লঘু এবং দ্বিতীয়ার্ধে সাতটি চতুর্লঘু থাকে, উভয় অর্ধের অন্তে একটি

জ-গণ থাকে তাহলে সেই ছন্দকে শিখা বলা হয়। এর উদাহরণ তিনি দিয়েছেন :—

ফুলিঅ মহু ভমর বহু রঅণি
পহু কিরণবহু অবঅরু বসন্ত ॥
মলঅগিরিকুসুমধরি পবণ বহ
সহব কহ সহি ভণ ণিলঅ ণহু কন্ত ॥

চতুর্লঘুর বিন্যাস এইরকম :—

প্রথমর্ধে ফুলি অ ম | হু ভ ম র | ব হু র অ | ণি প হু কি | র ণ ব হু |
১ ২ ৩ ৪ ৫
অ ব অ রু | ব স ন্ত ॥
৬ | ऽ |
জ গণ

দ্বিতীয়ার্ধে—ম ল অ গি | রি কু সু ম | ধ রি প ব | ণ ব হ স | হ ব ক হ |
১ ২ ৩ ৪ ৫
স হি ভ ণ | ণি ল অ ণ | হু ক ন্ত ॥
৬ ৭ | ऽ |
জ-গণ

এই সব দ্বিপথপ্রবন্ধে চরণস্থিতির ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ সমচরণের লক্ষণগুলি বিষমচরণে বর্তিত হয় এবং বিষমের লক্ষণ সমপদে প্রযুক্ত হয়।

দ্বিপথপ্রবন্ধের প্রথম পদের একবার আবৃত্তি এবং অপর পদগুলির দ্বিরাবৃত্তি অথবা প্রথমের দ্বিরাবৃত্তি এবং অপর অংশের একবার আবৃত্তি—এইভাবেও অনেক ভেদ হতে পারে।

মেলাপকের অভাবে দ্বিপথপ্রবন্ধ ত্রিধাতুক। ছন্দমাত্রাযুক্ত এবং পদ-তালবদ্ধ হওয়াতে এটি নির্যুক্ত এবং তারাবলীজাতীয় প্রবন্ধ।

এই দ্বিপথপ্রবন্ধই আমাদের হিন্দী দোহাগানের আদিরূপ বলে মনে হয়। এই দিক থেকে একটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অতঃপর কলহংস-প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ কলহংস নামক ছন্দে রচিত। কল্লিনাথ জগতী অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর পর্যায়ের হংস নামক ছন্দ উদ্ধৃত করে এটিকেই কলহংস বলেছেন। তাঁর উক্তি—কলহংসস্য ছন্দসো লক্ষণং ভারতীয়ে জগত্যাং নকুটভেদেষু মুনিনোক্তম্। যথা –

দ্বিতীয়সপ্তমান্ত্যং চতুর্থং যদা
গুরুযদা চ ষষ্ঠো দশমোঽপি বা
অথোদিতা হি পাদে স্বথ জাগতে
ভবেদিদং তু হংসাখ্যামিতি স্মৃতম্ ॥

দ্বাদশাক্ষর চরণে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, দ্বাদশ অক্ষর যদি গুরু হয় তাহলে তাকে বলা হয় হংস। কল্লিনাথ স্পষ্ট বলেছেন—হংসাখ্যমেব কলহংসম্। কাশী সংস্কৃত সিরিজের নাট্যশাস্ত্রের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে আটটি নৎকুটের মধ্যে উক্ত হংস ছন্দকে "হংসাস্য" বলা হয়েছে। কল্লিনাথ যে পাঠটি গ্রহণ করেছেন সেটিই শুদ্ধ বলে মনে হয়। ছন্দোমঞ্জরী অনুসারে কলহংস অতিজগতী পর্যায়ের অন্তভুক্ত। এই গ্রন্থোক্ত লক্ষণে বলা হয়েছে যে ছন্দের প্রতিপাদে একটি স, একটি জ, তারপরে দুটি স এবং অন্তে একটি গুরুবর্ণ থাকে তার নাম কলহংস।

এই প্রবন্ধে প্রতি পাদের শেষে স্বর প্রযুক্ত হয় এবং স্বরানুষ্ঠানেই এই গীতের সমাপ্তি ঘটে। এতে ঝম্পাতাল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ঝম্পাতালের লক্ষণ বিরামান্তং দ্রুতদ্বন্দ্বং লঘুস্তথা (̓০ ̓০ ।)। বিরামযুক্ত দুটি দ্রুত এবং একটি লঘু নিয়ে ঝম্পাতাল গঠিত হয়েছে। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে দ্রুত বা অর্ধ মাত্রার পরে যে বিরাম সেটি এই দ্রুতেরও অর্ধেক হবে। সাধারণতঃ ক, চ, ত, ট, প—এই পাঁচটি লঘু অক্ষব মিলিয়ে একটি মাত্রা হয়। ক, চ, ত, ট—এই চারিটি অক্ষর মিলিয়েও একটি মাত্রার পরিকল্পনা করা যায়। শেষেরটি যদি ধরা যায় তাহলে ক, চ, এই দুই অক্ষরের আবৃত্তিতে যতটুকু সময় ততটুকু হবে অর্ধমাত্রা অর্থাৎ দ্রুত এবং এই সময়টুকুব পরে এরও অর্ধেক অর্থাৎ কেবলমাত্র 'ক' বলতে যতটুকু সময় ততটুকুই বিরাম বলে নির্দিষ্ট হবে।

কলহংস-প্রবন্ধ দুই প্রকার—বর্ণজ এবং মাত্রিক। কল্লিনাথ বলছেন বর্ণজ কলহংস হচ্ছে বর্ণগণনির্মিত পদ্যরূপ এবং মাত্রিক হচ্ছে গদ্যরূপে রেচনা। এক্ষেত্রে গণগুলি অনিয়তভাবে প্রযুক্ত হয়। তবে, মাত্রাসংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই সমান হবে। সিংহভূপাল বলছেন মাত্রাগণ নির্মিত হলে সেটি হবে মাত্রিক প্রবন্ধ। শার্ঙ্গদেবের মতে গদ্যাত্মক হলে প্রতিপাদের পূর্বে স্বর প্রযুক্ত হবে এবং তারপরে পদ গাওয়া হবে। এই গদ্য প্রকৃতিটি কেমন হতে পারে সেটি উদাহরণ না পেলে বোঝা শক্ত। কলহংস-প্রবন্ধের প্রথমাংশ উদ্গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। পৃথকভাবে আভোগের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত, ভাবনী জাতীয় প্রবন্ধ।

এর পর তোটকপ্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি তোটকছন্দে রচিত। তোটক ছন্দ জগতীজাতীয় দ্বাদশাক্ষর বৃত্তের অন্তর্গত। এতে প্রতি পাদে ক্রমন্বয়ে চারটি করে স-গণ (। । s) থাকে। উদাহরণ—

স স স স

ত্যজতো—টকম—র্থবিয়ো—গকরং

। । s । । s । । s । । s

প্রমদাধিকৃতং ব্যসনোপহৃতম্।

উপধাভিরশুদ্ধমতিং সচিবং

নরনায়কভীরুকমায়ুধিকম্॥

তোটকপ্রবন্ধে প্রতি পাদের শেষে স্বর প্রযুক্ত হয়। তোটকের পূর্বাংশ উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। এটী ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ।

এরপর ঘটনামক প্রবন্ধ। পূর্বে দ্বিপদীনামক প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিপদীর অর্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করে ঘটপ্রবন্ধ প্রস্তুত হয়েছে। তেনক নামক অঙ্গটি আচরণপূর্বক এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা হয়। কল্লি-নাথ বিশেষভাবে বলেছেন যে দ্বিপদীর পূর্বার্ধ অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ অংশটুকুর সঙ্গেই তেনক যোজনা করতে হবে। দ্বিপদী প্রবন্ধের রীতি অনুযায়ী ঘটপ্রবন্ধেও অর্ধ অংশের পর স্বরানুষ্ঠান করা যেতে পারে।

অতঃপর বৃত্তনামক প্রবন্ধ। যে-কোন প্রকার ছন্দে শিল্পীর অভিলষিত তালে গীত প্রবন্ধ বৃত্ত নামে স্বীকৃত। ছন্দের পাদান্তে বা শেষে স্বর আচরণ করা কর্তব্য। মতান্তরে স্বরানুষ্ঠান ব্যতীতও বৃত্তপ্রবন্ধের অনুষ্ঠান হতে পারে। অপর মতানুসারে এই প্রবন্ধ বিশেষভাবে বৃত্তনামক ছন্দে রচনা করা কর্তব্য। এটি বিংশাক্ষর কৃতিজাতীয় ছন্দ। এর লক্ষণ—গ্লিতি বৃত্তম্; অর্থাৎ এতে প্রতিপাদে ক্রমান্বয়ে গুরু এবং লঘুবর্ণের সন্নিবেশ ঘটে। উদাহরণ—

গাত্রদুঃখকারি কর্ম নির্মিতং ভবত্যনর্থহেতুরত্র

তেন সর্বমাত্মতুল্যমীক্ষ্যমাণমুত্তমং সুখং ভজস্ব।

বিদ্ধি বুদ্ধিপূর্বকং মমোপদেশবাক্যমেতদাদরেণ

সাধুবৃত্তমুক্তকং মহাকুলপ্রসূতমেতি নো হি জন্ম॥

তোটকপ্রবন্ধের প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে যদি বৃত্ত—এই বিশেষ ছন্দটি অবলম্বন করে বৃত্তপ্রবন্ধ গাওয়া যায় তাহলে উক্ত প্রবন্ধে অপর কোন ছন্দ-রচিত প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা নেই; নতুবা তোটক প্রভৃতি প্রবন্ধ

প্রবন্ধাবলম্বনেও গাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ছন্দে রচিত বহু প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যেমন— কন্দ, তুরগলীন, ক্রৌঞ্চপদা, আর্যা, গাথা, দ্বিপথক, কলহংস প্রভৃতি। এই গুলিকে এক-একটি বিশেষ গীতের পর্যায়ে ধরা হয়েছে। বর্তমানে যে বৃত্তের পরিচয় দেওয়া গেল তাতে এই সব গীতের যে-কোন একটিকে উক্ত প্রবন্ধের অন্তর্গত করা যায় কেননা যে-কোন ছন্দকে আশ্রয় করেই বৃত্তপ্রবন্ধ গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বৃত্তপ্রবন্ধে উক্ত প্রবন্ধ-গুলির পুনরাবৃত্তি ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়। তবে, বৃত্তপ্রবন্ধে শিল্পীর যোগ্যতা অনুসারে এইসব গীতগুলিকে নতুনভাবে প্রতিফলিত করবার সুযোগ রয়েছে কেননা বিবিধ ছন্দের মিশ্রণ এবং নানারকম অলঙ্করণ যোজনা করে এক্ষেত্রে অনেকরকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব তদীয় ছন্দোবিচিতি নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন যে উক্ত গ্রন্থ থেকে বিবিধ ছন্দের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

এর পর মাতৃকাপ্রবন্ধ। মাতৃকাশব্দের অর্থ হল বর্ণমালা। ক্রমান্বয়ে প্রথমপদ অ-কার, দ্বিতীয় পদ আ-কার, তৃতীয় পদ ই-কার, চতুর্থ পদ ঈ-কার —এইভাবে একেবারে ক্ষ-কার পর্যন্ত পদ এই প্রবন্ধে রচনা করা হয়। এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ দিব্য অর্থাৎ সংস্কৃতভাষায় রচিত হয় অথবা মানুষী অর্থাৎ প্রাকৃত-ভাষা কিম্বা দিব্যমানুষী অর্থাৎ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত মিলিয়ে মিশ্রভাষাতেও রচিত হয়। এতে মার্গতাল এবং দেশীতাল উভয়েরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই মিশ্রণহেতু মাতৃকাপ্রবন্ধকে দিব্যামানুষী বলা হয়। মাতৃকাপ্রবন্ধ দুই প্রকার—গদ্যজা এবং পদ্যজা। অনিবদ্ধ এবং ছন্দহীন হলে সেটি হয় গদ্যজা; আর নিবদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ হলে সেটি হয় পদ্যজা। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে এই প্রবন্ধ 'সর্বমন্ত্রময়ী' এবং 'সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী'। এই প্রবন্ধ শুচিভাবে সাবধানতার সঙ্গে গাইতে হবে নইলে দোষ ঘটবে।

কল্লিনাথ বলছেন—মাতৃকাপ্রবন্ধে অ-কার থেকে ষোড়শ পদ পর্যন্ত হচ্ছে উদ্গ্রাহ। ক-কার থেকে পঞ্চত্রিংশ পদ ধ্রুব হিসাবে ধরতে হবে। আভোগ অংশ অনিয়তভাবে রচনা করা যেতে পারে। এতে গাতা এবং নেতার নাম যোজনা করা কর্তব্য। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং তারাবলী জাতীয়।

এরপর রাগকদম্বক নামক প্রবন্ধ। রাগকদম্বক দুই প্রকার—নন্দ্যাবর্ত এবং স্বস্তিক।

নন্দ্যাবর্ত শ্রেণীতে চার রকমের বৃত্ত (ছন্দ) এবং চার রকমের তাল ব্যবহৃত হয়। কল্লিনাথ বলছেন প্রতি বৃত্তই ভিন্ন তালে করা কর্তব্য। প্রতি পাদে, প্রতি অর্ধে বা প্রতি বৃত্তেও রাগভেদ করা কর্তব্য। তাল-মানযোগে এই গানের সমাপ্তি হয়। কেহ-বা উদ্‌গ্রাহ অংশের পুনরাবৃত্তি করে গান শেষ করেন। কেহ কেহ বিভিন্ন তালের পরিবর্তে একটি তালও ব্যবহার করে থাকেন। অপর মতে রাগকদম্বক-প্রবন্ধ গদ্যেও রচিত হতে পারে।

নন্দ্যাবর্ত দ্বিগুণিত হলে তাকে স্বস্তিক শ্রেণীর রাগকদম্বক বলা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আট রকমের বৃত্ত, আট রকমের তাল এবং আটটি রাগের ব্যবহার হবে। এই লক্ষণযুক্ত স্বস্তিককে অব্জপত্র বলা হয়। এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ষোড়শ প্রকার বৃত্ত, ষোড়শ প্রকার তাল এবং ষোড়শ প্রকার রাগের ব্যবহার হলে সেটি হবে অব্জগর্ভ। অব্জগর্ভের দ্বিগুণ হলে সেটি হবে ভ্রমর, অর্থাৎ এই শ্রেণীর রাগকদম্বকে বৃত্ত, তাল এবং রাগ প্রত্যেকটি হবে বত্রিশ রকমের। এরও দ্বিগুণ হলে অর্থাৎ বৃত্ত, তাল এবং রাগ—এদের বৈচিত্র্য চৌষট্টি রকমের হলে তাকে বলা হয় আম্রেড়িত। আম্রেড়িত শব্দের অর্থ পুনরুক্তি।

কল্লিনাথ বলছেন রাগকদম্বক কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব সহযোগে গঠিত অর্থাৎ এটি দ্বিধাতুক। শাস্ত্রকার এতে স্বর প্রভৃতি অঙ্গের বিশেষ কোন নিয়ম নির্দিষ্ট করেন নি। সুতরাং বাগ্‌গেয়কার আপন ইচ্ছানুসারে এই প্রবন্ধে অঙ্গাদি যোজনা করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে কল্লিনাথ সেকালকার প্রথিতযশা গীতশিল্পী গোপালনায়কের নাম উল্লেখ করে বলছেন যে তিনি "দ্বাত্রিংশ রাগ-তাল-যুক্ত গদ্যাত্মক ভ্রমর নামক স্বস্তিক শ্রেণীর রাগকদম্বক-প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করতেন। প্রথমে তিনি সিংহনন্দনতাল এবং মালবশ্রী-রাগ সহযোগে যে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের অনুষ্ঠান করতেন তাতে ষড়ঙ্গের মধ্যে কেবল পদ এবং তাল—এই দুটি অঙ্গ যোজিত হত। এই হিসাবে এক্ষেত্রে কেবল দ্ব্যঙ্গত্বই স্বীকৃত হয়েছে। তারপর দর্পণ তাল এবং বেলাবলী রাগযুক্ত অংশে পদেরই অস্তিত্ব থাকত না তখন এটি হত পঞ্চাঙ্গযুক্ত রাগকদম্বক। আবার ধনাসীরাগযুক্ত অংশে বিরুদের অপ্রয়োগহেতু সেটি পঞ্চাঙ্গ বলে স্বীকৃত হত। অপরাপর অংশ ষড়ঙ্গযুক্ত হয়েছে। এইরকম অনিয়তভাবে হলেও ষড়ঙ্গ যুক্ত হয়েছে বলে এটি মেদিনীজাতীয় প্রবন্ধ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ছন্দ-তাল প্রভৃতি নিয়ম প্রযুক্ত হওয়ায় এটি নির্যুক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে এই যে তালের বা ছন্দের বৈচিত্র্য থাকলেও এতে রাগের প্রাধান্যই মুখ্যতঃ স্বীকার করা হয়েছে, একে তালকদম্বক বলা হয় নি। নন্দ্যাবর্ত এবং স্বস্তিক শ্রেণীর প্রকারভেদ বর্ণনায় বৃত্ত এবং তাল সম্পর্কে চার থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাগের বেলায় শার্ঙ্গ দেব বলেছেন "রাগরাজিবিরাজিত" অর্থাৎ রাগের ব্যবহার অনিয়ত এবং আরও বেশি রাগের প্রয়োগ হতে পারে। নন্দ্যাবর্ত রাগকদম্বকের বর্ণনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রতি পাদে, প্রতি অর্ধে বা প্রতি বৃত্তেও রাগভেদ করা যেতে পারে, অতএব এতৎদ্বারাই 'রাগরাজি' শব্দটি সমর্থিত হচ্ছে। এই কারণেই রাগকদম্বক নামটিই সমীচীন, বৃত্তকদম্ব বা তালকদম্ব নয়।

মেবারের মহারাণা কুম্ভ জয়দেবের গীতগোবিন্দ-প্রবন্ধ নতুনভাবে রূপায়িত করেছিলেন এবং এই রূপায়ণে রাগকদম্বক গীতির বৈচিত্র্য প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভবিরচিত রসিকপ্রিয়াটীকায় এই সঙ্গীতের বর্ণনা আছে। এই সঙ্গীতের ঐতিহ্য 'রাগমালা' নামক গীতে এখনো বর্তমান আছে।

'এর পর পঞ্চতালেশ্বর-প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে প্রথমে রাগালাপ করা কর্তব্য। আলাপের পর পাঁচটি পদ (ভিন্নধাতুক) দু বার গাওয়া হবে। প্রথমে পদটি একবার গাইবার পর সেই মান অবলম্বন করে স্বর এবং পাট আচরণ করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় পদটিওসেইভাবেই স্বর,পাট আচরণপূর্বক গাইতে হবে। এইভাবে পাঁচটি পদ স্বর এবং পাট সহযোগে গাওয়া নিয়ম। এই অনুষ্ঠানাদির পর আবৃত্তিসহযোগ আর একবার পটহ বাদ্য চচ্চৎপুট তালে বাজাতে হবে। তারপর চাচপুট তালে পাঁচটি পদ পৃথক্‌ভাবে দু বার গাইতে হবে। আগের বৃত্ত অনুসারেই স্বর এবং পাট আচরণ করতে হবে। এইটি হয়ে গেলে আবৃত্তিসহযোগে হুড়ুক্ক বাদ্যে চাচপুট বাজাতে হবে। তারপর ষট্‌পিতা-পুত্রক তালে পূর্ববৎ পঞ্চপদের আচরণ করতে হবে এবং উক্ত মান অবলম্বন করে শঙ্খ বাজাতে হবে। এর পর পঞ্চপদের পরিবর্তে ষট্‌পদ যোজনা করতে হবে এবং পূর্বের স্বরপাট আচরণের রীতিতে এই পদগুলি সম্পক্কেষ্টক তালে দু বার গাইতে হবে। এইভাবে গাওয়া হলে কাংস্যবাদ্যে আবৃত্তিসহযোগে এই তালটি বাজাতে হবে। অতঃপর উদ্ঘট্টতালে আবার পূর্বপ্রকার ছটি পদ স্বর, পাট অবলম্বন করে গাইতে হবে এবং গানের পর মুরজে ওই তালটি

আবৃত্তিসহযোগে বাজাতে হবে। এইভাবে পদগুলি অবলম্বিত মানে আচরিত হবার পর উক্ত লয়েই আভোগের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই অংশটিঅমুক প্রবন্ধ এই ব্যক্তি গাইছেন—এইভাবে রচনা করতে হবে। অবশেষে মঙ্গলবাচক শব্দের প্রয়োগ হবে। এই সঙ্গীতের প্রারম্ভে যে আলাপের আচরণ হয় পরিশেষেও সেই আলাপের অনুষ্ঠান হয়ে এই গীতের পরিসমাপ্তি হবে।

সিংহভূপালের বর্ণনাটি এই রকম :—

প্রথমে তালহীন আলাপ কর্তব্য। তদনন্তর চচ্চৎপুট তালে পাঁচটি পদ পৃথক্‌ভাবে দু বার গাইতে হবে। এই চচ্চৎপুট তালেই স্বর এবং পাট আচরণ করতে হবে। তারপরে চচ্চৎপুটতালে পটহ বাজাতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখেও সেই বোলটি আবৃত্তি করতে হবে। অতঃপর চাচপুটতালে পাঁচটি পদ পৃথক্‌ভাবে দু বার গাইতে হবে। এই চাচপুট তালেই আবার হুড়ুক্ক বাজাতে হবে এবং বোলও আবৃত্তি করতে হবে। এরপর ষট্‌পিতাপুত্রকতালে পাঁচটি পদ পৃথকভাবে দু বার গাওয়া হবে এবং উক্ত তালেই স্বর এবং পাট আচরণ করতে হবে। তদনন্তর এই ষট্‌পিতাপুত্রক তাল অবলম্বন করে শঙ্খ বাজাতে হবে এবং এর সঙ্গে পদও গাইতে হবে। এরপর সম্পক্কেষ্টক তালে কাংস্য বাজবে এবং তার বোলও উচ্চারিত হবে। অতঃপর উদ্ঘট্টতালে স্বর এবং পাট সহযোগে ছটি পদ রচনা ক'তে হবে। তারপর অবিলম্বিত মানে আভোগ আচরণ করতে হবে। এই আভোগে স্তুত্য, নেতার নাম, মঙ্গলবচন প্রভৃতি পূর্বের মান অবলম্বন করে আচরণ করতে হবে। অতঃপর বাক্যরূপ মেলাপকে এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এই বর্ণনাটি যথাযথভাবে বলতে পেরেছি কি না সন্দেহ কেননা এযুগে অনেক কিছুই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, অতএব ব্যাখ্যা থেকে সব বস্তু সরলভাবে বোঝবার উপায় নেই।

সিংহভূপাল বলেছেন বাক্যরূপ মেলাপক অংশে এই গীতের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর উক্তি—"ততো বাক্যরূপেণ মেলাপকে প্রয়োগবহুলে ন্যাসঃ"। এতে মনে হয় তিনি যে গ্রন্থ অনুসরণ করেছিলেন তাতে মেলাপক উল্লেখ ছিল। অ্যাডায়ার সংস্করণের মুদ্রণ এইরূপ :—

প্রবন্ধনাম্না প্রাঙ্‌মানং নেতৃনামাথ মঙ্গলম্‌॥
বাক্যমালাপকে ন্যাসঃ পঞ্চতালেশ্বরো ভবেৎ।

এখানে বাক্যশব্দটি 'মঙ্গলবাক্য' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কল্লিনাথ এই অর্থই গ্রহণ করেছেন এবং আলাপেই গীতমোক্ষ হয় এইটিও বলেছেন। কোনও গ্রন্থে—"বাক্যমেলাপকে ন্যাস." এইরকম পাঠও থাকতে পারে এবং সম্ভবত সিংহভূপাল যে গ্রন্থ অবলম্বন করে টীকা রচনা করেছিলেন তাতে হয়তো সেইরকম ছিল। এইটি কিন্তু যথার্থ পাঠ নয় বলেই আমার বিশ্বাস কেননা পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধে মেলাপকের অস্তিত্ব ছিল এটা সঙ্গীতের বর্ণনা অনুসারে স্বীকার করা যায় না।

এই সঙ্গীতে চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পক্বেষ্টক এবং উদঘট্ট— এই পাঁচটি তালের ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে এবং এই পঞ্চতালের প্রয়োগের জন্যই এই প্রবন্ধের নাম হয়েছে পঞ্চতালেশ্বর। অপর কোন দেশী তালে এই রকম মার্গতালের প্রয়োগ দেখা যায় না।

বীররসে প্রযুক্ত এই প্রবন্ধের নাম বীরাবতার এবং শৃঙ্গারে প্রযুক্ত হলে একে বলা হয় তিলক। এই প্রবন্ধটিই হয়তো শেষ পযন্ত পঞ্চালিকা বা পাঁচলীতে পরিণত হয়েছিল।

কল্লিনাথ বলছেন যে এই পাঁচটি তাল, স্বর, পাট প্রভৃতি নিয়ে এই প্রবন্ধে সাতাশটি পদের অস্তিত্ব আছে। তাল এবং পদের অন্তর্বর্তী পাটানুষ্ঠিত তালের সংখ্যা পাঁচ। পূর্বে বলা হয়েছে যে প্রথম আলাপের পর পাঁচটি পদ দু বার করে গাওয়া হবে। কল্লিনাথ বলছেন এই দশপদই হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ এবং বাকি অংশটি ধ্রুব। অথবা যদি এক-একটি তালের অনুষ্ঠানকে পৃথক অবয়বরূপে বিচার করা হয় তাহলে প্রত্যেকটি তালযুক্ত খণ্ডের আদ্য-পদদ্বয় হবে উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তর পদত্রয় হবে ধ্রুব। কেহ কেহ এতে সালগসূড়ের অন্তর নামক অঙ্গটি যোজনা করেন। এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধটি হবে চতুর্ধাতুক। এটি নির্যুক্ত এবং বিরুদাভাবে পঞ্চাঙ্গ আনন্দিনীজাতীয় প্রবন্ধের অন্তভু ক্ত।

আলিক্রম পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধ হচ্ছে তালার্ণব। এই জাতীয় গদ্যজ বা পদ্যজ গীতে বহুতালের প্রয়োগ হয়। এতে পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধের মত নিয়মবদ্ধ তালের বিন্যাস নেই। কল্লিনাথের মতে এটি উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগযুক্ত ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত শ্রেণীর ষড়ঙ্গ মেদিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

এইবার শার্ঙ্গদেব বিপ্রকীর্ণ পর্যায়ের প্রবন্ধের পরিচয় দিচ্ছেন।

প্রথমে শ্রীরঙ্গ। এই প্রবন্ধটি অনেকটা রাগকদম্বকের মত। এতে চারটি রাগ এবং চারটি তালের ব্যবহার হয়। অন্তে পদবিন্যাস করা হয়। এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং মেদিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

শ্রীবিলাস—পাঁচটি রাগ এবং পাঁচটি তালে এই গীত অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তিতে স্বর আচরণ করা হয়। গায়নরীতি শ্রীরঙ্গের অনুরূপ।

পঞ্চভঙ্গি - শার্ঙ্গদেব বলছেন যে এই প্রবন্ধের অন্তে তেনক যোজিত হয়। আর কোন লক্ষণ তিনি দেন নি। সিংহভূপাল বলছেন যে এই প্রবন্ধ দুটি রাগ এবং দুটি তালে নিবদ্ধ। এর অন্তে তেনক সংযুক্ত হয়। কল্লিনাথ বলছেন এতে রাগ এবং তাল যোজনীয় এবং অপর লক্ষণ পূর্বের ন্যায়।

পঞ্চানন—এই প্রবন্ধের অন্তিমে পাট আচরণ করা হয়। সিংহভূপাল বলছেন যে এটি পঞ্চভঙ্গি-প্রবন্ধের অনুরূপ, কেবলমাত্র অন্তিমে পাট অনুষ্ঠিত হয়। কল্লিনাথ এক্ষেত্রেও বলছেন যে এতে বাগ এবং তাল যোজনীয় এবং অপর লক্ষণ পূর্বের ন্যায়।

উমাতিলক—এই প্রবন্ধ তিন প্রকার রাগ এবং তিন প্রকার তালে নিবদ্ধ। অন্তে বিরুদ সংযুক্ত হয়।

শার্ঙ্গদেব উপরোক্ত শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন এবং উমাতিলক —এই পাঁচটি প্রবন্ধসম্পর্কে বলেছেন যে এরা ষডঙ্গসম্পন্ন। শার্ঙ্গদেব প্রধানত এই গীতগুলির অন্তে কোন্ অঙ্গের আরোপ হবে সেইটিরই উল্লেখ করেছেন; অপর অঙ্গগুলির অনুল্লেখহেতু কল্লিনাথ বলছেন যে কেউ কেউ এইসব গানে অঙ্গগুলিকে কূটতানের মত যথেচ্ছভাবে বিন্যস্ত করেন। কোনও বিশেষ ভিত্তির ওপর চিত্ররচনা না করলে যেমন চিত্ররূপ সুবিন্যস্ত হয় না, তেমনি এই গীতের অঙ্গগুলিও অনেকক্ষেত্রে অবিন্যস্তভাবে বর্তমান থাকে।

ত্রিপদী—প্রবন্ধের নাম ত্রিপদী হলেও এতে চারটি পদ আছে। এর প্রথম দুটি চরণে দুটি করে গণ থাকবে, তৃতীয় চরণে থাকবে চারটি গণ এবং চতুর্থ চরণে থাকবে তিনটি গণ। সব মিলিয়ে হল এগারটি গণ। এর মধ্যে ষষ্ঠ এবং দশম—এই দুটি হবে রতিগণ; আর বাকিগুলি হবে মন্মথ বা কামগণ। রতিগণ এবং কামগণ এর পরিচয় সম্পর্কে এলাপ্রবন্ধের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

প্রথম পাদদ্বয় গাইবার পর তৃতীয় পাদের কিছুটা গাইতে হবে। অতঃপর সমগ্র তৃতীয় পাদটি আর একবার গেয়ে চতুর্থ পাদটি গাইতে হবে।

এই প্রবন্ধটি তালহীন এবং কর্ণাটভাষায় রচিত হয়ে থাকে।

এটিতে চারটি পাদ থাকা সত্ত্বেও কেন একে ত্রিপদী বলা হয় এর ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে কল্লিনাথ বলেছেন যে প্রথম দুটি পাদ একই রকম হওয়াতে এ দুটির মধ্যে প্রভেদ নেই এবং এই দুটি মিলিয়ে একত্বই প্রতীতি হয়ে থাকে।

ত্রিপদী প্রবন্ধের আদ্য পাদদ্বয় হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ এবং অবশিষ্ট পাদদ্বয় ধ্রুব। ইচ্ছানুসারে আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এটি হবে ত্রিধাতুক। কল্লিনাথের মতে এটি পদ এবং স্বর এই দুই অঙ্গদ্বারা বদ্ধ তারাবলীজাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

চতুষ্পদী—এই প্রবন্ধের চারটি পাদের মধ্যে সমপাদ অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের প্রত্যেকটিতে ষোলটি করে মাত্রা থাকবে। বিষম-পাদ অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটিতে পোনেরটি মাত্রা থাকবে। শার্ঙ্গদেব বলছেন দুটি অর্ধেই ভিন্নার্থযুক্ত যমক যোজিত হবে।

যমকেব উদাহরণ :—

নবপলাশ-পলাশবনং পুরঃ

স্ফুট পরাগ-পরাগত-পঙ্কজম্।

মৃদুল-তান্ত-লতান্তমলোকয়ৎ

স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈ ॥

এই শ্লোকে দেখা যাচ্ছে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিন্তু অর্থ ভিন্ন। এই অলঙ্কারের নাম যমক। আবৃত্তির দিক থেকে এর একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধের পূর্বার্ধ স্বরসংযুক্ত এবং উত্তরার্ধ তেনক-সংযুক্ত। তেনক অনুষ্ঠানেই এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে আভোগের পরিকল্পনাও করা যায়। এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং ভাবনী-জাতীয় প্রবন্ধ।

কল্লিনাথ বলছেন যে দ্বিপদী, ষট্‌পদী প্রবন্ধসম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে এগুলি তালহীন এবং কর্ণাটভাষায় রচিত। চতুষ্পদীর ক্ষেত্রে এইরকম কিছু বলা হয় নি। তথাপি "অনুক্তমন্যতো গ্রাহ্যম্"—এই ন্যায় অনুসারে চতুষ্পদী প্রবন্ধটিও যে তালহীন এবং কর্ণাটভাষায় রচিত 'ইটিই ধরে নিতে হবে। কল্লিনাথের এই উক্তি থেকে মনে হয় যে তিনি চতুষ্পদী

প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পরিচয় পান নি। সিংহভূপাল এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

ষট্পদী– এই প্রবন্ধের ছ'টি পাদ। তৃতীয় এবং ষষ্ঠ পাদের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে গণ থাকবে। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পাদের প্রত্যেকটিতে দুটি করে গণ থাকবে। তৃতীয় এবং ষষ্ঠ পাদের শেষ গণটি কেবলমাত্র বাণ-গণে রচিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ষট্পদী প্রবন্ধে সবশুদ্ধ চোদ্দটি গণ আছে। এর মধ্যে সপ্তম এবং চতুর্দশতম গণদুটি হবে বাণ-গণ, বাকি বারোটি হচ্ছে কামগণ।

এই প্রবন্ধটি তালবর্জিত এবং কর্ণাটভাষায় রচিত হয়ে থাকে। শার্ঙ্গদেব বলছেন যে গীতটি 'নাদমুক্তিক'। কল্লিনাথ ব্যাখ্যা করেছেন যে 'নাদ' শব্দে এখানে স্থায়ি স্বর বোঝাচ্ছে। যে স্বরটি স্থায়ী সেটিই প্রধানস্বর বলে বিবেচিত হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এটি যে এই স্থায়ী স্বরটি সা, রে, গা, মা প্রভৃতি স্বরের মধ্যে যেটিই হোক না কেন, সেই স্বরটি উচ্চারিত হবে না, উচ্চারিত হবে তার নাদটুকু। কল্লিনাথের উক্তি—"নাদশব্দেনাত্র স্থায়িস্বরো বিবক্ষতে। তং সারিগাদিবর্ণোচ্চাররহিতং নাদরূপমেবোচ্চার্য ন্যাসং কুর্যাদিত্যর্থ।" এই নাদাত্মক উচ্চারণেই গীতটির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এই প্রবন্ধের পূর্বভাগের তিনটি পাদ হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ এবং শেষের তিনটি চরণ হচ্ছে ধ্রুব। আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি হবে ত্রিধাতুক। এটি তারাবলীজাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ। কল্লিনাথ বিশেষভাবে বলেছেন যে গণ-ভাষা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বলেই এটি নির্যুক্ত প্রবন্ধ। ত্রিপদী প্রবন্ধের ন্যায় এর অন্তে স্বর প্রযোগ হয়ে থাকে। অতএব স্বর এবং পদ দ্বারা বদ্ধ হওয়াতে এটি তারাবলী জাতীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

উপরোক্ত ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং ষট্পদী প্রবন্ধের ছন্দ-বৈচিত্র্য অনুসারে বহুতর ভেদ হতে পারে। এই উপলক্ষ্যে কৌতূহলী পাঠক বৃত্তরত্নাকরের পঞ্চম অধ্যায়ের টীকায় নারায়ণভট্ট কর্তৃক প্রদর্শিত চতুষ্পদ এবং ষট্পদ-প্রকরণ দেখতে পারেন।

বস্তু—এই প্রবন্ধে পাঁচটি পাদ বর্তমান। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম পাদের প্রত্যেকটিতে পোনেরটি করে মাত্রা থাকবে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের প্রত্যেকটিতে থাকবে বারটি করে মাত্রা। প্রথম দুটি পাদ হচ্ছে এর পূর্বার্ধ।

এই পূর্বার্ধের পরে স্বর এবং পাটের অনুষ্ঠান করা হয়। অবশিষ্ট পদত্রয় অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের পর স্বর এবং তেনকের অনুষ্ঠান করা হয়। অতঃপর দোধক ছন্দে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। দোধকের পরিচয় দ্বিপথ প্রবন্ধ উপলক্ষে পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সমগ্র প্রবন্ধটি তেনকে পরিসমাপ্ত হয়।

কল্লিনাথ বলছেন এই প্রবন্ধে তেনকান্ত অর্ধদ্বয় হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ এবং দোধক ছন্দে কৃত অবশিষ্ট অংশটি ধ্রুব। আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। তাহলে এটি হবে ত্রিধাতুক। কল্লিনাথের মতে এটি নিযুক্ত এবং বিরুদহীন পঞ্চাঙ্গযুক্ত আনন্দিনীজাতীয়-প্রবন্ধ।

বিজয়—এটি রাজাদের বিজয় সমারোহ উপলক্ষ্যে আচরিত হয়। তেন, স্বর, পাট এবং পদ সহযোগে বিজয়তালে এই সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তেনকে এই গীতের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিজয়তালের লক্ষণ—বিজয়ঃ পগপা লঘুঃ (ऽ̀ ऽ ঃ̀ ।)। এই তালে একটি প্লুত তারপরে একটি গুরু, তারপরে প্লুত এবং সর্বশেষে একটি লঘু থাকে।

কল্লিনাথের মতে তেন এবং স্বর-যুক্ত অংশটি উদ্‌গ্রাহ, পাট এবং পদযুক্ত অংশটি ধ্রুব। পদান্তর দ্বারা আভোগের বিন্যাসও করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রবন্ধটি হবে ত্রিধাতুক। এটি নিযুক্ত এবং বিরুদহীন পঞ্চাঙ্গযুক্ত আনন্দিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

ত্রিপথক -এই প্রবন্ধে তিনটি পাদ থাকে। প্রথম পাদে পাট, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ এবং তৃতীয় পাদে স্বরের অনুষ্ঠান করা হয়। কল্লিনাথের মতে প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। পদ দ্বারা আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি তালাদি নিয়মানুসারে নিযুক্ত এবং তেনকের অভাবে পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত আনন্দিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

চতুর্মুখ এই প্রবন্ধে চারটি চরণ বর্তমান এতে স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, এবং সঞ্চারী—এই চারটি বর্ণ ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হয়। প্রথম পাদটিতে স্থায়ীবর্ণে স্বরের অনুষ্ঠান করা হয়। দ্বিতীয় পাদে আরোহী বর্ণ এবং পাটের প্রয়োগ হয়। তৃতীয় পাদটি পদযুক্ত হয় এবং এতে অবরোহী বর্ণের প্রয়োগ হয়। চতুর্থ পাদে সঞ্চারীবর্ণ এবং তেনকের অনুষ্ঠান হয়। সমস্ত গানটি গেয়ে পুনরায় উদ্‌গ্রাহ অনুষ্ঠানের পর গান শেষ করা নিয়ম। কল্লিনাথের মতে প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয় পাদদ্বয় ধ্রুব। পদান্তর দ্বারা আভোগ রচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি হবে ত্রিধাতুক।

কল্লিনাথ বলছেন যে এটি তালাদি নিয়মহেতু নির্যুক্ত এবং বিরুদের অভাবে পঞ্চাঙ্গযুক্ত আনন্দিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

সিংহলীল—এই প্রবন্ধ সিংহলীল তালে স্বর, পাট, বিরুদ এবং তেনক সহযোগে বিরচিত। কল্লিনাথের মতে স্বর, পাট দ্বারা গঠিত অংশটি উদ্‌গ্রাহ এবং বিরুদ, তেনকযুক্ত অংশটি ধ্রুব। পদ দ্বারা আভোগের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি ত্রিধাতুক বলে গণ্য হবে। তালনিয়মহেতু এটি নির্যুক্ত এবং স্বরাদি ষড়ঙ্গ সমন্বিত হওয়াতে মেদিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

সিংহলীল তালের লক্ষণ—লঘ্বন্তে দত্রয়ং সিংহলীলঃ (০ ০ ০ ।)। অর্থাৎ এই তালে তিনটি দ্রুতের পর একটি লঘু থাকবে। এটি শার্ঙ্গদেবের অভিমত। সিংহভূপাল রত্নাকরের তালাধ্যায়ের টীকায় বলছেন—"লঘুঃ আদৌ অন্তে চ যস্য, এবম্বিধং দ্রুতত্রয়ং (। ০ ০ ০ ।) সিংহলীলঃ।" কল্লিনাথ এই প্রবন্ধের টীকায় বলছেন—"তালাদ্যন্তং দত্রয়ং সিংহলীলঃ।" (অ্যাডায়ার সংস্করণে এটি শোধন করে—"তালাদ্যন্তং"-এর স্থলে "লঘ্বন্তে" করলেও এই শোধন সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।) এতদ্বারাও সিংহভূপালের মতেরই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, এঁদের মতে সিংহলীল-তালের আদিতে একটি লঘু, তারপরে তিনটি দ্রুত এবং পরিশেষে একটি লঘু থাকবে। পার্শ্বদেবও তাঁর সঙ্গীত-সময়সার গ্রন্থে বলছেন—"সিংহলীল বিধাতব্যং লঘু আদি-অন্ত-দ্রুতত্রয়ম্"। এতে বোঝা যাচ্ছে এই তাল সম্বন্ধে অনেকেই শার্ঙ্গদেবের সঙ্গে একমত নন।

হংসলীল—এই প্রবন্ধটি হংসলীল তাল অবলম্বনে রচিত। এর প্রথম পাদটি পদ এবং দ্বিতীয়টি পাট দ্বারা রচিত। কল্লিনাথের মতে প্রথম পাদটি উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয়টি ধ্রুব। পদান্তর দ্বারা আভোগও রচনা করা যেতে পারে। এটি তাহলে হবে ত্রিধাতুক। কল্লিনাথ বলছেন যে তালনিয়মহেতু এটি নির্যুক্ত এবং পদ, পাট, তাল—এই তিন অঙ্গের যোজনাহেতু এটি ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ।

শার্ঙ্গদেব তালাধ্যায়ে হংসলীল তালের লক্ষণ দিয়েছেন—"হংসলীলে বিরামান্তং লঘুদ্বয়মুদাহৃতম্" (।’ ।’)। অর্থাৎ, এই তালে বিরামযুক্ত দুটি লঘুর প্রয়োগ হয়। কল্লিনাথ এই তাল সম্বন্ধে টীকায় বলছেন "যগণশ্চ লঘুর্গুরু ইতি তস্য লক্ষণং বক্ষ্যতে"। এর কোনও ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। এই সংজ্ঞার সঙ্গে অপর কোন মতের মিল দেখা যায় না। তালাধ্যায়ে

সিংহভূপালের টীকায় দেখা যায় যে তিনি কেবলমাত্র দ্বিতীয় লঘুটিকেই বিরামযুক্ত করেছেন। পার্শ্বদেব তদীয় সঙ্গীতসময়সার নামক গ্রন্থে বলছেন—"সবিরামং লঘুদ্বন্দ্বং তালে স্যাৎ হংসলীলকে" এইটিতে শার্ঙ্গদেবের মতটিই সমর্থিত হয়েছে।

দণ্ডক—এই প্রবন্ধটি পদ এবং স্বর সহযোগে দণ্ডক ছন্দ অবলম্বনে রচিত।

দণ্ডক-ছন্দ সপ্তবিংশতি-অক্ষরযুক্ত বৃত্তি। এর লক্ষণ—দণ্ডকো নৌ রঃ। অর্থাৎ, এর প্রতি পাদে প্রথমে দুটি ন-গণ এবং পরে সাতটি র-গণ থাকবে। উদাহরণ :—

ন ন র র র র র র র

ইহা হি ভবতি দণ্ডকা-রণ্যদে-শেস্থিতিঃ পুণ্যভা-জাংমুনী-নাংমনো-হারিণী

| | | | | | s | s s | s s | s s | s s | s s | s s | s

ত্রিদশবিজয়বীর্য্যদৃপ্যদ্দশগ্রীবলক্ষ্মীবিরামেণ রামেণ সংসেবিতে।
জনকযজনভূমিসম্ভূতসীমন্তিনীসীমসীতাপদস্পর্শপূতাশ্রমে
ভুবননমিতপাদপদ্মাভিধানাম্বিকাতীর্থযাত্রাগতানেকসিদ্ধাকুলে ॥

এটি হচ্ছে চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত নামক দণ্ডকের উদাহরণ। এর সঙ্গে একটি করে র-গণ যোগ করে প্রস্তার করা যেতে পারে। এইভাবে এর বহুতর ভেদ হয়। আবার, র-গণের পরিবর্তে সাতটি য-গণ প্রযুক্ত হলে সেটি হয় প্রচেতক নামক দণ্ডক। এছাড়া ষড়বিংশতি-অক্ষরযুক্ত ছন্দের একাক্ষর বৃদ্ধি করেও দণ্ডক-ছন্দের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইভাবে এই ছন্দের বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী বহু প্রকারভেদের উল্লেখ আছে।

পদনির্মিত দণ্ডকের পূর্বার্ধ হচ্ছে উদ্গ্রাহ এবং স্বরনির্মিত উত্তরার্ধ হচ্ছে ধ্রুব। এইটি কল্লিনাথের মত। পদান্তর দ্বারা আভোগ রচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি হবে ত্রিধাতুক। কল্লিনাথ বলছেন যে ছন্দ-নিয়ম অনুসারে এটি নির্যুক্ত এবং স্বর, পদ, তাল দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ।

ঝম্পট—এই প্রবন্ধ "ঝম্পট" ছন্দ অবলম্বনে ক্রীড়াতালে গাওয়া হয়। "ঝম্পটং ত্রিপদৈঃ প্রাহুঃ" এই উদ্ধৃতি দিয়ে কল্লিনাথ বলছেন যে এর লক্ষণ গাথাভেদে দ্রষ্টব্য। ইতিপূর্বে গাথা নামক প্রবন্ধের বর্ণনায় আমরা ত্রিপদীর উল্লেখ করেছি।

ক্রীড়াতালের লক্ষণ—"ক্রীড়াদ্রুতৌ বিরামান্তৌ (॰ ॰)। অর্থাৎ, এই তালে দুটি বিরামযুক্ত দ্রুতের প্রয়োগ হয়।

কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধের প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। এটি ত্রিপদী হওয়াতে এতে তিনটি পাদ বর্তমান। আভোগ পরিকল্পিত হলে এটি হবে ত্রিধাতুক। ছন্দ এবং তাল দ্বারা নিবদ্ধ হওয়ায় এটি নির্যুক্ত এবং পদ, তালবদ্ধ হওয়াতে এটি তারাবলীজাতীয় প্রবন্ধ।

কন্দুক—কল্লিনাথ বলছেন এই প্রবন্ধ সম্পর্কেও গাথাভেদ দ্রষ্টব্য। এতেও তিনটি পাদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কারণে এটিও একপ্রকার ত্রিপদীই বলতে হবে। শার্ঙ্গদেব কেবলমাত্র বলছেন যে পদ, পাট এবং বিরুদের দ্বারা কন্দুক প্রবন্ধ গীত হয়ে থাকে। কল্লিনাথ বলছেন যে এই প্রবন্ধের প্রথম পাদটি পদ দ্বারা বদ্ধ; দ্বিতীয়টি পাট দ্বারা রচিত এবং তৃতীয়টি বিরুদনির্মিত। উদ্‌গ্রাহাদির বিভাগ পূর্বের ন্যায়; অর্থাৎ প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। তালাদি-নিয়মহেতু এটি নির্যুক্ত এবং স্বর ও তেনকের অভাবে চতুরঙ্গ দীপনীজাতীয় প্রবন্ধ। কল্লিনাথ বিশেষভাবে বলেছেন যে সিংহলীলাদি পাঁচটি প্রবন্ধ (অর্থাৎ, সিংহলীল, হংসলীল, দণ্ডক, ঝম্পট এবং কন্দুক) উদ্‌গ্রাহে পরিসমাপ্ত হয়। তাঁর উক্তি—"সিংহলীলাদিষু পঞ্চস্বুদ্‌গ্রাহে ন্যাসঃ কর্তব্যঃ। এবমনুক্তন্যাসস্থানেষু সর্বত্র ন্যায়েঽনুসন্ধেয়ঃ।"

ত্রিভঙ্গি-এই প্রবন্ধটি স্বর, পাট এবং পদ দ্বারা রচিত। এর পাঁচটি প্রকারভেদ আছে। একপ্রকার প্রবন্ধ ত্রিভঙ্গি নামক তালে গাওয়া হয়। ত্রিভঙ্গি তালের লক্ষণ—"ত্রিভঙ্গিঃ সগণাদ্‌গুরুঃ (। । s s)। অর্থাৎ, এতে পর পর দুটি লঘু এবং দুটি গুরুর সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় প্রকারে ত্রিভঙ্গি নামক ছন্দের ব্যবহার হয়। এই ছন্দটি সম্পর্কে কল্লিনাথ বলছেন—"ত্রিভঙ্গি বৃত্তমপি গাথাভেদো দ্রষ্টব্য"। অর্থাৎ, ত্রিভঙ্গি বৃত্ত বা ছন্দটি সম্পর্কেও গাথাভেদ দ্রষ্টব্য। তৃতীয় প্রকারে তিন রকম রাগ এবং তিন রকম তালের প্রয়োগ হয়। চতুর্থ প্রকারে তিন রকম ছন্দের প্রয়োগ হয়। পঞ্চম প্রকারের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি দেবতার স্তুত্য-সংযোগ। শার্ঙ্গদেব এখানে বলছেন—"যদ্বা দেবত্রয়াস্তুত্যা তালদ্বৈগুণ্যমুক্তকঃ"। এই "তালদ্বৈগুণ্যমুক্তকঃ" শব্দের স্পষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় নি। অনুমান হয় গানটির মুক্তি বা সমাপ্তিকালে তালটি দ্বৈগুণ্য প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ এর লয় ডবল হয়ে যাবে। আবার এর অর্থ

এও হতে পারে যে, যে লয়ে গানটি গাওয়া হচ্ছে তার দ্বিগুণ কমে আসবে। অর্থাৎ দ্রুত লয় থেকে দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মধ্যলয় বা মধ্যলয় থেকে দ্বিগুণ কমে গিয়ে বিলম্বিত লয়ে এসে সমাপ্ত হবে। বস্তুত তালাধ্যায়ে দ্বিগুণ শব্দটি এই ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হরিবিলাসক—এই গীতের প্রথম খণ্ডে বিরুদ, দ্বিতীয় খণ্ডে পাট এবং তৃতীয় খণ্ডে তেনকের অনুষ্ঠান করা হয়। প্রথম খণ্ডটি উদ্‌গ্রাহ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হচ্ছে ধ্রুব। কল্লিনাথ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পদান্তর দ্বারা আভোগের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। কল্লিনাথের মতে এটি হবে ত্রিধাতুক নির্যুক্ত এবং স্বরবর্জিত পঞ্চাঙ্গ আনন্দিনীজাতীয় প্রবন্ধ।

সুদর্শন—এটি হরিবিলাসকের অনুরূপ। এতে পদ, বিরুদ এবং তেনকের ব্যবহার হয়। কল্লিনাথের মতে স্বর এবং পাটের অভাবে এটি দীপনীজাতীয় প্রবন্ধ।

স্বরাঙ্ক—এই প্রবন্ধের পরিচয় সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলছেন—পদ, স্বর এবং বিরুদ—এই তিনটিকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে উদ্‌গ্রাহাদি তিনটি ধাতুর অনুষ্ঠান করতে হবে। এতে ক্রমান্বয়ে একটি, দুটি এবং তিনটি তালেরও প্রয়োগ হবে। কল্লিনাথের মত অনুসারে পদ দ্বারা উদ্‌গ্রাহ, স্বর দ্বারা মেলাপক এবং বিরুদ দ্বারা ধ্রুবের অনুষ্ঠান কর্তব্য। তবে তিনি একথাও বলছেন যে শার্ঙ্গদেব এই প্রবন্ধে মেলাপকের বিশেষ উল্লেখ না করতে এটি মেলাপকবর্জিত এই রকম অনুমানও করা যেতে পারে। সিংহভূপাল এই প্রবন্ধে মেলাপকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাল সম্পর্কে কল্লিনাথ বলছেন যে এই প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহে একটি তাল, মেলাপকে দুটি তাল এবং ধ্রুবে তিনটি তাল ব্যবহৃত হবে। সিংহভূপালের মতে উদ্‌গ্রাহ অংশ একটি তাল এবং পদ দ্বারা গঠিত হবে, এর পরেই স্বর এবং দুটি তাল সহযোগে ধ্রুবের অনুষ্ঠান করতে হবে, তারপরে বিরুদ এবং তিনটি তাল সহযোগে আভোগ রচনা করতে হবে। অবশেষে স্বরাচরণপূর্বক গানটি সমাপ্ত করতে হবে। শার্ঙ্গদেব বলছেন যে এই প্রবন্ধটি মালবশ্রী রাগে গাইতে হবে।

কল্লিনাথ বলছেন যে যদি মেলাপক এবং আভোগ দুটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় তাহলে এটি চতুর্ধাতুক প্রবন্ধ বলে গণ্য হবে। রাগ দ্বারা নিয়মিত হওয়াতে এটি নির্যুক্ত প্রবন্ধ। এতে পাট এবং তেনকের ব্যবহার নেই অতএব এটি চতুরঙ্গ দীপনীজাতীয় প্রবন্ধ।

এই গীত সম্পর্কে পাঠভেদ আছে। অ্যাডায়ার সংস্করণের পাঠ এইরূপ :—

পদৈঃ স্বরৈশ্চ বিরুদৈরুদ্‌গ্রাহাদিত্রয়ং ক্রমাৎ॥ ২৮৫
একদ্বিত্রাশ্চ তালাঃ স্যুর্গীতব্যো মালবশ্রিয়া।
(পৃঃ ৩০০-প্রবন্ধধ্যায়)

কল্লিনাথ এই পাঠ গ্রহণ করেছেন। অপর পাঠ অনুসারে দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অংশটুকু হচ্ছে—"স্যুঃ স্বরাঙ্কে ন্যসনং স্বরৈঃ।" সিংহভূপাল এই পাঠটিই গ্রহণ করেছেন। সঙ্গীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে শেষোক্ত পাঠটি পাওয়া যায়।

শ্রীবর্ধন—এই প্রবন্ধটি বিরুদ, পাট, পদ এবং স্বর দ্বারা রচিত। এই গীতের সমাপ্তি কিভাবে হবে সেটি নির্দেশ করে বলা হয়েছে—"তালমানদ্বয়ন্যাসৌ" অর্থাৎ তাল এবং মান এই দুটিতে সমাপ্তি। তাল সঙ্গীতের মান দ্বারা নিয়মিত হয়। অতএব তাল-মান প্রায় একই বস্তু। সিংহভূপাল ভিন্নপাঠ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। তিনি বলছেন—"তালাবৃত্তিদ্বয়েন ন্যাসে" অর্থাৎ তাল এবং আবৃত্তি অনুষ্ঠানে গীতের সমাপ্তি ঘটে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-সারসংগ্রহ গ্রন্থের পাঠ—"তালমানদ্বয়েনাসৌ নিঃশঙ্কেনেতি কীর্তিতং"। এইটিই সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ পাঠ বলে মনে হয়। এই পাঠ অনুসারে আমরা বলতে পারি যে শ্রীবর্ধন প্রবন্ধটি তাল-মান সহযোগে বিরুদ, পাট, পদ এবং স্বর দ্বারা গ্রথিত হয়ে থাকে।

কল্লিনাথের মতে এই গীতের উদ্‌গ্রাহ অংশটি বিরুদ এবং পাট সহযোগে রচিত; আর, ধ্রুব অংশটি পদ এবং স্বর দ্বারা সংগঠিত।

হর্ষবর্ধন—এই প্রবন্ধটিতেও পদ, বিরুদ, স্বর এবং পাটের প্রয়োগ হয়। শ্রীবর্ধনের সঙ্গে এর তফাৎ সম্ভবত এই যে উক্ত গীতের ক্ষেত্রে পূর্বাংশে ছিল বিরুদ এবং আর উত্তরাংশে ছিল পদ এবং স্বর। হর্ষবর্ধনের ক্ষেত্রে পূর্বাংশে রয়েছে পদ এবং বিরুদ আর উত্তরাংশে রয়েছে স্বর এবং পাট।

সিংহভূপাল বলছেন হর্ষবর্ধন প্রবন্ধ কেবলমাত্র পদ এবং বিরুদ দ্বারা সংগঠিত। এতে অনুমান হয় যে তিনি এই প্রবন্ধে স্বর এবং পাটের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

বদন—এই প্রবন্ধে ছ-গণ (sss), প-গণ (ssı) এবং দ-গণ (s)—এই তিনটি গণের সন্নিবেশ হয়। কল্লিনাথ বলছেন যে এই তিনটি মাত্রাগণ-সমন্বিত

পাদটি হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ। এর পরের পাদটি স্বর এবং পাট দ্বারা রচিত। কল্লিনাথের মতে এইটি ধ্রুব।

এই প্রবন্ধের প্রথম পাদে দুটি ছ-গণ, একটি দ গণ এবং একটি ত-গণ এই চারটি গণের সমাবেশ হলে সেটি "উপবদন" নামে অভিহিত হয়। সিংহভূপাল পাঠান্তর গ্রহণ করে বলছেন এই প্রবন্ধ ছ-গণ, চ গণ, দ-গণ, ত গণ সমন্বিত হলে "উপবদন" নামে পরিচিত হয়। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন সঙ্কলিত সঙ্গীত-সারসংগ্রহ গ্রন্থ অনুসারে "উপবদন" প্রবন্ধটি দুটি ছ-গণ, একটি দ গণ এবং একটি "ন-গণ" সমন্বিত হবে। কিন্তু শেষোক্ত "ন-গণ"টি গ্রহণ যোগ্য নয় কেননা ন-গণ" মাত্রাগণের অন্তর্ভুক্ত নয় এটি বর্ণগণের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ বা সিংহভূপাল কেহই বর্ণগণের নির্দেশ করেন নি। অতএব এই পাঠটি ভ্রান্ত বলে মনে হয়।

বদন প্রবন্ধের প্রথম পাদে দুটি ছ-গণ, একটি দ-গণ, একটি চ-গণ এবং আরও একটি ছ-গণ যুক্ত হলে সেটি "বস্তু বদন" নামে অভিহিত হয়। সিংহ-ভূপাল পাঠান্তর গ্রহণ করে শেষোক্ত ছ গণের পরিবর্তে একটি ত-গণ যোগ করেছেন।

উপবদন এবং বস্তু-বদন এই দুটি প্রবন্ধেই স্বর পাট-যুক্ত শেষ পাদটি থাকবে। কল্লিনাথ বলছেন পদান্তর দ্বারা আভোগও রচনা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধগুলি হবে ত্রিধাতুক। এগুলি ছন্দ এবং তালাদি দ্বারা নিয়মিত হওয়ায় নির্যুক্ত প্রবন্ধ বলে গণ্য। বিরুদ এবং তেনক—এই দুটি অঙ্গের সংযোগ না হওয়াতে এই তিনটি গীত চতুরঙ্গ দীপনী জাতীয় প্রবন্ধরূপে পরিগণিত হয়।

চচ্চরী—এই প্রবন্ধটি সাধারণত হিন্দোল রাগ অবলম্বনে চচ্চরী তালে গাওয়া হয়। চচ্চরী তালের লক্ষণ—"বিরামান্ত দ্রুতদ্বন্দ্বাস্তষ্টৌ লঘু চ চচ্চরী

(০́০০́০০́০০́০০́০০́০০́০০́০০́।)। অর্থাৎ এই তালে বিরামান্ত দুটি দ্রুত মাত্রার আটটি সমষ্টি থাকে এবং তার পরে একটি লঘুমাত্রা যোজিত হয়।

মতান্তরে ষোড়শমাত্রা সমন্বিত চচ্চরী ছন্দেও এই গীতটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে বহুপাদ বর্তমান এবং দুটি করে পাদ অনুপ্রাস যুক্ত হয়; অর্থাৎ পাদান্তে মিল থাকে। এটি প্রাকৃত পদে রচিত হয় এবং বসন্তোৎসবে গীত হয়ে থাকে।

কেহ কেহ ক্রীড়াতাল অবলম্বনে এই গীতের অনুষ্ঠান করেন। কেহ বা ঘত্তা বা তদ্রূপ ছন্দ অবলম্বন করেও এই জাতীয় এই প্রবন্ধের আচরণ করেন। ঘত্তা ছন্দের এক একটি পাদ সাতটি চতুর্মাত্রিকগণ এবং তিনটি লঘু দ্বারা গঠিত। এর প্রথম দশ মাত্রায় বিরতি, তারপরে অষ্টম মাত্রায় এবং তদন্তর ত্রয়োদশ মাত্রায় বিরতি হয়ে থাকে। এই ছন্দে এই রকম চারটি পাদের অস্তিত্ব থাকে। বৃত্ত রত্নাকরের পঞ্চম অধ্যায়ের টীকায় নারায়ণ ভট্ট এই ছন্দের নমুনা দিয়েছেন।

চচ্চরী প্রবন্ধ যখন ছন্দান্তর অবলম্বনে গাওয়া হয় তখন ছন্দশাস্ত্রোক্ত সেই ছন্দের নামটিও চচ্চরীর সঙ্গে যুক্ত করা কর্তব্য।

কল্লিনাথের মতে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব ব্যতীত পদান্তর দ্বারা এই প্রবন্ধে আভোগও রচনা করা যায়। সেক্ষেত্রে এটি হবে ত্রিধাতুক, ছন্দ এবং তালের নিয়ম নির্দিষ্ট থাকায় এটি নির্যুক্ত প্রবন্ধ। পদ এবং তাল দ্বারা গঠিত হওয়ায় এটি দ্ব্যঙ্গযুক্ত তারাবলী জাতির অন্তর্ভুক্ত।

চর্যা—চর্যা প্রবন্ধ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লেখালেখি ইতিপূর্বে বড় কম হয় নি অথচ রত্নাকরের এই বর্ণনাটি অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে। শার্ঙ্গদেবের উল্লেখ থেকে স্পষ্টই অনুমান হচ্ছে যে এই গীতরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীরও বেশ কিছু আগে থেকেই চলে আসছিল। এটি যে বিশেষ ভাবে বাংলাতেই প্রচলিত ছিল এমন কথা শার্ঙ্গদেব বলেন নি। ভারতের বহুস্থানেই চর্যাগায়ণ প্রচলিত ছিল এটি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। অতএব যাঁরা মনে করেন চর্যা বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি তাঁদের ধারণা যথার্থ নয়।

চর্যা প্রবন্ধ পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত হয়। এর পাদান্ত অনুপ্রাসযুক্ত হয়; অর্থাৎ দুটি পাদের শেষ বর্ণে মিল থাকে। এই গীত আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়। এতে দ্বিতীয় প্রভৃতি তালের প্রয়োগ হয়।

পদ্ধড়ী ছন্দ হচ্ছে সংস্কৃত পজ্‌ঝটিকা ছন্দ। এর লক্ষণ এবং উদাহরণ :—

ষোডশ মাত্রাঃ পাদে পাদে
যত্রভবন্তি নিরস্ত বিবাদে।
পদ্ধড়িকা জ-গণেন বিমুক্তা
চরমগুরুঃ সা সদ্ভিরিহোক্তা॥

এর প্রতি পাদে ষোড়শ মাত্রা এবং এতে জ-গণ বা মধ্যগুরু গণের ব্যবহার নেই। এই ছন্দের গণগুলি চতুষ্কল। নারায়ণ ভট্টের মতে পাদের শেষে

জ-গণ সম্ভবও হতে পারে। প্রাকৃতে তিনি যে উদাহরণটি দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃত করছি :—

জে গ। ঞ্জি অ গো। ড়া হি ব। ই রা উ
উ দ্দ। ও ও ড্ড। জ স্স ভ অ। প লা উ।
উ রু বি। ক্ক ম বি। ক্ক ম জি ণি। অ জু জ্ ঝ
তা ক। ন্ন প র। ক্ক ম কো। ণ বু জ্ ঝ॥
(যেন গঞ্জিতো গৌড়াধিপতী রাজা
উদ্দণ্ড ওড্রো যস্য ভয়েন পলায়িতঃ
গুরু বিক্রমো বিক্রমো জিতো যুদ্ধে
তৎকর্ণ পরাক্রমং কোন বুধ্যতে॥)

দ্বিতীয় তালের লক্ষণ—"দৌলো দ্বিতীয়কঃ (০০।) অর্থাৎ দুটি দ্রুত এবং একটি লঘুর সন্নিবেশে দ্বিতীয়তাল সৃষ্ট হয়।

চর্যাগীতি দুই প্রকার। যেটিতে ছন্দের পূরণ ঠিক ভাবে হয়েছে সেটি হচ্ছে পূর্ণা, আর যেটিতে যথাযথ ভাবে ছন্দের পূরণ হয় নি সেটি অপূর্ণা।

এই গীতকে আবার সমধ্রুবা এবং বিষমধ্রুবা—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই দুটি শব্দের অর্থ নিয়ে কল্লিনাথ এবং সিংহভূপালের মধ্যে মতভেদ বর্তমান।

কল্লিনাথ বলছেন—"সমধ্রুবো যস্যা ইতি বহুব্রীহিঃ"। এইভাবে অর্থ করলে ধ্রুব অঙ্গটি অপর কোন অঙ্গের সমান এইরকম একটি অপেক্ষা থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবেই ধ্রুবের পূর্বে উদ্‌গ্রাহকেই অপেক্ষা করা হয়ে থাকে। তাহলে ধ্রুব এখানে উদ্‌গ্রাহের সমপর্যায়ভুক্ত এই রকমই অনুমান হয়। অতএব কল্লিনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন—"তেন ধ্রুবস্যোদ্‌গ্রাহসমত্বমবগম্যতে।" বিষমধ্রুবা বললে ধ্রুবের উদ্‌গ্রাহ অপেক্ষা ন্যূনতা বা অধিকত্ব হেতু বিষমত্ব ঘটছে এই রকম অনুমান হয়। এইভাবে বিচার করে কল্লিনাথ বলছেন—"এবং বিষমধ্রুবেত্যত্রাপি ধ্রুবস্যোদ্‌গ্রাহাপেক্ষয়া ন্যূনত্বেন বাধিকত্বেন বা বিষমত্বং দ্রষ্টব্যম্"। কল্লিনাথের মতে পৃথক পদে আভোগ রচনা করা যেতে পারে।

সিংহভূপাল বলছেন যে সব পাদগুলির আবৃত্তি হচ্ছে সমধ্রুবার লক্ষণ এবং কেবলমাত্র ধ্রুব অংশটির আবৃত্তি হচ্ছে বিষমধ্রুবা। তাঁর উক্তি—"সর্বেষাং পাদানামাবৃত্তৌ সমধ্রুবা ধ্রুবস্যৈবাবৃত্তৌ বিষমধ্রুবেতি।"

শার্ঙ্গদেব বলছেন :—

সমধ্রুবা চ বিষমধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা॥ ২৯৩

আবৃত্ত্যা সর্বপাদানাং গীয়তে সা ধ্রুবস্ত বা।

(অ্যাডায়ার সংস্করণ প্রবন্ধাধ্যায় পৃ ৩০৪)

কল্লিনাথের ব্যাখ্যা কতখানি গ্রহণযোগ্য বলতে পারি না তবে মনে হয় উদ্গ্রাহ এবং ধ্রুবের তুলনা করা শার্ঙ্গদেবের উদ্দেশ্য ছিল না। চর্যাগীতিতে একপ্রকার ধুয়ার অস্তিত্ব ছিল এইটিই বিশেষভাবে বলা শার্ঙ্গদেবের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়।

কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক এবং ছন্দ, তাল দ্বারা নিয়মিত হওয়ায় নির্যুক্ত প্রবন্ধ। পদ তালবদ্ধ হওয়াতে এটি দ্ব্যঙ্গযুক্ত তারবলী জাতির অন্তর্ভুক্ত।

পদ্ধড়ী—এই গীতটি পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত এবং এর দুই চরণের শেষ বর্ণে মিল থাকে। এই প্রবন্ধে বিরুদ, স্বর এবং অন্তে পাটের প্রয়োগ হয়। কল্লিনাথ বলছেন যে প্রথমার্ধ বিরুদদ্বারা গঠিত হবে এবং এতে স্বর প্রযুক্ত হবে। দ্বিতীয়ার্ধও বিরুদদ্বারা রচিত হবে এবং এই অংশে পাট প্রযুক্ত হবে। এই গীতে সস্বর প্রথমার্ধটি উদ্গ্রাহ এবং পাটযুক্ত দ্বিতীয়ার্ধটি ধ্রুব। পদ দ্বারা আভোগ পরিকল্পনীয়। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, ছন্দ নিয়মহেতু নির্যুক্ত এবং তেনকের অভাবে পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

রাহড়ী-এটি সংগ্রাম উপলক্ষ্যে স্তুতিসূচক গীত। অতএব এটি বীররসাত্মক। এতে বহু পাদের অস্তিত্ব আছে। কল্লিনাথ বলছেন এই পাদগুলির কিছু ধ্রুব হিসাবে ভাগ করে গাওয়া হয়। পৃথকভাবে এই গীত আভোগের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুকএবং কেবল মাত্র পদ-তাল বদ্ধ হওয়াতে তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ।

বীরশ্রী -এই প্রবন্ধটি পদ এবং বিরুদ দ্বারা নিবদ্ধ। কল্লিনাথের মতে পদ হচ্ছে উদ্গ্রাহ এবং বিরুদ অংশটি ধ্রুব। পৃথকভাবে আভোগের আচরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে এটি ত্রিধাতুক, এবং পদ-তাল-বিরুদ বদ্ধ হওয়াতে তিন-অঙ্গ যুক্ত ভাবনী জাতীয় প্রবন্ধ।

মঙ্গলাচার—এই প্রবন্ধটি কৈশিকী রাগে, নিঃসারু তালে, স্বরাচরণ পূর্বক গীত হয়। এটি তিন প্রকার—গদ্যজ, পদ্যজ এবং গদ্যপদ্যজ।

কল্লিনাথ বলছেন যে এই গীত শুদ্ধপঞ্চমের ভাষা-রাগ কৈশিকীতে গাইতে

হবে। কিন্তু, ইতিপূর্বে রাগ প্রসঙ্গে আলোচনা উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে যে উক্ত ভাষারাগ ঈর্ষায় প্রযুক্ত হয়। কৈশিকী নামক যে ভাষাঙ্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেটিই উৎসবে বিনিযুক্ত হয়। অতএব মঙ্গলাচার প্রবন্ধে ভাষাঙ্গ-কৈশিকীর প্রয়োগ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

নিঃসারুক তালের লক্ষণ—"বিরামন্তৌ লঘু নিঃসারুকো মতঃ।" অর্থাৎ, এতে দুটি লঘুর ব্যবহার হয় এবং পরের লঘুটি বিরামযুক্ত (।।)।

কল্লিনাথ বলছেন যে এই প্রবন্ধে যে স্বরানুষ্ঠান হবে সেটি পদের অন্তে বা অর্ধপদ সম্পন্ন হলে আচরণ করা বিধেয়। পৃথক্‌ভাবে আভোগের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে এটি ত্রিধাতুক, তালাদি নিয়মহেতু নির্যুক্ত এবং পদ-স্বর তাল-বদ্ধ হওয়াতে তিন-অঙ্গ-যুক্ত ভাবনী জাতীয় প্রবন্ধ।

ধবল—এই প্রবন্ধ তিন প্রকার—কীর্তি, বিজয় এবং বিক্রম।

কীর্তি-ধবল প্রবন্ধ চারটি চরণে উপনিবদ্ধ। এর বিষম চরণ-দ্বয়ে অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় চরণে দুটি করে ছ-গণ থাকে। সম-চরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে এর ওপর ত-গণ বা দ-গণ এই দুটির সন্নিবেশ ঘটে। বিষম চরণে দুটি ছ-গণ থাকলে মোট বারটি মাত্রা হয় এবং সমচরণে এর সঙ্গে ত-গণ, আরও তিনটি মাত্রা যোগ করলে পোনেরো মাত্রা হয়, দ-গণ যোগ করলে মাত্রা সংখ্যা হয় চোদ্দ।

বিজয়-ধবল প্রবন্ধ ছ'টি চরণে গ্রথিত। এর মাত্রা বিন্যাস এইরূপ :—

প্রথম চরণ—দুটি দ-গণ = ৪

দ্বিতীয় চরণ—দুটি দ-গণ = ৪

তৃতীয় চরণ—দুটি দ গণ এবং একটি ছ-গণ বা প-গণ—৪ + ৬ = ১০

অথবা ৪ + ৫ = ৯।

চতুর্থ চরণ—দুটি দ-গণ = ৪

পঞ্চম চরণ—দুটি দ-গণ এবং একটি ছ-গণ বা প-গণ—৪ + ৬ = ১০

অথবা ৪ + ৫ = ৯।

ষষ্ঠ চরণ—দুটি দ-গণ = ৪

বিক্রম ধবলের চরণ সংখ্যা আটটি। এর মাত্রা বিন্যাস এই রকম :—

প্রথম চরণ—তিনটি চ-গণ এবং একটি দ-গণ = ১৪

দ্বিতীয় চরণ—তিনটি দ-গণ = ৬

তৃতীয় চরণ—তিনটি দ-গণ = ৬

চতুর্থ চরণ—তিনটি চ গণ এবং একটি দ-গণ=১৪

পঞ্চম চরণ—তিনটি চ-গণ এবং একটি দ-গণ=১৪

ষষ্ঠ চরণ—চারটি দ-গণ=৮

সপ্তম চরণ—তিনটি দ-গণ=৬

অষ্টম চরণ—চারটি দ-গণ=৮

ধবল প্রবন্ধ আশীর্বাদ সূচক। এই প্রবন্ধের চরণাদিতে "ধবল" বা বিমলত্ব বোধক বাক্য বা শব্দ থাকে। উক্ত নিয়ম ছাড়াও এই গীত লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে বা শিল্পীর ইচ্ছানুসারে গাওয়া হয়।

এর পূর্বভাগ উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। আভোগ পৃথক্‌ভাবে রচনা করা কর্তব্য। এটি পদ-তাল-বদ্ধ হওয়াতে তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ।

মঙ্গল—এই প্রবন্ধে কৈশিকী বা বোট্টরাগের প্রয়োগ হয়। এটি কল্যাণ-বাচিক পদে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। অথবা, মঙ্গলনামক ছন্দেও এই প্রবন্ধ রূপায়িত হয়ে থাকে। মঙ্গলপদ অর্থে কল্লিনাথ বলছেন—শঙ্খচক্রাব্জকোককৈরবাদিশংসিভিরিত্যর্থঃ। মঙ্গলছন্দের লক্ষণ এবং উদাহরণ—

পঞ্চচকারগণাঃ প্রতিপাদগতাশ্চে—

মঙ্গলমাহুরিদং সুধিয়ঃ খলুবৃত্তম ॥

এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বর্ণিত মঙ্গলাচার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ওবীপদ—এটি দেশভাষায় রচিত। এতে অনুপ্রাসযুক্ত তিনটি খণ্ড বর্তমান এবং অন্তে "ওবী" এই পদটি গাওয়া হয়। "ওবা"—এই বস্তুটি যে কি সেটি বুঝিয়ে বলা হয় নি। এই প্রবন্ধের চরণগুলিতে আবৃত্তিভেদে পদের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে অনুপ্রাসের বৈচিত্র্য বা ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এতে বহু ছন্দের প্রয়োগ হয়। শার্ঙ্গদেব বলছেন—"ওব্যো জনমনোহরা" এতে মনে হয় তাঁর সময় দৌলতাবাদ অঞ্চলে এই ধরণের গান বিশেষ প্রচলিত ছিল।

লোলীপদ—এই গীতের লক্ষণ ওবীপদের মতই কেবল "ওবী" পদস্থলে "লোলী" পদ প্রযুক্ত হয়। এই লোলীপদেরও অর্থ বুঝিয়ে বলা হয় নি। এই গীতটি প্রাকৃত পদে রচিত হয়।

ঢোল্লরীপদ—পূর্বে দ্বিপথক প্রবন্ধ উপলক্ষ্যে দোধক বা দোহদছন্দের উল্লেখ করা হয়েছে। এই গীতটি সেই ছন্দে গাওয়া হয়। এর শেষে

"ঢোল্লরী"-পদ যুক্ত হয়। ঢোল্লরী শব্দের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। এটি লাটভাষায় রচিত হয়।

দন্তী—এই গীতটিতে অনুপ্রাসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এতে তিনটি খণ্ড আছে। গীতশেষে "দন্তী" পদের প্রয়োগ হয়। এই দন্তীশব্দের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি।

শার্ঙ্গদেব বিশেষভাবে বলেছেন যে ওবী প্রভৃতি চারিটি গীত আভোগ-বর্জিত। এগুলি ছাড়া অপর বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে সেসব ক্ষেত্রে আভোগের উল্লেখ না থাকলেও পৃথক্‌পদদ্বারা আভোগের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কল্লিনাথ এই উক্তির তাৎপর্য গ্রহণ করে গ্রন্থে অনুল্লেখ সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রবন্ধে আভোগরচনার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই চারটি প্রবন্ধ সম্পর্কে কল্লিনাথ বলছেন যে পদ এবং তালদ্বারা বদ্ধ হওয়ায় এগুলি দুই-অঙ্গ সমন্বিত তারাবলী জাতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রবন্ধ সঙ্গীতের বর্ণনায় আমরা শুদ্ধ-সূড় প্রবন্ধের পরিচয় পেয়েছি। অতঃপর সূড়-আলিক্রম প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তারপর ছত্রিশ প্রকার বিপ্রকীর্ণের পরিচয়ও প্রদান করা হল। পরিশেষে শার্ঙ্গদেব ছায়ালগ বা সালগ-সূড়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

বর্তমান সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে এই সালগ-সূড় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা বর্তমান ধ্রুবপদের আদিরূপটি এই পর্যায়ের গীত থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সালগ শব্দটি ছায়ালগ শব্দের অপভ্রংশ। ছায়ালগ শব্দের অর্থনির্ণয় উপলক্ষ্যে কল্লিনাথ বলছেন—ছয়ালগঃ ছায়াং শুদ্ধসাদৃশ্যং লগতি গচ্ছতি ইতি তথোক্ত.।" অর্থাৎ, যে সব গীতে শুদ্ধ সঙ্গীতের ছায়াপাত ঘটেছে সেগুলিকেই ছায়ালগ বা সালগ বলা হয়। জাতি, কপাল, কম্বল, গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা—এসবগুলি শুদ্ধগীতের অন্তর্ভুক্ত। এলা প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে শুদ্ধগীতকেই অনুসরণ করেছে বলে শার্ঙ্গদেব এলা থেকে একতালী পর্যন্ত গীতগুলিকে শুদ্ধসূড় হিসাবে স্বীকার করেছেন। এইসব গানের ক্ষেত্রে নাকি নিয়মের অতিলঙ্ঘন হয়নি। আর ধ্রুব প্রভৃতি গানের ক্ষেত্রে নিয়মের অতিলঙ্ঘন ঘটায় সেগুলি ছায়ালগ বা সালগের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। এই বিষয়টি কিন্তু আরও ভালভাবে বিচার করা উচিত ছিল, কেননা এলা প্রভৃতি গানের সঙ্গে পূর্ববর্ণিত জাতি বা রাগ-গায়নের যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হয় এমন নয় এবং শার্ঙ্গদেব নিজেও দেশীত্বহেতু

এদের বহু রীতিনীতি শাস্ত্রানুগ না হলেও সেগুলিকে দোষ বলে ধরেন নি। এক্ষেত্রে এদের ওপর কতটা শুদ্ধত্ব আরোপ করা যায় সেটা বিচার্য বিষয়। শার্ঙ্গদেব বলছেন যে যদিও এলা প্রভৃতি গীতের ক্ষেত্রেও ছায়ালগত্ব আচার্যসম্মত তথাপি শুদ্ধগীতের সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু এগুলিও লোকপ্রসিদ্ধিহেতু শুদ্ধ বলেই গৃহীত হয়ে এসেছে। তাঁর উক্তি—"ছায়ালগত্বমেলাদের্যদ্যা-প্যাচার্যসম্মতং। লোকে তথাপি শুদ্ধোহসৌ শুদ্ধসাদৃশ্যতো মতঃ॥" শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর সঙ্কলিত সঙ্গীতসারসংগ্রহ তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অতএব শার্ঙ্গদেব এলাপ্রভৃতি গীতগুলিকে শুদ্ধসূড বলেই স্বীকার করেছেন।

ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাস এবং একতালী—এই সাতটি গীতি সালগসূড়ের অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত একতালীর সঙ্গে শুদ্ধসূড়স্থ একতালীর সম্বন্ধ নেই।

প্রথমোক্ত ধ্রুব বা ধ্রুবক গীতির লক্ষণ হচ্ছে এইরকম :—

উদ্‌গ্রাহ অংশটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। দুটি খণ্ডই সদৃশগেয় বা একরকম-ভাবেই গাওয়া হয়। শার্ঙ্গদেব একে বলেছেন—"একধাতু" অর্থাৎ দুটি খণ্ডের মধ্যে ধাতুগত কোন পরিবর্তন নেই কেবলমাত্র দুটি খণ্ড হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। তবে মাতুগত বা বাক্যগত প্রভেদ নিশ্চয়ই ছিল তা নইলে একই খণ্ডের পুনরাবৃত্তি হয়ে পড়ে। এর পরে আর একটি খণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছে—এটি কিঞ্চিৎ উচ্চ-স্বরে গাইতে হবে। এই অংশটির নাম "অন্তর"। সিংহভূপাল বলছেন—"কিঞ্চিদুচ্চং খণ্ডং অন্তরাখ্যং কর্তব্যম্।" প্রবন্ধাধ্যায়ের সূচনাতে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—"ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোহন্তরাভিধঃ। স তু সালগসূডস্থস্বরূপকেষু এব দৃশ্যতে।" অর্থাৎ কেবলমাত্র সালগসূডস্থ গীতগুলিতেই ধ্রুব এবং আভোগ এই দুটি ধাতুর মধ্যস্থলে আর একটি ধাতুর সাক্ষাত পাওয়া যায় তার নাম অন্তর। উদ্‌গ্রাহের দুটি খণ্ড এবং অন্তর এই তিনটি ভাগই দুবার করে গাওয়া নিয়ম। আভোগ অংশটিও উদ্‌গ্রাহের ন্যায় দুই খণ্ডে বিভক্ত। এই দুটি খণ্ডকেও একধাতু বলা হয়েছে, তবে পরের খণ্ডটি উচ্চতর স্বরে গাইতে হবে। সিংহভূপালের মতে আভোগের শেষ খণ্ডটি অন্তর অংশের চেয়েও উচ্চে গাইতে হবে। এই আভোগ অংশে, বিশেষ করে এর উচ্চখণ্ডটিতে স্তুত্য বা নায়কের নাম যোজনা করা হয়। সমগ্র গানটির পর উদ্‌গ্রাহের প্রথম খণ্ডটি পুনরায় গেয়ে গীত সমাপ্ত করা হয়।

এই সঙ্গীতের নাম ধ্রুব হওয়াতে সাধারণতই মনে হয় এতে ধ্রুব নামক অঙ্গের কোন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বর্ণনায় কোথাও ধ্রুব নামক ধাতুর উল্লেখ নেই। আসলে ধ্রুব নামক কোন ধাতুর ব্যবহারই এই ধ্রুব-গীতে ছিল না। কল্লিনাথ স্থির করেছেন যে সালগগীতগুলিতে ধ্রুব-অঙ্গের অনুল্লেখে "অন্তর" নামক অংশটিকেই ধ্রুব-খণ্ড হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাঁর মতে এই যে "অন্তর" নামক অংশ এটি আসলে কোন বিশিষ্ট ধাতু নয় এটি "লৌকিক রূপান্তর" মাত্র। কল্লিনাথের উক্তি—"অয়মন্তরো লৌকিক-রূপান্তর ইত্যুচ্যতে।" এইটিই ক্রমে ধ্রুব নামক অঙ্গের স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু কেন যে এর নাম ধ্রুব হল তার ইতিহাস যে সব সঙ্গীতশাস্ত্র পাওয়া যায় তা থেকে জানবার উপায় নেই।—সুপ্রাচীন নাট্যসঙ্গীতে প্রযুক্ত বিভিন্ন ধ্রুবারই কি এটি একপ্রকার পরিণতি? এর সমর্থনেও কিছু বলা শক্ত। অতএব এ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্নই আমাদের থেকে গেল।

বর্তমান ধ্রুবপদ যে এই ধ্রুবগীতি থেকে এসেছে এসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাক্তন ধ্রুবস্থ উদ্‌গ্রাহটি আমাদের বর্তমান স্থায়ী, "অন্তর" অংশটি বর্তমানে "অন্তরা" নাম ধারণ করেছে। আভোগের প্রথম খণ্ডটি বর্তমান সঞ্চারী এবং দ্বিতীয়টি আভোগ নামেই পরিচিত আছে।

উদ্‌গ্রাহ নামটির পরিবর্তে কিভাবে স্থায়ী নামটি এল সে সম্বন্ধে অনেকে অনেকরকম ধারণা পোষণ করেন। অনুমান হয় প্রকীর্ণ-অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব যে "স্থায" শব্দের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন সেটি থেকেই "স্থায়ী" শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। রাগের অবয়বতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলা হয়েছে যে রাগের অবয়বপ্রতিষ্ঠা বা সংগঠনের রূপবন্ধকে "স্থায়" নামে অভিহিত করা হয়। শার্ঙ্গদেব বলছেন—"রাগস্যাবয়বঃ স্থায়ঃ"। ধ্রুবগীতির উদ্‌গ্রাহ অংশটি দুটিখণ্ডে রচিত এবং এবং এই দুটি খণ্ড একই রকম। বলা বাহুল্য পরবর্তী গায়নবৃন্দ একইভাবে অনুষ্ঠিত দুটি আলাদা খণ্ডের কোন তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। এর প্রথম খণ্ডে তাঁরা বিবিধ "স্থায়" প্রয়োগে রাগের অবয়বটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এতে অপরখণ্ড থেকে এর একটি পার্থক্যও স্বাভাবিকভাবেই রচিত হল। আজও আমরা দেখতে পাই স্থায়ী অংশেই রাগের আকৃতিটি পরিস্ফুট হয়। ক্রমে উদ্‌গ্রাহের অপরখণ্ডের অস্তিত্ব আর রইল না এবং বাহুল্য বোধে এটি পরিত্যক্ত হল। আভোগ অংশেও ঠিক এইভাবেই বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অন্তর অংশটি চড়ায় গাইবার পর কণ্ঠ স্বভাবতই মধ্যসপ্তকে সঞ্চরণ করতে উন্মুখ হয়। এই সঞ্চরণটি আরোহণ, অবরোহণ এবং স্থিতি এই বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বনে করা হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে বর্ণ-প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে এইরকম মিশ্র গীতরীতিকে "সঞ্চারী" বলা হয়। বর্ণ উপলক্ষ্যে উল্লিখিত এই "সঞ্চারী" শব্দটিকেই আচার্যেরা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন কেননা এর চেয়ে উপযুক্ত এবং ভাল শব্দ আর নেই। কেউ হয়ত আপত্তি তুলতে পারেন যে সঞ্চারী নামক বর্ণটি কেবলমাত্র স্বরাচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতএব এক্ষেত্রে এর উল্লেখ কষ্টকল্পনা। কিন্তু আরোহী এবং অবরোহী এই দুটি শব্দ যদি আমরা কেবলমাত্র স্বরাচরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে সঞ্চারী শব্দটির গ্রহণেও কোন বাধা থাকা উচিত নয় এবং সাঙ্গীতিক পরিভাষার দিক থেকে বিচার করলে এই মতটিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

শার্ঙ্গদেব ধ্রুবগীতির একাদশ-অক্ষর-সমন্বিত খণ্ড থেকে এক এক অক্ষর বর্ধিত করে ষড়্‌বিংশ-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড পর্যন্ত ষোলোটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেছেন। কল্লিনাথ বলছেন তাঁর সময় এই সব ধ্রুবের প্রচলন ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"নন্থ জয়ন্তাদিষু ষোড়শসু ধ্রুবেষু যোঽক্ষরসংখ্যা-নিয়ম উক্তঃ, স বর্তমানেষু কেষুচিৎ ধ্রুবেষু ন দৃশ্যতে। তৎ কথং তেষাং লক্ষণহীনত্বেঽপি লোকে পরিগ্রহ ইতি চেৎ, সত্যমেতৎ। অক্ষরশব্দেন পদান্যপি উচ্যন্তে। যথায়মক্ষরার্থ ইতি পদার্থো বর্ণ্যতে।" অর্থাৎ, অক্ষর-সংখ্যাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত "জয়ন্ত" প্রভৃতি যে ষোলটি ধ্রুবের কথা বলা হয়েছে বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুব গীতে সেইরূপ অক্ষরসংখ্যার নিয়ম কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। লক্ষণহীনত্ব সত্ত্বেও লোকসমাজে এর গ্রাহ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উঠতে পারে। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি "অক্ষর" শব্দে পদও বোঝাতে পারে। যেমন "অক্ষারার্থ" বললে আমরা পদের অর্থ—এইরকম বুঝি। বাস্তবিক কল্লিনাথের এই অনুমান অসঙ্গত নয়। শকুন্তলা নাটকের একটি উদ্ধৃতি থেকে ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। উক্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রাণী হংসপদিকার গান শুনে বিদূষক রাজাকে বলছেন—"কিংদাব গীদীএ অবগদো অক্‌খরত্থো (কিং তাবং গীত্যা অবগতঃ অক্ষরার্থঃ)"— "এই গীতের অক্ষরার্থ অবগত হতে পেরেছেন কি?" এইখানে অক্ষরার্থ বলতে পদের অর্থই বোঝাচ্ছে। অতঃপর কল্লিনাথ বলছেন যে এক্ষেত্রে

পদের বা সংখ্যার বিশেষ নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে এইটাই ধরে নিতে হবে। যদি সেরকম কিছু না পাওয়া যায় তাহলেও ধ্রুবগীতির লোকপরিগ্রহত্ব অস্বীকার করা কর্তব্য নয় কেননা উক্ত লক্ষণগুলি দৃষ্টগোচর না হলেও তার লোকরঞ্জকত্বের কোন অভাব হয় নি। ধ্রুবগীতি অনিয়ত অক্ষরযুক্ত হলেও এতে রস, তাল এবং উদ্‌গ্রাহাদি অবয়ব-সন্নিবেশের বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকায় ধ্রুবের ব্যবহার হীনতাপ্রাপ্ত হয় নি। তাঁর উক্তি—"তেন কচিৎপদানাং বা সংখ্যায়া নিয়মো দ্রষ্টব্যঃ। যত্র সোঽপি নাস্তি তত্র অক্ষরাদেঃ সংখ্যা-নিয়মাভাবাৎ নিয়মোক্তাৎ দৃষ্টফলস্য অভাব এব ন তু দৃষ্টফলস্য জনরঞ্জনা-দেরপি। তেন তেষাং লোকপরিগ্রহোঽপি উপপন্ন এব। অনিয়ত-অক্ষর-রস তালযুক্তস্য উদ্‌গ্রাহাদ্যবয়বসন্নিবেশস্য অবশিষ্টত্বেন তেষামপি লক্ষণত্বাৎ ধ্রুবব্যবহারো ন হীয়ত এব।"

ধ্রুবের ষোড়শ প্রকারভেদের বর্ণনা এইরূপ :—

১। জয়ন্ত—একাদশ-অক্ষর যুক্ত খণ্ড। তাল—আদিতাল। রস—শৃঙ্গার।

২। শেখর—দ্বাদশাক্ষর খণ্ড। তাল—নিঃসারুক। রস—বীর। ফল—আয়ু এবং শ্রীবর্ধন।

৩। উৎসাহ—ত্রয়োদশাক্ষর খণ্ড। তাল—প্রতিমণ্ঠ। রস—হাস্য। ফল—ঋদ্ধি এবং সৌভাগ্য।

৪। মধুর—চতুর্দশাক্ষর খণ্ড। তাল—হয়লীল। রস—করুণ। ফল—ভোগ।

৫। নির্মল—পঞ্চদশাক্ষর খণ্ড। তাল—ক্রীডা। রস—শৃঙ্গার ফল—প্রভ।

৬। কুন্তল—ষোড়শাক্ষর খণ্ড। তাল—লঘুশেখর। রস—অদ্ভুত। ফল—অভীষ্টপ্রদায়ী।

৭। কামল—সপ্তদশাক্ষর খণ্ড। তাল—ঝম্পা। বিনিয়োগ—বিপ্রলম্ভ। ফল—সিদ্ধিপ্রদায়ী।

৮। চারু— অষ্টাদশাক্ষর খণ্ড। তাল—নিঃসারুক। রস—বীর। ফল হর্ষ এবং উৎকর্ষ প্রদায়ী।

৯। নন্দন—উনবিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—একতালী। রস—বীর, শৃঙ্গার। ফল—অষ্ট সিদ্ধি প্রদায়ী।

১০। চন্দ্রশেখর—বিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—প্রতিমণ্ঠ। রস—বীর, হাস্য, শৃঙ্গার। ফল—অভীষ্টপ্রদায়ী।

১১। কামোদ—একবিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—প্রতিমণ্ঠ রস—শৃঙ্গার। ফল—অভীষ্টপ্রদায়ী।

১২। বিজয়—দ্বাবিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—দ্বিতীয়। রস—হাস্য। ফল—নেতার আয়ুবৃদ্ধি।

১৩। কন্দর্প। ত্রয়োবিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—আদি। রস—হাস্য, শৃঙ্গার, করুণ। ফল—ভোগ।

১৪। জয়মঙ্গল—চতুর্বিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—ক্রীডা। রস—শৃঙ্গার, বীর। ফল—জয়োৎসাহপ্রদ।

১৫। তিলক—পঞ্চবিংশতি-অক্ষর-যুক্ত খণ্ড। তাল—একতালী। রস বীর, শৃঙ্গার।

১৬। ললিত—ষড্‌বিংশতি-অক্ষব-যুক্ত খণ্ড। তাল -প্রতিমণ্ঠ। রস—শৃঙ্গার। ফল—সর্বসিদ্ধি।

এর পরে মণ্ঠ নামক সালগসূডের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই গীতের উদ্‌গ্রাহখণ্ডে দুটি যতি বা বিরাম নির্দিষ্ট আছে। একটি বিরামও শাস্ত্রসম্মত। উদ্‌গ্রাহখণ্ডের পর ধ্রুব খণ্ডটি দুবার গাইতে হবে। মণ্ঠ-গীতিব ক্ষেত্রে "অন্তর" অংশটি বৈকল্পিক অর্থাৎ এর আচরণ করা যেতেও পারে আবার না করলেও আপত্তি নেই। যদি "অন্তর" অংশটি গাওযা হয় তাহলে এর পরে ধ্রুব অংশটি আর একবাব গাইতে হবে এবং তারপরে একবার আভোগের অনুষ্ঠান করতে হবে। অবশেষে ধ্রুব অংশটি আর একবার গেয়ে গীত সমাপ্ত হবে। মণ্ঠগীতি মণ্ঠতালে গাওয়া হয়ে থাকে।

এরপর শার্ঙ্গদেব মণ্ঠকগীতির ছটি ভেদের উল্লেখ করেছেন। এগুলির লক্ষণ দেওয়া গেল :—

১। জনপ্রিয়—জ-গণাত্মক মণ্ঠতালের প্রয়োগ হয়। রস—বীর।

২। মঙ্গল—ভ-গণাত্মক মণ্ঠতালের প্রয়োগ হয়। রস—শৃঙ্গার।

৩। সুন্দর—স-গণাত্মক মণ্ঠতালের প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে উদীক্ষণ-নামক তালের কোন তফাৎ নেই। রস—শৃঙ্গার।

৪। বল্লভ—র-গণাত্মক মণ্ঠ তালের প্রয়োগ হয়। রস—করুণ।

৫। কলাপ—বিরামান্ত ন-গণাত্মক মণ্ঠতালের প্রয়োগ হয়। রস—হাস্য।

৬। কমল—বিরমান্ত দুটি দ্রুত এবং একটি লঘুর প্রয়োগ হয়। রস—অদ্ভুত।

এই ছ'টি গীতিভেদ উপলক্ষ্যে যে ছ'টি তালের প্রয়োগ হল সেগুলিকে রূপক (বা রূপক মণ্ঠ) তাল বলা হয়। মণ্ঠতাল সবশুদ্ধ দশ প্রকার। এই ছ'টি ছাড়া আর চার প্রকার মণ্ঠতালের পরিচয় তালাধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই যে ছ'টি গীতের নাম দেওয়া হল এদের সঙ্গে যে তালগুলি যুক্ত হয়েছে তারাও একই নামে পরিচিত। যেমন, জনপ্রিয় নামক মণ্ঠগীতির সঙ্গে যে জ-গণাত্মক মণ্ঠতালটি যুক্ত হয়েছে সেটির নামও জনপ্রিয়-রূপক। এইভাবে অপর তালগুলিও মঙ্গল-রূপক, সুন্দর-রূপক, বল্লভ-রূপক, কলাপ-রূপক এবং কমল-রূপক—এইভাবে আখ্যায়িত হবে। এই সম্পর্কে অ্যাডায়ার সংস্করণে এই পাঠটি পাওয়া যায়—"ষট্প্রকারো মণ্ঠতালো রূপকং তেন ভিদ্যতে", সিংহভূপাল এই পাঠটি গ্রহণ করে টীকায় বলছেন—"তেন রূপকং মণ্ঠকাৎ প্রবন্ধাৎ ভিদ্যতে"। অর্থাৎ একনামযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই তালগুলি মণ্ঠপ্রবন্ধ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত "সঙ্গীতসার সংগ্রহ" গ্রন্থে আর একটি পাঠ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে—"ষট্ প্রকারো মণ্ঠতালো রূপকং তেন বিদ্যতে।" অর্থাৎ এই ষট্ প্রকার মণ্ঠগীতির সঙ্গে ষটপ্রকার মণ্ঠ-রূপক তালও বিদ্যমান। আমাদের কাছে এই পাঠটিই অধিকতর সমীচীন বলে বোধ হয়।

মণ্ঠগীতির পর প্রতিমণ্ঠ নামক সালগপ্রবন্ধ সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলছেন যে উক্ত গীতির সব লক্ষণই মণ্ঠের ন্যায়। কেবলমাত্র এক্ষেত্রে প্রতিমণ্ঠ তালের প্রয়োগ হবে।

এই প্রবন্ধের চারিটি ভেদের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

১। অমর—এতে একটি গুরুমাত্রার প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে করুণ নামক তালের কোনো তফাৎ দেখা যায় না। রস—শৃঙ্গার।

২। তার - এতে দুটি বিরামান্ত দ্রুতের পর দুটি লঘুর প্রয়োগ হয়। রস—বীর, রৌদ্র।

৩। বিচার—এতে তিনটি বিরামান্ত লঘুর প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে পূর্ববর্ণিত মণ্ঠের অন্তর্বর্তী কলাপের কোন ভেদ নেই। রস—করুণ।

৪। কুন্দ—এতে উদ্‌গ্রাহখণ্ডে বিরামের কালে তিনটি লঘুর প্রয়োগ হয়। রস—শৃঙ্গার।

এই গানগুলি সম্বন্ধে তালের দিক থেকে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ নেই। প্রতিমণ্ঠ নামক একটি তালের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মণ্ঠের মত এটির দশটি ভেদ নেই। প্রতিমণ্ঠ তালে একটি স-গণ এবং একটি ভ-গণের সন্নিবেশ হয়। কিন্তু এই তালের সঙ্গে উপরোক্ত চারটি গীতে প্রযুক্ত তালাদির সম্বন্ধ কিরূপ সেটি বুঝিয়ে না দিলে এবিষয়ে কিছুই ধারণা করতে পারা যায় না। তাছাড়া তালের দিক থেকেও কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কেন এটা ঘটল সে সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব কিছু বলেন নি। সিংহভূপালও এ বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নি। কল্লিনাথই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পুনরুক্তিগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা দেখে মনে হয় তিনিও এই ব্যাপারগুলির অর্থ নির্ণয় করতে পারেন নি এবং সম্ভবত এই সব গানের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন না।

এরপর নিঃসারুক নামক সালগগীতি সম্পর্কে শাঙ্গ দেব বলছেন যে এটি নিঃসারুক নামক তালে নিবদ্ধ। নিঃসারুক তালের লক্ষণ হচ্ছে দুটি বিরামান্ত লঘুর সমাবেশ। হংসলীল নামক তালেরও একই লক্ষণ। এই দুটি তালে কি সূক্ষ্ম প্রভেদ ছিল জানা যায় না। নিঃসারুক গীতি ছয় প্রকার। এক্ষেত্রেও মূল নিঃসারুক তালের সঙ্গে ভেদগুলিতে প্রযুক্ত তালাদির কোন সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় নি।

১। বৈকুন্দ—এতে দুটি দ্রুত এবং দুটি লঘুর সন্নিবেশ ঘটে। কল্লিনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন যে ঝণ্টুক নামক আর একটি তালেরও লক্ষণ একই রকম। তাঁর মতে অড্ডতালও একই লক্ষণ বিশিষ্ট যদিও রত্নাকরে (অ্যাডায়ার সংস্করণ) অড্ডতালের বর্ণনায় বলা হয়েছে এতে একটি দ্রুত এবং দুটি লঘুর সমাবেশ ঘটে। এর সঙ্গে কুড়ুক্ক তালেরও প্রভেদ দেখা যায় না। বিনিয়োগ—মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান।

২। আনন্দ—এতে বিরামন্তে দুটি দ্রুতের প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে ক্রীড়াতালের প্রভেদ নেই। বিনিয়োগ—আনন্দানুষ্ঠান।

৩। কান্তার—এতে একটি লঘু এবং একটি গুরুর প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে রতিতালের প্রভেদ নেই। বিনিয়োগ—বিপ্রলম্ভ।

৪। সমর—এতে বিরামান্ত লঘুদ্বয়ের প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে হংসলীল

তালের প্রভেদ নেই। নিঃসারুক তালের সঙ্গেও এর প্রভেদ নেই। অতএব কেন যে এক্ষেত্রে একটি আলাদা নামকরণ হল তাও বোঝা যায় না। রস—বীর।

৫। বাঞ্ছিত—এতে তিনটি লঘু এবং দুটি দ্রুতের প্রয়োগ হয়। বিনিয়োগ—বাঞ্ছা।

৬। বিশাল—এতে একটি লঘু, দুটি দ্রুত এবং একটি লঘুর প্রয়োগ হয়। বিনিয়োগ—সম্ভোগ।

অতঃপর শার্ঙ্গদেব "অডতাল" নামক গীতের উল্লেখ করেছেন। এটি অডতালে নিবদ্ধ। এর ছ'টি প্রকারভেদ বর্তমান।

১। নিঃশঙ্ক—এতে পর পর একটি লঘু, একটি গুরু এবং দুটি দ্রুতের প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে তালাধ্যায়ে বর্ণিত নিঃশঙ্কতালের সম্বন্ধ নেই। বিনিয়োগ—বিস্ময়।

২। শঙ্ক—এতে একটি লঘুর পর দুটি দ্রুতের প্রয়োগ হয়। রস—শৃঙ্গার বীর।

৩। শীল—এতে দুটি বিবামান্ত দ্রুতের পরে একটি লঘুর প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে কমল নামক রূপকমঠের কোন প্রভেদ নেই। রস—শান্ত।

৪। চার—এতে দুটি দ্রুতের পর একটি লঘু এবং একটি গুরুর প্রয়োগ হয়। রস—বীর, অদ্ভুত।

৫। মকরন্দ—এতে দুটি দ্রুতের পর একটি গুরুর প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে দর্পণ বা মদন নামক তালের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। রস—শৃঙ্গার।

৬। বিজয়—এতে দুটি দ্রুতের পর একটি লঘুর প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে দ্বিতীয়তালেব কোন প্রভেদ নেই। রস—বীর।

অডতালস্থ গীতগুলির প্রসঙ্গেও অডতালের সঙ্গে এই ছটী গীতে প্রযুক্ত তালের কি সম্বন্ধ সেটি বলা হয় নি।

এরপর শার্ঙ্গদেব রাসক নামক গীতের উল্লেখ কয়রছেন। এটি রাসতালে নিবদ্ধ। আদি তালই রাস নামে প্রসিদ্ধ। এতে কেবলমাত্র একটি লঘুর প্রয়োগ হয়। রাসকের চারটি ভেদ বর্তমান।

১। বিনোদ—এই গীতে ধ্রুবপদের অন্তে আলাপ প্রযুক্ত হয়। রস—কৌতুক।

২। বরদ—এই গীতে ধ্রুব অংশের মধ্যভাগে আলাপানুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিনিয়োগ—দেবস্তুতি।

৩। নন্দ—এই গীতে দ্বিখণ্ডযুক্ত উদ্‌গ্রাহের প্রথম খণ্ডটি আলাপ-বিনির্মিত। অর্থাৎ, এটি আলাপের ঢঙে আচরিত হয়। রস—অদ্ভুত।

৪। কম্বুজ—এই গীতে ধ্রুবপদের পূর্বে আলাপের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। রস—করুণ।

সর্বপ্রকার রাসকপ্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহ দ্বিখণ্ড যুক্ত হয়।

সালগসূড় পর্যায়ের সর্বশেষ প্রবন্ধ হচ্ছে একতালী। এটি একতালে নিবদ্ধ। একতালে কেবলমাত্র একটি দ্রুতের প্রয়োগ হয়। একতালীর তিনটি প্রকারভেদের উল্লেখ করা হয়েছে।

১। রমা—এই গীতে উদ্‌গ্রাহ অংশটি একবার গাওয়া হয়। এর অন্তর-খণ্ডটি অক্ষর বা পদনির্মিত।

২। চন্দ্রিকা—এই গীতের উদ্‌গ্রাহ অংশটি দ্বিখণ্ডবিশিষ্ট এবং অন্তর-খণ্ডটি কেবলমাত্র আলাপদ্বারা রচিত। এটি দ্রুতলয়ে গাওয়া হয়, যতির সংখ্যাও কিছু অধিক এবং এতে অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখা যায়। শার্ঙ্গদেব বলছেন—

ঘনদ্রুতা ঘনযতির্ঘনানুপ্রাসযোগিনী ॥৩৫৮
চন্দ্রিকা সৈকতালী স্যাৎভূরি সৌভাগ্যদায়িনী।
(সং-র-অ্যা-সংস্করণ।)
প্রবন্ধাধ্যায় ॥

৩। বিপুলা—এই গীতে উদ্‌গ্রাহের পূর্বে আলোপের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই যে আলাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটি প্রয়োগাত্মক আলাপ অর্থাৎ এটি অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লিখিত সাতটি সালগসূড়ের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে আমাদের বর্তমান ধ্রুবপদ এই বিভিন্নরীতিগুলির একটি সমন্বয় সাধনপূর্বক সরলভাবে গঠিত হয়েছে। বিবিধ রূপবন্ধ এবং তালের প্রয়োগে এই সূড়গুলি যখন জটীল আকার ধারণ করেছিল তখন এই সবগুলি ভেঙে একটি সরলতর পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। বর্তমান ধ্রুবপদ এই প্রচেষ্টারই পরিণতি।

পরিশেষে শার্ঙ্গদেব রূপকের পরিচয় প্রদান করেছেন।

রূপক পর্যায়ের গীতের প্রধান বৈশিষ্ট হল এর নূতনত্ব। রাগ, স্থায়, ধাতু,

মাতু—সব দিক থেকেই এতে নতুন সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্যগোচর হয়। এর পরিচয় উপলক্ষ্যে রত্নাকরের ভাষাই উদ্ধৃত করা যাক।

গুণান্বিতং দোষহীনং নবং রূপকমুত্তমম্।
রাগেণ ধাতুমাতুভ্যাং তথা তাললয়ৌড়ুবৈঃ।
নূতনৈ রূপকং নূত্নং রাগঃ স্থায়ান্তরৈর্ণবঃ।
ধাতুরাগাংশভেদেন মাতোস্তু নবতা ভবেৎ॥
প্রতিপাদ্যবিশেষেণ রসালঙ্কার ভেদতঃ।
লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা মতা॥
তালবিশ্রামতোঽন্যেন বিশ্রামেণ লয়ো নবঃ।
ছন্দগণগ্রহন্যাস প্রবন্ধাবয়বৈর্নবৈঃ॥

এই নতুন ধরণের রূপক একটি দোষহীন গুণান্বিত, সঙ্গীত। নতুন নতুন রাগের প্রয়োগে, কলির বিভিন্ন সংস্থানে পদবৈচত্র্যে এবং তাল লয়ের বিচিত্র সন্নিবেশে এই গীত নবরূপে প্রতিভাত হয়। শুধু নতুন রাগের প্রয়োগই নয় রাগাবয়ব বা স্থায়েরও বৈচিত্র্য ঘটিয়ে রূপককে প্রতিবারই নতুনভাবে রূপায়িত করা হয়। রাগাংশভেদেও নতুনত্ব সম্পাদন করা হয়। এ সম্বন্ধে অংশস্থায় উপলক্ষ্যে আলোচনা করা হয়েছে। "রাগাংশ" শব্দ এখানে রাগান্তরের অবয়বসন্নিবেশ অর্থাৎ রাগমিশ্রণ বোঝাচ্ছে। এটি সাতপ্রকার কারণাংশ, কার্য্যাংশ, সজাতীয়াংশ, সদৃশাংশ, বিসদৃশাংশ, মধ্যমাংশ এবং অংশাংশ। এ সম্বন্ধে পূর্বালোচনা দ্রষ্টব্য। এই গীতে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর এবং রস বা অলঙ্কারের ভেদে মাতু বা বাক্যাংশেরও নবীনত্ব পরিদৃষ্ট হয়। তাল বৈচিত্র্যও এর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এতে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত এই প্রকার লয়ের পরিবর্তন ঘটান হয় এবং সম, অতীত, অনাগত,—এই তিন গ্রহের বৈষম্যও প্রদর্শন করা হয়। তালবর্জনাদিদ্বারা অন্যান্য অবয়বের বিশ্রাম বা বিপর্যয় ঘটিয়ে লয়ের নবত্ব সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া ছন্দ, গণ-নিয়ম, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করবার সুযোগ এই জাতীয় গানে প্রচুর পরিমাণে আছে।

এই লক্ষণ বর্ণনার পর শার্ঙ্গদেব বললেন—"ঔড়ুবাপরপযায়া রচনা নবতাং ব্রজেৎ।" ইতিপূর্বে উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয় চরণেও "ঔড়ুব" শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। এই ঔড়ুব" শব্দটি কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বোঝা কঠিন। শার্ঙ্গদেব এবিষয়ে কিছু বলেন নি। সিংহভূপালও কিছুই উল্লেখ করেন নি। কল্লিনাথ

বলছেন—ঔড়ুব শব্দেন অত্র রচনা বিশেষ উচ্যতে।" অর্থাৎ ঔড়ুবশব্দে এখানে একরকম বিশেষ রচনা বোঝাচ্ছে। আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন—"ঔড়ুবমিত্যপরঃ পর্যায়ো যস্যাঃ সা। এবং বিধাং রচনাং কুর্যাৎ ইত্যর্থঃ।" এই উক্তি থেকেও কিছুই ধারণা করতে পারা যায় না। সন্দেহ হয় শার্ঙ্গদেব এই রূপকগীতির অপর একটি নাম "ঔড়ুব"ছিল এইরকমই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এটি অনুমান মাত্র এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না।

এই যে রূপকের কথা বলা হল এটি উত্তমপর্যায়ের রূপক। তিনপ্রকার মধ্যমরূপকেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—পরিবৃত্ত, পটান্তর এবং ভঞ্জনীসংশ্রিত। আরো দুটি ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে—খল্লোত্তার এবং অনুসার। এ দুটিকে অধমশ্রেণীব রূপক বলা হয়েছে।

পরিবৃত্ত শব্দটির অর্থ পরিবর্তন বা বদল। রাগালপ্তির প্রসঙ্গে আমরা "স্বস্থান" সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। রাগ এবং তালের নবতর প্রয়োগে এই স্বস্থান বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবৃত্ত রূপকের অনুষ্ঠান করা হয়। কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটান হয় সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পূর্বে স্থায়ীস্বরকে অবলম্বন করে একটি স্বস্থানের আচরণ করা হয়েছে; পরের বারে সেই স্থায়ী, রাগ এবং তালের পরিবর্তন দ্বারা একটি সম্পূর্ণ অন্য স্বস্থানের অনুষ্ঠান করে এই পরিবর্তনটিকে রূপায়িত করা হয়।

পটান্তর শব্দের অর্থ আকৃতির পরিবর্তন। পরিবৃত্ত রূপকে রাগ এবং তালের পরিবর্তন প্রস্ফুটিত হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যাক্যাংশ, রস, রাগাবয়ব বা স্থায় প্রভৃতির বৈচিত্র্য সম্পাদনপূর্বক পটান্তর রূপকের অনুষ্ঠান করা হয়।

ভঞ্জন শব্দের অর্থ হচ্ছে খণ্ডন। এই জাতীয় রূপকে নিজধাতুকে পরিত্যাগ-পূর্বক অন্যধাতুকে অবলম্বন করা হয়। এই ধাতুগত খণ্ডনের জন্যই এর নাম হয়েছে ভঞ্জনীসংশ্রিত রূপক।

খল্লোত্তার রূপকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বোঝা কঠিন। এই জাতীয় রূপকে আগের অংশটিতে যে সব স্থায়ের প্রয়োগ হয়েছে পরবর্তী অংশে সেইগুলি স্থানান্তরিত অর্থাৎ পরিবর্তিত হয়। এতে বাক্যাংশেরও পরিবর্তন করা হয়।

অনুসারনামক রূপকে বাক্যাংশের পরিবর্তন করা হয় এবং ধাতুরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। এটি রাগ এবং তাল অবলম্বনে গাওয়া হলেও শার্ঙ্গদেবের মতে এই শ্রেণীর রূপক গুণোৎকর্ষবর্জিত।

ইতিপূর্বে উত্তমরূপকের লক্ষণে "দোষহীন" এবং "গুণসমন্বিত" এই দুটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। প্রবন্ধাধ্যায়ের শেষে শার্ঙ্গদেব এই গুণ এবং দোষ-গুলির বিশেষ উল্লেখ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে দশটি গুণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

১। ব্যক্ত—সম্যক স্ফুট স্বর।

২। পূর্ণ—প্রকৃতি, প্রত্যয়, ছন্দ, রাগ, পদ, স্বর, পূর্ণাঙ্গ, গমক এই—সবগুলি উপযুক্তভাবে বিদ্যমান থাকলে তাকে পূর্ণ বলা হয়।

৩। প্রসন্ন—প্রকটার্থ

১। সুকুমার—কোমল কণ্ঠ

৫। অলঙ্কত—মন্দ্র, মধ্য, তার এই তিন স্থানে পরিব্যাপ্তি।

৬। সম—বর্ণ এবং লয়ের সমত্ব

৭। সুরম—সাধারণ অর্থে উত্তক্তরঞ্জকত্ব গুণ। শার্ঙ্গদেব বলছেন বল্লকী নামক বীণার ধ্বনি, বাঁশীর ধ্বনি এবং কণ্ঠধ্বনির একতা ঘটলে তাকে বলা হয় সুরক্ত।

৮। শ্লক্ষ্ণ—নিম্ন, উচ্চ, দ্রুত, মধ্য—সব অবস্থাতেই কণ্ঠের শ্লক্ষ্ণত্ব বা স্নিগ্ধত্ব থাকলে তাকে বলা হয় শ্লক্ষ্ণ।

৯। বিকৃষ্ট—সাধারণ অর্থে বিশেষরূপে কর্ষিত স্বর। শার্ঙ্গদেব বলছেন উচ্চ উচ্চারণ ক্ষমতাকে বিকৃষ্ট বলা হয়। অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট উচ্চারণ বোঝাচ্ছেন।

১০। মধুর লাবণ্যসম্পন্ন ভাবি কণ্ঠস্বব।

উক্ত গুণগুলির পর দশটি দোষ উল্লিখিত হয়েছে।

১। লোকদুষ্ট—দোষের জন্য যা লোকসমাজে পরিবেশন করা যায় না অথবা যা লোকসম্মত নয়।

২। শাস্ত্রদুষ্ট—যা শাস্ত্রসম্মত বা শস্ত্রোনুমোদিত নয়।

৩। শ্রুতিবিরোধ—হীনশ্রুতিত্ব।

৪। কালবিরোধ—নিষিদ্ধকালে গান।

৫। পুনরুক্ত—বারম্বার উক্ত।

৬। কলাবাহ্য—নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে চলে যাওয়া অর্থাৎ তালবিচ্যুতি।

৭। গতক্রম—নির্ধারিত ক্রম থেকে বিচ্যুতি।

৮। অপার্থক—অর্থের বিকৃতি।

৯। গ্রাম্য—গ্রাম্যতাদোষ। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সাহিত্যদর্পণের টীকায় বলছেন যে অশিক্ষিতসাধারণপ্রযোজ্যত্ব হলে তাকে গ্রাম্য বলা হয়। এই উপলক্ষ্যে তিনি তিনটি শব্দের উল্লেখ করেছেন—নাগর, উপনাগর এবং গ্রাম্য। অতিশিক্ষিতজনপ্রযোজ্যত্ব হলে তাকে নাগর বলা হয়। অর্ধশিক্ষিতজনপ্রযোজ্যত্বকে বলা হয় উপনাগর এবং অশিক্ষিতজন-প্রযোজ্যত্বকে বলা হয় গ্রাম্য।

১০। সন্দিগ্ধ—ঔদার্যের অভাবে যে সঙ্কীর্ণত্ব প্রকাশ পায় তাকে সন্দিগ্ধ বলা হয়।

এইখানেই শার্ঙ্গদেব কণ্ঠসঙ্গীতের বিস্তৃত সমীক্ষণ শেষ করেছেন।

॥ সমাপ্ত ॥

শব্দসূচী

[বিশেষ জ্ঞাতব্য শব্দগুলি দেওয়া হয়েছে]